জ্বালা

জ্বালা

সৌরীন সেন

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৭৫

প্রকাশক :
মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা - ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস,
৫৭/২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা - ৯

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ লিপি :
গণেশ বসু

দাম : আট টাকা মাত্র.

আর পাঁচটি গল্প উপন্যাস-এর মত 'জ্বালা' কাল্পনিক কাহিনী মাত্র। বিশেষ কোনোও ঘটনা ও চরিত্র কোথাও কোথাও বাস্তবানুগ মনে হলেও বাস্তবতার সঙ্গে তার তিলমাত্র সম্পর্ক নেই।

সৌরীন সেন

৺সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

স্মরণে—

এই লেখকের—

আখের স্বাদ নোনতা

কঙ্গো থেকে ফেরা

ভিয়েৎনাম

—চমৎকার!

টাইপ করা কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকাতে সুবিমল রায় প্রসন্ন হেসে বললেন,

—ঠিক এই জিনিসই আমি চেয়েছিলাম। আগের লেখাটাতে তুমি যেন সাহিত্য করেছিলে। লেখাটা বদলে এখন অনেক সুন্দর হয়েছে।

—আপনি খসড়াটা শুনে যেভাবে পাল্টাতে বলেছিলেন, সেই ভাবে লেখাটা আমি তৈরী করতে চেষ্টা করেছি।

—এখন দেখ তো লেখাটা বদলে কী চমৎকার দাঁড়ালো। আমি জানি, সেদিন যখন তোমার লেখাটা শুনে আমি পাল্টাতে বলেছিলাম, তুমি খুশী হওনি। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক।

—আমার হয়তো বুঝতে ভুল হয়েছিলো।

—তুমি নিশ্চয়ই জান, অপরের লেখার ওপর কলম চালানো আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। তোমার লেখা তোমার মতই হবে। এতে আমার কোনো বক্তব্য থাকা উচিত নয়। কিন্তু 'চেম্বার অফ কমার্স'-এ দশজনের মধ্যে লেখাটা যখন আমাকেই পড়তে হবে, দায়িত্ব আমার থাকেই। সকলে তো জানবে আমার লেখা।

—আপনি ঠিকই ধরেছিলেন। আগের লেখাটাতে গতির অভাব ছিল। তাছাড়া কিছুটা কেতাবী কেতাবী গন্ধ ছিল।

—ঠিক তাই। এ ধরনের অধিবেশনের বক্তৃতা অনেক বেশী সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া দরকার। ইংরেজী তুমি মন্দ লেখো না, তবে বড় বড় শব্দের ওপর তোমার ঝোঁকটা আজও কমেনি। আধুনিক

ইংরেজী লেখার ঢঙই যেন পাল্টে গেছে। আলডুস হাক্সলীর ইংরেজী [illegible] প্রচুর। শেষের দিকে কোথায় যেন 'Kaleidoscope' শব্দটা আমার [illegible] লাগলো না।

—অন্য কিছু দেব স্যার? বাদ দেব?

—ভেবে দেখ। বাদ আমি তোমাকে দিতে বলবো না। আমি শুধু তোমাকে বড় বড় শব্দের ওপর ঝোঁকটা কমাতে বলবো। ইংরেজী লিখবে একদম ইংরেজ বাচ্চাদের মত। সত্যি কথা বলতে কী এই ভাষা দিয়েই ওরা একরকম পৃথিবী জয় করতে চলেছিলো। 'এনকাউন্টার'-এ বিনয় দত্ত-র লেখা নিয়ে তো দেখি হৈ-চৈ-এর শেষ নেই। পড়লাম। দেশের বুদ্ধিজীবিদের সম্পর্কে শুধু হতাশ হলাম। বিনয়বাবু নতুন কিছুই বলেন নি। ইংরেজীও নিচুমানের। আমি ছাড়িনি, সেদিনই দিল্লীর এক সেমিনার-এ দেখা হয়েছিল। বললাম, ইংরেজদের গালাগালি দিতে গেলেও ইংরেজীটা ভাল হওয়া দরকার।

ইংরেজী ভাষার উৎকর্ষ ও তার অন্তহীন প্রবাহ সম্পর্কে সুবিমল রায় কতটা ওয়াকিবহাল সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি সম্পূর্ণ অন্য কথা ভেবেছি। চেম্বার অফ কমার্স-এর জন্যে তৈরি এই লেখাটি আমি সপ্তাহ দুই আগে রচনা করি। পড়েও শোনাই। তারপর দিনই বোধ হয় শান্তিনিকেতন চলে গেলেন। সেদিন লেখাটা শুনে খুশী হননি এতটুকু। বললেন, বক্তৃতা লেখাটা কিছুই হয়নি। এ লেখা চলবে না। নতুন করে লিখো। সুবিমল রায় আমাকে কতটা জানেন আজও আমি জানি না, কিন্তু আমি তাঁকে চিনি। লেখাটা আমি ফেলে রাখি। পরিবর্তন আমি কিছুই করিনি। এমন কী 'Kaleidoscope' শব্দটাও নতুন নয়। দ্বিতীয়বার ঐ একই লেখাটা আজ পড়লাম। দেখলাম পছন্দ হয়েছে। সুবিমল রায় বললেন, চমৎকার। ব্যাপারটা অর্থহীন মনে করলে ভুল হবে। মানুষটাই এই ধরনের। ইংরেজীতে অভিভাষণ খাড়া করা তার পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ। ব্যস্ত মানুষ। সময়ও অপ্রচুর। তাই সামান্য কাজের ভারটি

তিনি আমাকে দিয়েছেন। সুবিমল রায়ের ইংরেজী জ্ঞান সম্পর্কে আমার যদি কোথাও সামান্য রকম সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে আমি ভুল করবো। অপ্রাসঙ্গিক কথায় সেটুকুই তিনি সচেতন করেন। আমি মানুষটির অনুগ্রহভাজন। অনুগৃহীত-র বিনয় আমার চেহারায় সর্বসময়ই উপস্থিত। এ সমস্তই সুবিমল রায়ের। গোটাই যেন অনুলিখন। সুবিমল রায়ের ইংরেজী বিদ্যার বহর সম্পর্কে আমার অনুমান সম্পূর্ণ অনুচ্চার্য।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এসে সুবিমল রায় বলেন,

—আসলে তোমরা কোন্ কথায় কী মনে কর, তাই কিছু বলতে ভয় হয়। তবে তোমাব হাত পাকছে হে, একথা আমি স্বীকার করি। এক জায়গায় মার্কিন মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে কিছু বলেছো। ওটা বাদ দিও। দিল্লী থেকে ফিরে এলে লেখাটা দিও। একবার চোখ বুলিয়ে নেব।

—আপনি যদি বলেন নিশ্চয়ই বাদ দেব। কিন্তু আমার মনে হয়, মার্কিন মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে আমি যে পরিসংখ্যান রেখেছি, সেটা স্টেট ডিপার্টমেণ্টের হিসেব থেকেই। ফিগারে কোন ভুল নেই। তাছাড়া আপনার বক্তৃতায় রাজনীতি ঘেঁষা একটা স্বকীয়তা, একটা ন্যাশনালিস্ট, মানে মোটামুটি একটা প্রগ্রেসিভ রোল আজ থাকার দরকার।

—'বলছো', সুবিমল রায় পুরো দৃষ্টিটা আমার মুখের ওপর তুলে ধরলেন।

—আমার স্যার তাই মনে হয়।

—একদিক দিয়ে তুমি ঠিকই বলেছো। তবে কোন কারণেই যেন পি. এল. ৪৮০ সম্পর্কে কিছু থাকে না। যেটুকু বলেছো এখন তবে থাক। কেটো না।

—আপনি মৃগেনবাবুকে আজ আসতে বলেছিলেন।

—কই মৃগেন কোথায়? এসেছে?

—অনেকক্ষণ বসে আছেন।

সিগারেট কেসটি সশব্দে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে মন্তব্য করলেন, 'অপদার্থ।' পরক্ষণেই মৃগেনবাবুকে ডেকে পাঠালেন।

—'আমার থাকাটা কী ঠিক হবে?' আমার অসোয়াস্তি লাগছিল।

—ক্ষতি কী?

—হয়তো ভাববেন, আপনার কানে কথাগুলো আমিই তুলেছি। আমার থাকাটা ঠিক হবে না।

—থাক তুমি। কান ভাঙাভাঙিগুলোই আমি ভাঙিয়ে দিতে চাই। আসলে কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই মৃগেনের।

নমস্কার জানাবারও বোধ হয় সুযোগ পেলেন না। মৃগেনবাবুকে দেখেই যেন জ্বলে উঠলেন সুবিমল রায়,

—আমাকে একবার জিগ্যেস করতে পারতে। বোলপুরে একটা ফোন করতে কী বাধা ছিল? ভেবেছো কী। এই যোগ্যতা নিয়ে কাগজ চালাবে। মন্ত্রীত্ব যদি নিতেই হয়, সে তো আমি পনের বছর আগেই যেতে পারতাম। কী করে ভাবলে দিল্লীর মন্ত্রীত্বের জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

মৃগেনবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, সুবিমল রায় সেদিকে কর্ণপাতও করেন না। মানুষটি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন,

—কাগজের প্রথম পাতায় বক্স করে আমার কাগজেই আমার সম্পর্কে মিথ্যে খবর ছাপা হচ্ছে। কাগজের সম্পাদক আবার আমিই। চমৎকার। এতে আমার শত্রুরা কী মনে করবে। সকলেই মনে ভাববে, দিল্লীর মন্ত্রীত্বের ওপর প্রচ্ছন্ন লোভ আমার আছেই। তোমাকে এতটা নিরেট আমি মনে করি নি। এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি না থাকে তবে ভরসা করবো কার ওপর! যাক, আজকে এই ভিত্তিহীন খবর সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিও।

'আমার একবার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত কাগজেই হৈ-চৈ

হচ্ছে। তাছাড়া আপনার তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ না শোনায়, বক্তব্য শেষ করতে পারেন না মৃগেনবাবু। একরকম ফুঁসে ওঠেন সুবিমল রায়,

—আজে-বাজে খবরের প্রতিবাদ করা ছাড়াও আমার হাতে কাজ থাকে। আমি দিল্লীর কৃপাপ্রার্থী নই, একথা সবাই জানে, শুধু আমার কাগজের নিউজ এডিটর মৃগেন জানে না।

সুবিমল রায় হঠাৎ ঘড়ি দেখে আমার দিকে ফিরে তাকান। 'সুবোধকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। তাকে একবার ডাকতেই হবে। আচ্ছা মৃগেন, তুমি এখন এসো। মাথার ওপর মুণ্ডুটা যে শুধু চুল আঁচড়ানোর জন্যে নয়, একথা তোমাকে দেখলে বিশ্বাস হয় না।

বেচারা মৃগেনবাবু। ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ছিল। ভয় পাচ্ছিলেন, কিন্তু অপমানবোধ নেই,

—আজ দিল্লী যাচ্ছেন ?

—পরশু ফিরবো। কেন কিছু বলবে ?

—ফিরেই আসুন। কাগজ সম্পর্কে কিছু বলতাম।

—খুব জরুরী নয় তো ?

—না, পরেই হবে।

—পরশু সন্ধ্যেতে আমি আসছি। ধ্রুব কী এখনও বাড়ি শুয়ে শুয়ে কাজ করছে ? সুখের পায়রা সব।

—না আসছেন। গত সপ্তাহ থেকে নিয়মিত আসছেন।

—কাগজ সম্পর্কে আমি নতুন কিছু ভেবেছি। আমি ফিরে এলে সব জানতে পাবে।

মৃগেনবাবু করিডরে আমাকে চেপে ধরলেন। ধুতির কোঁচা ঠিক করতে করতে চাপা রোষের সঙ্গে বলেন,

—শুনলে তো কথা। সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত বকাবকি করবার কোনো অর্থ হয়। তুমি তো সবই জান। আজও আমি জানতে পেলাম না 'সমন্বয়' পত্রিকার আমি কে! জুতো সেলাই

থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত করে চলেছি আজ দীর্ঘদিন। তোমার কী মনে হয় খবরটা ছাপার পেছনে এসব ভেবে দেখবার কোনো প্রয়োজন ছিল ?

—এ নিয়ে আর কথা না তোলাই ভাল। নতুন তো আর দেখছেন না! বিকেলে দেখা হবে, আপনি যদি রাজি থাকেন, মন্ত্রীত্ব নেবার গুজব সম্পর্কে আমিই লিখবো। প্রমাণ করবো কালকের ভুল খবরটা ছেপে আমরা কিছুমাত্র ভুল করি নি।

—খুব ভাল হয়। তুমি সোজা আমার ঘরেই চলে এস।

মৃগেন দত্তকে দেখছি দীর্ঘদিন। একদা সুবিমল রায়ের ছিলেন ডান হাত। কাগজের নোঙরা রাজনীতিতে এই মানুষটিকে চূড়ান্ত ব্যবহার করা হয়েছে এককালে। আজ আশা ভরসা সবই গেছে। সমস্ত কিছুতেই আক্ষেপ, অনুযোগ আর মান-অপমান। বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতাও দীর্ঘদিনের। খুশী করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু সুবিমল রায় আজকাল কেন যেন এই মানুষটিকে সহ্য করতে পারেন না।

সু:বাধ মুখার্জি সস্ত্রীক অপেক্ষা করছিলেন। উচিত ছিল কিন্তু কেউই দেখলাম আমাকে চিনলেন না। দুজনেই বেশ মোটা হয়েছেন। সুবোধ মুখার্জির পরণে ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে জহরকোট। নীতা মুখার্জী:কে আমি অনেক দিন পরে দেখলাম। সাদা সিল্কের শাড়িতে সাদা হাতির ছোট ছোট ফিগার। কাঁধ ও গলা বিবর্জিত এক ফালি ব্লাউজ থেকে বেরিয়ে আসা সুডৌল হাতে শৈশবের প্রথম টিকার গভীর ক্ষত। দৃষ্টি গভীর। মুখশ্রী পরিণত।

ঘরে ঢুকতেই সুবিমল রায় হাঁ হাঁ করে উঠলেন,

—নীতাকে সঙ্গে এনেছো। একথা জানি না তো। বস বস। তারপর কী মনে করে বল। কারণে এসেছো নিশ্চয়ই।

নীতা মুখার্জির কৃত্রিম অভিমান,

—যদি বলি অকারণে। আমি কী আসতে পারি না।

—এলে খুশী হতাম, কিন্তু তুমি আস নি।

—কী করে বুঝলেন ?

—তা যদি হতো, আমায় ডেকে পাঠানোর অপেক্ষা করতে না। আসলে তুমি সুবোধ মুখার্জির স্ত্রীর পরিচয়ে এসেছো। পিনাকীর মেয়ের অধিকার নিয়ে আমার এখানে আসনি।

—বাব্বা আপনি কী অসম্ভব খুঁটিয়ে বিচার করেন।

—কথাটা যখন উঠলো, সত্যি কথাই বললাম। তুমি পিনাকীর মেয়ে কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাইরের ঘরে আর দশজনের মত অপেক্ষা করছো, এটা আমার খুব ভাল লাগলো না। বিপ্লবীই হও, আর যাই হও ; আমার কাছে তুমি সেই নীতাই আছো। যাক, সুবোধ হঠাৎ জানান না দিয়ে কী ব্যাপার বল তো ? এমন দিনে এলে, দু'দণ্ড বসে যে গল্প করবো।

সুবোধ মুখার্জির চোখেমুখে খুশী খুশী ভাবটা লেগেই ছিল। ব্রিফ কেসটি কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলেন,

—খুব ব্যস্ত ?

—লেগেই আছে।

—কাগজের খবরটা কী সত্যি ?

দমকা হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ে। নীতা মুখার্জির হাসিটা কৃত্রিম। চেষ্টাকৃত।

—দিল্লীর মন্ত্রীত্বে আমার ইচ্ছে নেই। আগ্রহ তো নেই-ই। পনের বছর আগে গেলাম না তো আজ। সত্যি কথা বলতে কী—এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। যেই করুক, সে আমার মিত্র নয় নিশ্চয়ই। তা কী মনে করে হঠাৎ তোমরা দুজনে ?

—আপনাকে একটু বলে দিতে হবে।

—কী ব্যাপার ?

—আমি একটু সুপারিশের জন্যে এসেছি। সামান্য ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু বাধ্য হলাম।

—আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পেলে খুশী হব। কি ব্যাপার বল ?

—মস্কো যাবার পাশপোর্ট আমাকে দিচ্ছে না. এমন জঘণ্য ব্যাপার।

—কী বলছে কী ?

—অজুহাত একটা দিলেই হলো। আপনাকে একটু বলে দিতে হবে।

—তা না হয় দিলাম। কিন্তু আজকাল তোমাদের পার্টিতে যা হচ্ছে। কে যে কোন্ 'ওয়ে'-তে চলেছো বোঝা মুশকিল। কিন্তু তোমরা তো ভাল কমিউনিস্ট। তোমার মস্কো যাবার পাশপোর্ট আটকানোর কী কারণ থাকতে পারে ?

—দশ বছর আগেকার রিপোর্ট হয়তো এখনও চালানো হচ্ছে। আপনি তো সবই জানেন, চীনা আক্রমণের পর, সেন্ট্রাল কমিটি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই চীনকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করে যাঁরা কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম।

—তুমি ডি আই আর-এ ধরাও তো পড়নি ?

—না।

—তোমার পাশপোর্ট আটকায় কী কারণে ?

—বুঝুন ! সমস্তটাই বুরোক্রাট সেট-আপের ব্যাপার। কোনো যুক্তি নেই। তাই কিছু করবার আগে আপনাকে জানাবার ইচ্ছে হলো।

—এদের যুক্তিটা কী ?

—আমি বি কে মিত্রের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কাজ হলো না। স্পষ্ট জানালেন, তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

—সিনিয়ার আই সি. এস.-গুলোর মধ্যে ঐ লোকটাকে আমি দেখতে পারি না। কেষ্টপুর ফায়ারিং ইনকোয়ারী কমিশনের সময় ভদ্রলোককে দেখেছি। তুই একজন সিনিওর আই সি এস, এতকালের এ্যাডমিনিস্ট্রেটর, বলে দিলি আমাদের প্ররোচনাতেই গোলমালের সূত্রপাত। চোখ রাঙিয়ে কথা বলা আমাদের মজ্জাগত

হয়ে গেছে। গুলি চালানোর কোনো যুক্তি নেই। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। শুনলে আশ্চর্য হবে, আমার মুখের ওপর বলে দিল বি. কে মিত্তির—এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো আর খোল বাজানো এক জিনিস নয়। আপনার মিলে লক আউট করবেন আর দরোয়ানীতে আমাদের ব্যবহার করবেন। এতদিন করেছেন—আর নয়।

—ভদ্রলোক সিনিক্। শুনছি চাকরি থেকে আগেই অবসর নিচ্ছেন।

—পাগল। তবে বি কে মিত্তিরকে আমি কিছু বলতে পারবো না। দিল্লীতে যাচ্ছি, দেখি কী করতে পারি। তবে তুমি কমরেড-জ্ঞানপ্রকাশের সুপারিশ সঙ্গে পেশ করলে না কেন? কমরেড জ্ঞান প্রকাশের কথার মূল্য আজ অসীম। দিল্লীতে তো দেখেছি।

—আমি সে কথা ভেবেছি। তবে পার্টি লেভেলে এখনই আমি কিছু করতে চাই না। তাতে বাধাও আছে। দুম করে পাশপোর্ট আছে এমন কেউ হয়তো মনোনীত হবেন।

—দিল্লী আমি আজই যাচ্ছি। একটা সুরাহা হবেই। সামান্য ব্যাপার। যাচ্ছো কবে?

—সাতাশে।

—দেরী আছে। মস্কোতে শ্রেণী সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকবে কতদিন? দেখো এখানকার ইউনিয়ন আবার তোমার বেহাত না হয়ে যায়। লিলুয়া গ্লাস ফ্যাক্টরীর মধ্যে একটা গোলমাল পাকছে। আমাকে তুমি একটু দেখো।

—আপনাকে জিগ্যেস না করে কোন দিন কিছু করেছি?

—কথাটা যখন উঠলোই তখন তোমাকে একটা অনুরোধ করি। তুমি শ্রমিক নেতা, শ্রমিক স্বার্থ তুমি দেখ, আমিও যথাসাধ্য সহযোগিতা করে থাকি তুমি জান। লোকে যাই বলুক, তুমি তো আমাকে চেন। লিলুয়া গ্লাস ফ্যাক্টরীর পুরোপুরি মালিকানা যে আমার নয়; আরও পাঁচজন ডিরেক্টর আছেন। এটার ওপর তোমার জোর দিতে হবে।

বলতে হবে আমিই একমাত্র নই। সবটাই আমার ইচ্ছের ওপর চলে না। পোস্টারে পোস্টারে আমাকে শুধু ক্ষত বিক্ষত করা কেন? শুনছিলাম কে একজন বসির আহমেদ আজকাল ফ্যাক্টরীর খুব পপুলার লীডার। তোমাদের এতদিনের ইউনিয়নটা ভাঙছে। একদিক দিয়ে সুলক্ষণই বলা চলে। কিন্তু এই বসির আহমেদটা কে? সে তো তোমার মতই কমিউনিস্ট।

সুবোধ মুখার্জির ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে ওঠে।

—অশিক্ষিত একটা গোঁয়াড়। অবশ্য ইউনিয়নের মধ্যে একটা আল্ট্রা লেফ্‌ট্‌ উইং অসম্ভব চেষ্টা করছে। কিন্তু ওটা শ্রমিক আন্দোলন নয়। আপনি ভাববেন না, নেতৃত্ব আমার হাতেই আছে। পোস্টারে ক্ষত-বিক্ষত আমাকেও করে, কিন্তু ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। ট্রাইবুনালের পর প্রথমটা কিছু সুবিধে করেছিল। এখন আবহাওয়া অন্য রকম। ঐ সময়টা আমি একদম দেখতে পারিনি, কেরালায় ছিলাম।

—আমি একটা জিনিষ বুঝি না, ফ্যাক্টরীর আশীভাগ লোক বাঙালী হিন্দু, অনেকেই আবার বাস্তুহারা। সেখানে কানপুরের অবাঙ্গালী এক মুসলমান কী ভাবে একজন পপুলার লীডার হয়! বাঙলা দেশের যুবশক্তি কী মরে গেছে?

প্রয়োজন কিছু ছিল না। ঘর থেকে আমি সরে যেতেও পারতাম, কিন্তু কৌতূহল হচ্ছিলো। মজাও লাগছিলো। টাইপ করা কাগজ-গুলো নিয়ে আমি ব্যস্ততার ভান করি।

সুবিমল রায়ই পরিচয় করিয়ে দেন।

—অরুণকে চেন নিশ্চয়ই।

ভদ্রতার হাসি টেনে নমস্কার বিনিময়। অকৃপণ সৌজন্যবোধে আমি অভ্যস্ত,

—চিনি! য়ুনিভারসিটিতে আমাদের সময়ে আপনাকে দেখেছি।

শেষ কথাগুলো আমি নীতা মুখার্জিকে বললাম।

—'তাই বুঝি', নীতা মুখার্জির সপ্রসন্ন হাসি।

নাম শুনেছেন, কিন্তু চিনলেন না সুবোধ মুখার্জি।

ব্যাগ খুলে শক্ত একটা খাম সুবিমল রায়ের হাতে তুলে দিয়ে নীতা মুখার্জি অনুযোগের সুরে বলেন,

—ভুলে যাবেন না কিন্তু। পাশপোর্টের সব কাগজ পত্তর এতেই পাবেন।

—মস্কো যাচ্ছো, এটা কিসের ডেলিগেশন ?

—বেলগ্রেডে বিশ্ব শ্রমিক অধিবেশন থেকে একটা নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছি। বিশ্ব নারী মঙ্গল কনফারেন্সে নীতাকে যেতে হচ্ছে মস্কো। ঐ সুযোগে নীতার অপারেশনটা মস্কোতে করাতে চেষ্টা করবো। ডাঃ তামিনোভস্কীর মত গাইনি হয়তো দুনিয়ায় খুব কমই আছে। আমার নিজেরও মস্কোতে কিছু কাজ আছে। এই সুযোগে সব কটা কাজ কভার করবো।

নীতা মুখার্জি চতুর হেসে বলেন,

—আপনি কাজের মানুষ। কালই দিল্লীতে টেলিফোন করে আপনাকে মনে করিয়ে দেব।

—তোমাদের কথা আমার নিশ্চয়ই মনে থাকবে।

ওঁরা চলে যেতেই সুবিমল রায় একটু প্রসন্ন হেসে বলেন,

—চেন ?

একটু যেন অর্থপূর্ণ তাকানো।

—চিনি।

—কতটুকু জান ?

—কমিউনিস্ট।

—শুধু এইটুকুই।

—আর কী জানতে চান ?

—মাঝে কেমন সব উল্টো-পাল্টা শুনেছিলাম। সুবোধ মুখার্জি সত্যিই তবে ভাল কমিউনিস্ট !

—তাই তো জানি। নীতা মুখার্জিকে তো আপনি ভালই চেনেন দেখলাম।

—জাস্টিস পিনাকী দত্তের মেয়ে।

সুবিমল রায় আর সময় দিলেন না। দর্শনপ্রার্থী আরও কেউ কেউ প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। দু'একটা প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে ওপরে চলে গেলেন।

চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। কেন যেন সুবোধ মুখার্জির কথা আজ আমায় পেয়ে বসলো। আমাকে চিনতে না পারায় আমি এতটুকু অখুশী হয়নি। কিন্তু মনের কোথাও যেন শান্তি পাইনি।

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। চুটিয়ে পার্টি করছি তখন। যোশী-অধিকারী পীরিয়ডের তখন রমরমারম অবস্থা। এমন সময় সুবোধ মুখার্জি এলেন। বহুবাজারের শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসেই আমি ভদ্রলোককে প্রথম দেখি। প্রথম থেকেই সুবোধ মুখার্জি নবীনদের মধ্যে একটা সাড়া এনেছিলেন। বড় লোকের ছেলে, বিলেত থেকে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে এনে, শেষে বাঙলা দেশের শ্রমিক আন্দোলনে এসে ঠেকায় আমরা মুগ্ধ। শুনেছিলাম বিলেতে থাকতে সুবোধ মুখার্জি জি বি. সি-র নিকট সান্নিধ্যে ছিলেন। পামী দত্তের হাতেগড়া মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সুবোধ মুখার্জি একজন।

মর্ক্‌স্‌বাদের কেতাবী ব্যাখ্যায় হাত পাকালেও অস্থির তারুণ্য ও মধ্যবিত্তের জটিল মানসিকতায় আমরা সবাই কাতর। বিলেত ফেরত বড়লোকের ছেলে কমিউনিস্ট হয়ে আমাদের সঙ্গে এক মাদুরে বসবেন, ভাঁড় ভাগাভাগি করে চা খাবেন; আমরা খুবই খুশী হয়েছি। বারে জয়েন করবেন কী না প্রশ্ন করায় হেসে বলেছিলেন একদিন, শ্রেণী সংগ্রাম আর বুর্জোয়া হাইকোর্ট একসঙ্গে চলে না। ট্রেড ইউনিয়নই আমি বেছে নিয়েছি।

পার্টি ফোরাম সুবোধ মুখার্জিকে প্রাধান্য দিয়েছে। দিন গেছে; অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। শ্রমিক নেতা হিসাবে সুবোধ মুখার্জি

ভারতের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এলেন কমরেড রণদিভে। সুবোধ মুখার্জি পলাতক। নীতা দত্ত তখন লক্ষপতি পিনাকী দত্তের প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছেড়ে রয়েড স্ট্রীটে বত্রিশ টাকা ভিজিটের কুকুরের ডাক্তার পরিমল দে-র ফ্ল্যাটে আত্মগোপন করে আছেন।

অনেকের মত আমিও তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছি। দু'একটা সেল মিটিং-এ এঁদের সঙ্গে দেখা হয়। গোপন সংবাদ দেওয়া নেওয়ার খাতিরে সুবোধ মুখার্জির সঙ্গে আমার একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। নীতা দত্ত তখন আমাকে চিনতেন। পার্টি করতেন। একই সঙ্গে দু'তিনজনের সঙ্গে প্রেমও করতেন দেখতাম। তবে চূড়ান্ত বরমাল্য যে সুবোধ মুখার্জির জন্যে অপেক্ষা করছিল আমরা কেউই সেকথা ভাবতে পারি নি। অনেকের সঙ্গেই নীতা দত্ত গ্রেপ্তার হন। য়ুনিভারসিটির সহপাঠী কমলেশও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে। সবাই বেল-এ ছাড়া পায়। কিন্তু মামলার শুনানীর পরবর্তী তারিখে কোর্টে হাজির হন নি নীতা দত্ত। নীতা দত্তের অন্তর্ধানে সবাই ক্ষুব্ধ। এবার বেল পেল না কেউ। লালবাজারে কয়েক প্রস্থ ধোলাইয়ের পর জেলে পাঠানো হলো। দমদম জেলে কমলেশের মুখে সব শুনেছি। নীতা দত্তর কোনো হাত ছিল না। পার্টির মঙ্গলের জন্যেই তিনি আত্মগোপন করেন। ওপর থেকে এই রকম নাকি নির্দেশ ছিল। সত্যমিথ্যা জানি না। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত করে বলা চলে, জেলে বসে যখন ভেবেছি বিপ্লব এসে গেছে, বাংলার বুদ্ধিজীবি তরুণ ও ছাত্রদল যখন দিনের পর দিন নেতৃত্বের মিথ্যা আস্ফালনে বিভ্রান্ত হয়ে শুধু মার খেয়েছে; নীতা দত্ত-র পদবী হয়েছে মুখার্জি। আণ্ডার গ্রাউণ্ড থাকাকালীন অবস্থায় নিয়মিত ডিনার সারতেন পার্ক স্ট্রীটের পিকিং-এ। বত্রিশ টাকা ভিজিটের কুকুরের ডাক্তার পরিমল দে-র ফ্ল্যাটের নরম বিছানায় শুয়ে সর্বহারা বিপ্লব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

দিন যায়। সময় অতিবাহিত হয়। অনেক কিছুর পরিবর্তন

হলো। আমিও ফুরিয়ে এসেছিলাম। পার্টি ছেড়ে দিলাম। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্‌টেটিভের চাকরি নিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে গেলাম।

তারপর?

সে অনেক কথা। এই মুহূর্তে সে খুব কাজের কথা নয়।

এখন সুবিমল রায়কেই আমি চিনি। সুবিমল রায়তেই আমি সফল। সুবিমল রায়তেই আমি সার্থক।

অক্লান্ত দেশসেবক ও সংগ্রামী মানুষ হিসাবে তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা আজ সর্বজনবিদিত। ক্ষমতার লোভ নেই। ক্ষমতাশীল কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রাখবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। মানুষটির বিস্তৃত জীবন অস্পষ্ট। পদ্মাপারের অর্ধশিক্ষিত ভাগ্যান্বেষী সামান্য এই মানুষটি কী ভাবে অকল্পনীয় ও দুর্লভ ভবিষ্যৎকে জয় করেছেন, কত দুরাশাকে সফল করেছেন, অর্থ, যশ-সম্মান ও প্রতিপত্তি তাঁর অসম্ভব জীবনেতিহাসে গতি দিয়েছে সে সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা বহু কাহিনী আজ বাজারে প্রচলিত।

সামান্য মানুষ আমি। বিদ্যে বুদ্ধিও যৎসামান্য। তবু কী ভাবে এই মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয়, কী যোগ্যতা নিয়ে আজ সঙ্গে থাকি, কথা প্রসঙ্গে জানাবার ইচ্ছে রইলো। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে ইংরাজী শোনাই আর ক্যালাইডস্কোপ্‌ শব্দের ব্যবহারের ঔচিত্য নিয়ে আলোচনা করি সে আখ্যান বর্ণনা করবার ইচ্ছে রইলো।

জীবনটাই ক্যালাইডস্কোপিক্‌। নিতান্তই খেলার চোঙ বিশেষ। জীবনের এই নাটমঞ্চে অদৃশ এক শক্তি যেন নানা রঙ আর বিচিত্র সব আকৃতির ঘূর্ণি ফেলে যাচ্ছে। অবিশ্রান্ত প্রবহমান এই আবর্তে কত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ঐক্যতান। বুদ্ধিজীবির বিভ্রান্তিকর জ্বালা। সে অসহ্য প্রতিফলণ। আপাত অদৃশ্য সেই ছায়াবাজীতে আমরা শুধু আসছি যাচ্ছি।

ফোন শুধু অফিসে নয়, বাড়িতেও আমাকে ধাওয়া করেছে। সুবিমল রায় যে মন্ত্রীত্বের কাঙাল নন, সংবাদপত্রের খবরটি যে নিতান্তই ভিত্তিহীন সারাদিন একথা জানাতেই ব্যস্ত ছিলাম।

খেতে বসেছিলাম। এত রাত্রে ফোনের ঝনঝনানি ভাল লাগে না। গোপালকে বললাম, বল আমি ফিরি নি। ফিরতে রাত হবে। নামটা জিগ্যেস করে রাখিস।

টেবিলের উল্টোমুখে সুতপা। এটা-সেটা এগিয়ে দিচ্ছিলো। খাচ্ছিলো। একটু গম্ভীর। আজ মদ একটু বেশী খেয়েছি। তবে গ্যারেজের তালা খোলা নিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হৈ-চৈ কিছু করিনি। সুতপার এত চুপচাপ থাকবার সকারণ কোনো যুক্তি ছিল না আমার কাছে। তবে গাম্ভীর্যটুকু উপেক্ষা করেছি। আবহাওয়া সহজ করবার জন্যে বললাম,

—সারাদিন আজ শুধু ফোন। সুবিমল রায় কী দপ্তর পাচ্ছেন সে সম্পর্কে গুজব ছড়াচ্ছে। রেলমন্ত্রী না তথ্য ও বেতার দপ্তর জানতে চাইছেন। ব্যাপারটা ষোল আনাই গুজব অনেকে এ কথা বিশ্বাসই করে না। অবশ্য সুবিমল রায় আজ দিল্লীতে যাওয়ায় খবরটা আরও ছড়িয়েছে।

সুতপা চুপচাপ। মাছটা এগিয়ে দিল। আমি বলে চললাম,

—য়ুনিভারসিটির বিরজা মিত্র থেকে ক্লাইভ স্ট্রীটের রাঘব বোয়াল। দুপুর বেলা কবি অমল ঘোষ ফোন করছেন। পুরস্কার-টুরস্কারের চেষ্টা আর কী!

—টেলিফোন অপারেটারের চাকরি, সুতপার কথায় একটু খোঁচা ছিল।

—উপায় কী!

—এত নিরুপায় হবারই বা কী আছে।

চামচটা শব্দ করে রাখবার পেছনে একটা উপেক্ষা মিশ্রিত বিদ্রূপ ছিল যেন সুতপার। তবে সুতপার মেজাজের ঝাঁজটা আমি উপেক্ষা করতেই চেষ্টা করি,

—টেলিফোন করলে তুমি ঠেকাবে কী করে।

—কাজকর্ম নেই ?

—তুমি কি বলতে চাইছো ?

—সুবিমল রায়ের তল্পি বহন করেই চলবে ?

—'চলছে তো', দপ করে জ্বলে ওঠাটা আমার কানেই বেসুরো বাজলো। সুতপার বড় পরিবর্তন হলো না। জল খাচ্ছিলো। শূন্য গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে এক নজর তাকিয়ে বললো,

—এ চলার দরকার কী। সবই ছেড়ে দিয়েছো। লেখাপত্তর ছেড়েছো। পড়াশোনাও গেছে। সুবিমল রায় আর সুবিমল রায়।

—তুমি যে কী চাও আমি বুঝতে পারি না। সুখী তোমার মত মানুষ কোনো দিন হতে পারবে না। খুশীও তোমাকে আমি করতে পারলাম না।

—প্রশ্নটা আমাকে নিয়ে নয়। 'সমন্বয়' পত্রিকা ছাড়া অন্য কাজে তুমি যাও কেন ? তোমার সময় নষ্ট হয়। বদনাম হয়। তুমি দেখছি দিনে দিনে সুবিমল রায়ের রাজনীতির চীফ এনভয় হয়ে যাচ্ছো।

—শুধু তাই দেখলে। ইনটেলেকচুয়ালদের ক্রাইসিস তুমি বুঝতে পারবে না।

—চমৎকার ডিফেন্স।

—মানে ?

—এটা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। তোমার বদনাম হয় আমি চাই না।

—আমি গ্রাহ্য করি না।

—এ সবের মধ্যে তুমি না গেলেই তো পার। তাতে আমি সুখী হবো।

—কেন বদনামটা কে করে ?

—তোমাকে লোকে অন্য ভাবে চেনে।

—আদর্শের কথা বলছো। বড় বড় কথা হলো। ওসব করে আমি অনেক ঠকেছি। দেশসেবকদের ভূমিকা তো দেখছি।

—তাতে দেশসেবার প্রয়োজন ফুরোয় নি।

—এ সব তোমার বিলাস। আমি অনেক ঠকেছি, আর হারতে রাজি নই। ভিক্‌টিম্‌ অফ মিস্‌ফরচুন হতে আমি চাই না।

—তুমি যেন কেমন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছো। বছর খানেক আগেও তুমি অতটা বদলাও নি।

—তাই তো আমি চাই। পারফেকশনের পেছনে দুনিয়া ছুটছে, আই এ্যাম অল্‌সো কারেক্‌টিং মাই এরারস্‌। আমার মদ খাওয়া নিয়ে চেঁচামেচি কর, মানে বুঝি, কিন্তু আমার সব ব্যাপারেই দেখছি তোমার বক্তব্য শুধু বাড়ছে।

—আশ্চর্য লাগে, তর্কও তুমি আগের মত করতে পার না। তোমার যুক্তি নেই, অজুহাত আছে। অন্তরের সঙ্গে যা বিশ্বাস কর না, শ্রদ্ধা করতে পার না, তুমি আজ সেটাকে জাস্টিফাই করবার চেষ্টা কর। তোমাকে খাটো করে গৌরব আমার বাড়বে না।

মনে হলো সুতপা যেন টুক্‌টুক্‌ করে রান তুলে যাচ্ছে। আমি এবার মিড স্টাম্প ওড়াতে চেষ্টা করি,

—আমি জানি এ সবের পেছনে কে।

—আমার বক্তব্যটা বুঝতে চাইছো না।

সুতপার কণ্ঠে প্রচণ্ড একটা দম্ভ আমার কেন যেন অসহ্য লাগে। চোখের ওপর চোখ রেখে বলেছি,

—আসলে তোমার নিজের কোনো সমস্যা নেই। এ এক ধরনের দুঃখবিলাস। অভয় মিত্তির লেনের সেই যুগীটার ভাড়াটে যদি থাকতে, বিরাজনলিনী গার্লস স্কুলে জিরানডিয়াল ইনফেনেটিভ তোমাকে আজও যদি ক্লাসে বোঝাতে হতো, তখন দেখতে আজকের এই ডিনার-

টেবিলের দুঃখ তোমার পেয়ে বসতো। এই নিয়ম। এই রকমই হয়। লোকে আমার বদনাম করে, করুক। অরুণ সান্ন্যালের 'ইস্তাহার' উপন্যাসের নাকি তুলনা নেই। কিন্তু তার জন্যে আমি কী পেয়েছি? দেশ আমাকে তার জন্যে কী দিয়েছে?

—পয়সা হয়তো পাওনি কিন্তু ঐ বইটার জন্যেই লোকে এখনও ভালবাসে। সম্মান করে। রিপ্রিন্ট্ হচ্ছে কবে জানতে চায়।

—'ইস্তাহার' আর বেরুবে না। সুবিমল রায়ের তল্পি বহন করে কী হয়েছে, সে কথা তোমারই বেশী জানা থাকা উচিত। এই ফ্ল্যাট আমি করতে পারতাম এ পাড়ায়? গাড়ি চড়বে ভেবেছো কখনও? ফ্রিজিডিয়ার, তোমার প্রফেসারী? পর্যাপ্ত খরচা করবার সঙ্গতি? কিন্তু সুবিমল রায়ের অপরাধের শেষ নেই।

—আমি ঝগড়া করতে চাইনি।

—তুমি আজকাল আমাকে অপমান করো।

—এ তোমার মিথ্যে অভিযোগ। তাই কী আমি করতে পারি!

সুতপার অনুত্তেজিত কণ্ঠ আমাকে আরও বেশী অসহ্য করে তোলে,

—অন্যের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমার দোষ ধরতে যেও না। কমিউনিজম, বিশ্বপ্রেম—সবই যৌবনের গাঁজিয়ে ওঠা ফেনা। ত্রিশ বছর বয়সের পরেও যে লোক কমিউনিস্ট পার্টি করে তার মগজে কিছু নেই। নিজে থেকে সবই তো দেখেছি। আর আজ তো প্রমাণ হয়ে গেছে পৃথিবীতে মার্ক্স্‌বাদই বড় কথা নয়। আর যাই হোক কমিউনিজম পৃথিবীতে আদৌ সম্ভব নয়।

—রাজনীতি আমি করি না। কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার মত দৃঢ় প্রত্যয়ও আমার নেই। সে কথা আমি বলতে চাই নি। তোমার মধ্যে যে গুণ ছিল, সুবিমল রায় তাঁর ইচ্ছে মত ব্যবহার করে তোমার ক্ষতি করছেন। তুমি লিখতে, আজকাল 'সমন্বয়'-এর কাজ ছাড়া কিছুই লেখো না।

—কার জন্যে লিখবো। ভাবছি বাংলায় আর কিছু লিখবোই না। পড়বে কে? বুঝবে কারা! চুতিয়ার দেশ।

সুতপা উঠে গেল। পুরোটা হয়তো খেলো না। আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি,

—লোকে আমাকে নিন্দে করে, ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। কতগুলো অশিক্ষিত আণ্ডারনারিস্ট লোক, তাদের আবার মতামত!

সুতপা সামনে থাকলে হয়তো অশোভন কিছু করে বসতাম। সমস্ত বিরক্তি, রাগ আর আক্রোশ আমার কাঁচের গ্লাসের ওপর গিয়ে পড়ে।

ভাঙ্গা কাঁচ জড়ো করছিলাম। সুতপা এলো।

—ওঠো। কাঁচটা আমি সরিয়ে নিচ্ছি।

মুখ ধুতে উঠে গেলাম।

বেশ রাত। পড়ছিলাম। সুতপা কলেজের খাতা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে শুয়ে পড়লো। সুতপা যে কী বলতে চায় সত্যিই আমি বুঝি না। সুখী আমরা হতে পারবো না জানি। বাধাটা কোথায় আমি বুঝতে পারি না। অনেক সময় অসম্ভব হয়ে ওঠে। মনটা বুঝতে পারি না। এত কাছাকাছি আছি, তবু যেন অনেকটা ফাঁক। সুতপার শরীরে হাত দিতেও সময় সময় আমার ভয় হয়। এমন ভাবে তাকায় যেন অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছি। মেয়েদের সম্পর্কেই যেন মনটা খিঁচড়ে উঠে। সোপেনহাওয়ার সুতপা সম্পর্কে কী ভেবেছেন এমন প্রশ্নও মনে উদয় হয়েছে। আগে কিন্তু এরকম ছিলই না।

আবার একটা ফোন এলো।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিসিভারের দিকে এগিয়ে যাই। সুবিমল রায়ের মন্ত্রীত্বের খবর পেয়ে এত রাত্রে কেউ ফোন করবেন বলে মনে হলো না। একবার প্রণবের কথা মনে এলো। অতিরিক্ত মদ খেয়ে

পয়সা মেটাতে না পেরে হয়তো ছাড়িয়ে আনবার অনুরোধ করছে। প্রণব কয়েকবার এরকম করেছে। পরক্ষণেই খেয়াল হলো, অনেক রাত। বার বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

গলা শুনে বিরক্ত বোধ করি। টেলিফোনের অপর প্রান্তে মৃগেনবাবু।

—কী ভেবেছেন কী, ঘুমতে-টুমতে দেবেন না!

মৃগেনবাবুর ব্যস্ত কণ্ঠ,

—কে অরুণ! শীঘ্রই চলে এসো। তোমাকে না হলে চলবে না। প্রধানমন্ত্রী মারা গেছেন।

—বলেন কী! তিনি তো এখন তাসখন্দে।

—এইমাত্র খবর এসেছে। তুমি একবার এস।

—টেলিপ্রিণ্টার আর কী খবর দিচ্ছে?

—ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছি না। অন্য কোনো সংবাদ নেই। একা আমি পেরে উঠছি না। তুমি এস।

—ব্যস্ত হবেন না।

—আমার অবস্থা তো বুঝতেই পাচ্ছো। জীবনীটা তুমি ফাইনাল দেখে দেবে। শীঘ্রই চলে এস।

—আচ্ছা আসছি। এখনও সময় আছে।

রিসিভারটা হাত থেকে আমার খসে পড়লো।

সুতপা উঠে বসেছে। চিত্রার্পিতের মত আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

—প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী মারা গেছেন।

—প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী? তুমি আর কী শুনলে?

—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে হার্ট এ্যাটাক্ বলে মনে হয়।

—হার্টফেল?

—মৃগেনবাবু টেলিপ্রিণ্টার দেখে ঘাবড়ে গেছেন। নতুন করে

একটা পলিটিক্যাল ক্রাইসিস সুরু হলো তাতে সন্দেহ নেই। গভীর একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এর পেছনে থাকতেও পারে।

কথা বলতে বলতে আমি পোশাক পরিবর্তন করি। কিছুক্ষণ আগে সুতপার সঙ্গে আমার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের গুমট ভাবটা হালকা হয়ে আসে অনেকখানি। বললাম,

—এবার প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তোমার মনে হয় ?

—জানি না। বাইরে খুব ঠাণ্ডা, শালটা নিও। পুরো খবরটা জানবার পর আমাকে একটা ফোন করবে। সত্যিই যদি হার্টফেল করে থাকেন তবে অন্য কথা।

নিস্তব্ধ রাত্রি। বেশ শীত। জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। গাড়িকে চাঙ্গা করতে এ্যাক্সেলে পা রেখে ইঞ্জিনে শব্দ তুলতে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়।

সারাটা পথ উৎকণ্ঠায় কাটে। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর কথা ভেবে নানা চিন্তা মাথায় ভীড় করে আসে।

ঠিক এই রকমই আর একটা দিনের কথা মনে পড়লো। শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। বিকেল ছটা-সাড়ে ছটা হবে। কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে হঠাৎ আমাদের কাছে খবর এলো গান্ধীজী খুন হয়েছেন। আততায়ী সম্পর্কে কিছু জানা যাচ্ছে না। সে এক নিদারুণ পরিস্থিতি। প্রচণ্ড উত্তেজনা সময়ের ওপর বয়ে চলে। রিক্ত, বিষণ্ণ বেদনাপীড়িত সে মুহূর্তগুলো। রাস্তা-ঘাট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো সময় দাঙ্গা সুরু হবে বলে মনে করেছে অনেকেই।

নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও শ্বাসরোধকারী উত্তেজনার মধ্যে কিছুক্ষণ পর খবর এলো গান্ধীজীর আততায়ী জনৈক মারাঠী হিন্দু।

পত্রিকা অফিসে পৌঁছে সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম। সুতপার ফোন যখন পেলাম তখন আট বাই ছয় ছবি নিয়ে শাস্ত্রীজীর খবর রোটারীতে উঠতে যাচ্ছে।

—তুমি কী এখনও জেগে আছো ?

—ছ'বার চেষ্টা করেছি তোমাকে ধরবার। লাইন পাইনি। ফোন করবার কথা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে গেছো। যা হোক আর কী খবর পেলে ?

শাস্ত্রীজীর মৃত্যু স্বাভাবিক। তিনি হঠাৎ তাসখন্দে দেহত্যাগ করেছেন।

দিন দশেক পরের কথা। রাত তখন নটা। অনেকেই চলে গেছেন। ঘরে আমি একা। আজ কদিন ধরেই কাজের অত্যন্ত চাপ। প্রণবের পানীয় ঘটিত নিমন্ত্রণ রাখতে না পারার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু সময়াভাবে ফেলেনীর দুর্লভ ছবিটি দেখবার ফুরসুৎ না পাওয়ায় আফসোস হচ্ছিল।

লেখাটা অনেক আগেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ক্রমাগত ফোন আর স্তাবকদের ভিড়ে সুস্থির হয়ে বসতেই পারি নি। অন্য দিনের চেয়ে রবিবারের কাগজের এই লেখাটির গুরুত্ব আমার কাছে অনেকখানি। কারণ একমাত্র এই বিশেষ ফিচারটি আমার নিজের নামে প্রকাশিত হয়। মনে হয় পাঠকেরা পছন্দ করেন। সার্কুলেশন বেড়েছে এ দাবী আমি করতে চাই না, কিন্তু আমি জানি আমার এই ফিচারের জন্যে অনেকেই রবিবারের 'সমন্বয়' রাখেন। প্রতি সপ্তাহে শতাধিক চিঠি আমার হাতে আসে।

আজকের লেখাটার একটু বিশেষ গুরুত্ব ছিল। চীনের সম্প্রসারণ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভুটান ও নেপালের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা জোরালো বক্তব্য আমি রাখতে চেষ্টা করছি। সময় লেগেছে, কিন্তু লেখাটা শেষ করে ভালো লাগলো। ঘড়িতে নটা সতের। উঠছিলাম। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালো মিসেস ধরের সোফার। সেলাম ঠুকে জানালো,

—গাড়িতে মিসেস ধর অপেক্ষা করছেন।

অপ্রত্যাশিত না হলেও আকস্মিক। মিসেস ধর 'সমন্বয়'-এ এসে আমার খোঁজ করবেন আজ, এতটা আশা করি নি। আবার জানতে চাইলাম,

—মিসেস ধর গাড়িতে অপেক্ষা করছেন ?

সোফার সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

নিচে নেমে আসতে আমার সময় লেগেছে মিনিট দুই। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট ডজ কিংসওয়ে। মিসেস ধর এক টুকরো মিষ্টি হেসে গাড়িতে উঠে আসবার ইঙ্গিত করেন।

'—ইনিই অরুণ সান্যাল, আলাপ করতে চেয়েছিলেন', গাড়িতে উঠে বসে মিসেস ধরের মন্তব্যে ফিরে তাকাতেই কেন যেন বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠলো। পেছনের সিটের এক কোণে বসে আছেন স্বনামধন্য এ আর. দাশগুপ্ত। দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অন্যতম নায়ক। সুদর্শন, একহারা গড়ন। তীক্ষ্ণ শাণিত চোখের কোণে কৌতূহলী হাসি। অভ্যস্ত সাহেবী জেশ্চার নয়, করজোড়েই নমস্কার করলেন।

পরিচয় করাবার সুযোগ পান নি মিসেস ধর। ছোট্ট নমস্কারের সঙ্গে সহাস্যে আমি মন্তব্য করলাম,

—পরিচয় নেই, তবে মিঃ দাশগুপ্তকে আমি বিলক্ষণ চিনি।

'জানান না দিয়ে তোমাকে তুলে আনলাম। তোমার কাজের অসুবিধে হলো। মিসেস ধরের কণ্ঠে চেষ্টাকৃত সঙ্কোচের সুর।

—অসুবিধে আর কী, আমি উঠছিলামই। আজ অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশী থেকেছি। কিছুক্ষণ পরে এলে আমাকে অবশ্য পেতেন না।

—অন্য কোথাও কাজ আছে ?

—বিশেষ কিছু নয়, হঠাৎ আপনি অফিসে....

—স্বার্থে।

—অবাক করলেন দেখছি। আমার সঙ্গে....

—আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

—বেশ তো চলুন। আজ আবার আমার গাড়ি নেই।

দুর্মূল্য সিগারেট কেস মেলে ধরে স্মিত হেসে মিঃ দাশগুপ্ত বলেন,

—ক্রিমিনলজি আমাদের কিছু জানতে হয়েছে। কিন্তু আপনাকে আজও হিংসে করতে ইচ্ছে করে। অনেকে ভুলে যেতে পারেন

কিন্তু প্রেসিডেন্ট কেনেডী হত্যাকাণ্ডের পর আপনার প্রেডিকশন আজও আমার মনে আছে।

এতবড় একটা ব্যাপার আগে থেকে আপনি প্রেডিক্ট করলেন কেমন করে ?

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারি। অনেকেই এ প্রশ্ন করেছেন। স্বয়ং সুবিমল রায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছি ফোনে। তিনি গর্বিত। কন্সল অফিসের সুন্দর চিঠিখানা আমার কাছে সযত্নে এখনও রাখা আছে।

—সত্যিই আপনি আমাদের অবাক করেছেন। আপনি মশাই হাত গুনতে জানেন।

বিনয়ের হাসি টেনে বলেছি,

—এ তো ক্রিমিনলজির ব্যাপারই নয়। পুরোপুরি রাজনীতি। অযথা লেখাটার বড় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে আমার মনে হয়। লিখে জানান হয়তো কেউ দেন নি, কিন্তু আশঙ্কা আমার মত অনেকেই করেছেন।

—অসওয়াল্ড যে খুন হবে কই আমি একবারও ভাবিনি।

—ব্যাপারটা নিয়ে বেশী তলিয়ে দেখবার প্রয়োজন হয় নি। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর হত্যাকাণ্ড যে নিছক একটা খুন নয়, এটা সবাই জানেন। সেখানে ইতালিয়ন টেলিস্কোপিক্ রাইফেলের যে ভূমিকা, লী হার্ভে অসওয়াল্ডের তার চেয়ে বেশী দায়িত্ব ছিল না। সে দিক দিয়ে বিচার করলে টেলিস্কোপিক রাইফেল ও অসওয়াল্ড আমার চোখে সমান অপরাধী। তবে রাইফেলটা প্রাণহীন, অসওয়াল্ড কিন্তু সজীব মানুষ। সে মুখ খুললে মুশকিল আছে। সেই কারণেই জ্যাক রুবীর আবির্ভাব। হত্যাকাণ্ডের সমস্ত সূত্র নষ্ট করবার চেষ্টা। আমি তাই আশঙ্কা করে লিখেছিলাম, জবানবন্দী দেবার টেবিল পর্যন্ত অসওয়াল্ডকে হয়তো বাঁচানো সম্ভব হবে না। পরে দেখা গেছে অসওয়াল্ডকে বাঁচানোর আদৌ চেষ্টাই করা হয়নি। যুদ্ধোত্তর মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র এই তৃতীয় বড় রকমের ভুল করলো। কেনেডীকে সরানোতে আমেরিকাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

—নিগ্রোদের ব্যাপারটা তো ছিলই, ভিয়েতনাম পলিসির কোন পরিবর্তনের কথা কী তিনি ভাবছিলেন ?

—আদৌ নয়। বরং আরও তীব্র লড়াইতে যাবার ইঙ্গিত ছিল তাঁর কথায়। হেনরী ক্যাবট লজের মত ঝানু লোককে সায়গনে পাঠানোর অর্থই তাই। তবে আমি যেটুকু বুঝি কেনেডী ছিলেন ধনবাদী দুনিয়ার প্রকৃত যোগ্য প্রতিনিধি। কেনেডীকে হারিয়ে আমেরিকা সত্যিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

শীতের রাত। নির্জন রাজপথ। গাড়ি পার্ক স্ট্রীটে বাঁক নিল। মিসেস ধর প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করেন,

—আমি যে পত্রিকা অফিসে যাব নিশ্চয়ই তুমি ভাবনি।

—গুরুতর কিছু বলবেন বলে মনে হচ্ছে।

অর্থপূর্ণ একটু হেসে মিসেস ধর বলেন,

—পরে বলছি। সকাল থেকে তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছি। ব্যারাকপুর থেকে রওনা হবার আগে তোমাকে বাড়িতে পেতে চেষ্টা করলাম। পেলাম না। পথে পড়লো, এদিকে মিঃ দাশগুপ্তও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন।

চোখে চোখ পড়তেই মিঃ দাশগুপ্তের বিনীত অনুরোধ,

—একবার আসুন না আমার ওখানে। আপনার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করবার ইচ্ছে রইলো। আপনার লেখাই কাগজে পড়ি। অবিনাশ আমার বাল্যবন্ধু। অবিনাশ চৌধুরীর কাছে আপনার কথা শুনেছি।

—অবিনাশদা আমাকে খুবই স্নেহ করেন। গত মাসে দিল্লীতে আমার শেষ দেখা। এখন তো দিল্লীতে নেই। কী একটা কনফারেন্সে লেবানন গেছেন। পুরো মিডল ইস্ট কভার করবেন।

—প্রেসের কী একটা ডেলিগেশন। বুড়ো বয়সে বিলিতি মনিবের চাকরি নিয়ে ভালই আছে অবিনাশ।

মিসেস ধরের বাড়ির ফটকের সুড়ি ফেলা পথে অর্ধবৃত্তাকারে মোচড় খেয়ে গাড়িটা পোর্টিকোর তলায় এসে দাঁড়ালো। সোফার মিঃ দাশগুপ্তকে নিউ আলিপুরে ছাড়তে গেল। জমিয়ে গল্প করবার আর একবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক। বিদায় নিলেন ছোট্ট নমস্কারে। গাড়ি সরে যেতেই আমি মিসেস ধরকে অনুসরণ করি। তবু মিঃ দাশগুপ্তের কথাই ভাবছিলাম।

আজকের এই পরিবেশে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কী আশ্চর্য সব পরিবর্তন। যুক্তি হয়তো আছে, কিন্তু অবাক লাগে। সে আজ অনেক দিন আগেকার কথা। রাজনীতি করি তখন। ধরা পড়েছি। জেল থেকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে চলেছি প্রিজন ভ্যানে গাদাগাদি হয়ে অনেকের সঙ্গে। ভ্যানের মধ্যে শ্লোগান দিচ্ছিলাম ; এ আজাদি ঝুটা হ্যায়! ভুলো মাৎ!! ভুলো মাৎ!! বেল না পেয়ে ফিরছিলাম সেদিন। মিঃ দাশগুপ্ত তখন কী পদে ছিলেন মনে নেই। প্রিজিন ভ্যানের মধ্যে মিঃ দাশগুপ্তের এক ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিলাম। চোখদুটো জ্বলছিলো। সেদিন শাসিয়েছিলেন মিঃ দাশগুপ্ত, 'গাড়ির মধ্যে শ্লোগান দেবেন না। পিটিয়ে শেষ করে ফেলবো।'

'মিঃ ধরের সঙ্গে আবার বকবক করতে যেও না। তোমাকে দেখলেই আবার তাঁর রেমিনিসেন্স সুরু হয়ে যাবে', সিঁড়িতে উঠতে উঠতে মিসেস ধর একটু বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

—কেমন আছেন?

—ভালই!

আমার সঙ্গে মিসেস ধরের বিশেষ প্রয়োজনটা কী হতে পারে ভাবছিলাম। নিতান্তই অকারণেই আমাকে ধরে আনা, এমনও হতে পারে। অনেক দিন ছিলেন না, চারদিকের হালচাল হয়তো জানতে চান। তাছাড়া মিসেস ধরের অদ্ভুত অদ্ভুত প্রয়োজনের অভিজ্ঞতাও আমার আছে।

সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে নরম বিচিত্রিত বালিশটা কোলে টেনে মিসেস ধর বললেন,

—দাদা দিল্লী গেলে ফরিদাবাদে কার বাড়িতে ওঠেন তুমি জান?

মিসেস ধরের বেমওকা প্রশ্নে আমি একটু বিব্রত বোধ করি। মুহূর্তে সে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে খুব স্বাভাবিক, নিরুত্তাপ ভঙ্গীতেই বলি,

—কেন নিজের এম. পি কোয়াটার্সে ওঠেন। অবশ্য অনেক সময়....

কথা কেড়ে নিয়ে মিসেস ধর একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলেন,

—লুকোতে চেষ্টা করো না। দাদা ফরিদাবাদে কোথায় যান তুমি জান না?

'ফরিদাবাদে', আমি আমতা আমতা করি।

মিসেস ধরের চোখেমুখে দৃঢ় কাঠিন্যের রেখা ভেঙে পড়ে। কণ্ঠে একটা ঝাঁজ ছিল,

—তোমার কাছে এটুকু নিশ্চয়ই আমি আশা করতে পারি। সুলেখা বক্সীকে চেন?

—চিনি।

—সুলেখা বক্সীকে নিয়ে দাদার বুড়ো বয়েসে এ কী ভিমরতি! দিল্লী থেকে বিশ মাইল দূরে এই কল-গার্লের তিন কামরার ফ্ল্যাটে না উঠলেই আজকাল তাঁর আর চলে না।

—আমি অবশ্য সুলেখা বক্সীকে সামান্যই জানি। সে কথা যদি বলেন, ভদ্রমহিলাকে আমার ভাল লাগেনি। ফ্যাক্টরীর লেডী ডাক্তার, কল-গার্ল অবশ্য তিনি নন।

আঁকা ভ্রুলতায় চকিতে এক টুকুরো হাসি খেলে গেল,

—তোমার ভাল লাগেনি কেন?

—খুব চালিয়াত!

—শুধু এইটুকুই?

—মানে গোটাটা মিলিয়ে ভদ্রমহিলাকে আমার ভালো লাগে নি। ফিরিঙ্গীয়ানা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

—কিন্তু ভাইফোঁটার কথা ভোলে না। গতবছর ভাই দ্বিতীয়ার দিনেই ভদ্রমহিলাকে আমি প্রথম দেখি। দিল্লী থেকে ভাইফোঁটা দিতে আসছে—আমি কচি খুকী নই। সবই বুঝতে পারি। বৃদ্ধ বয়সে দাদার ভিমরতি ছাড়া কী বলবো।

ব্যাপারটা খুবই জটিল। কোনো মন্তব্য করতে সঙ্কোচ হয়। মিসেস ধর নিজের রোষ যেন চাপতে পাচ্ছেন না,

—সুলেখা বক্সী চালিয়াত শুধু নয়, পুরোপুরি একটা নোঙরা মেয়ে। সব খবরই আমি পেয়েছি। তুমি তো জান সবই।

—দিল্লীতে কবার দেখেছি। শুনেছি ভদ্রমহিলার স্বামী কেনিয়াতে ব্যবসা করতেন। স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে বছর দুই।

—কেনিয়ার জঙ্গলেও মিসেস বক্সীর জায়গা হয় নি। একবার ভাব তাহলে ভদ্রমহিলার দৌড়।

আপন রসিকতায় মিসেস ধর আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন। 'তোমাকে কিন্তু একটু বিশেষ প্রয়োজনে ডেকেছি। আশা করি তুমি লুকবে না', মিসেস ধরের চোখমুখ গম্ভীর হয়ে পড়ে।

—আপনার কাছে কোন দিন কোন কথা গোপন করেছি?

কার্পেটের ওপর চোখ রেখে মিসেস ধর ক্ষোভের সুরে বলেন,

—তুমি আজকাল নাম করেছো। প্রতিষ্ঠা হয়েছে তোমার। যোগ্যতাও তোমার যথেষ্ট। কিন্তু আমার কাছে তুমি আগের অরুণই আছো। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি, আজও সেই চোখেই তোমাকে দেখি।

—আমি অন্তত আপনার কাছে আগের অধিকার নিয়ে আসি।

—আমি জানি অরুণ। তাই খববটা শুনে তোমার কথাই মনে এলো। প্রথমটা খুব খারাপ লেগেছিল।

—কী ব্যাপার বলুন তো!

—সেই জন্যেই তোমাকে ডেকে এনেছি। আশা করি আমার কাছে তুমি কিছুই লুকবে না। এসব কথা জিগ্যেস করতেও খারাপ লাগে। তোমার অবশ্য সবই জানা আছে। তুমি আমার ছোট্ট ভাইয়ের মত।

—আপনি বলুন, কী শুনেছেন কী ?

—দাদা মিসেস বক্সীর নামে সিমলের বাড়িটা লিখে দিয়েছেন ?

—সিমলের ঐ কটেজ।

—এ্যাটর্নী দেবু সেনের কাছে শুনলাম। দেবু সেন উড়ো খবর দেবার লোক নয়। এ ব্যাপারে তুমি কতটা জান ?

—দেবু সেনকে ইদানীং পত্রিকা অফিসেও দেখেছি, কিন্তু সিমলের বাড়ি লিখে দেবার ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমার বিশ্বাস হয় না।

—কিন্তু তুমি তো একজন উইটনেস্। দলিলে তোমারও নাকি সই আছে।

—মিথ্যে কথা।

গুম হয়ে রইলেন মিসেস ধর।

গুমট ভাবটা আমিই ভেঙে বলি,

—দেবু সেন একথা বললেন আপনাকে। আশ্চর্য! আপনি ভাল করে জিগ্যেস করবেন তো। সিমলের বাড়ি সম্পর্কে আমি কোন দলিলই দেখিনি। আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।

—কথাটা দেবু সেন কী ভাবে জানতে পারে আমি জানি না। তবে একটা কিছু হয়েছে। সিমলের বিশ বছরের সেই পাঞ্জাবীটার চাকরি গেছে। মালীকে ছাড়ানো হয়েছে। আমার কাছে সব খবরই আসে।

—নতুন মনিব, নতুন মনিব গন্ধ অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে।

—সেই তো কথা। ভেতর থেকে ব্যাপারটা তুমি জানতে চেষ্টা করবে ?

—নিশ্চয়ই করবো।

—দেবু সেনকে আমি কোন প্রশ্ন করতে পারি না। সবই তো বুঝতে পার। যেটুকু বললে, শুনলাম। আমার বিশ্বাস তুমি চেষ্টা করলেই জানতে পার।

—বেশ, খবরটা বার করবার আমি চেষ্টা করছি।

—আমার তরফ থেকে তবে ভালগাব কিছু করা অসম্ভব। তবে সুলেখা বক্সী জানে না কোথায় সে হাত দিয়েছে।

প্রৌঢ়া মিসেস ধর চাপা আক্রোশে ফুলতে থাকেন। সার্টিনের নরম বালিশটা ম্যানিকিওর করা আঙুলের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। মনে হলো সুলেখা বক্সীর শরীরটাই যেন হিঁচড়ে চলেছেন মিসেস ধর।

—আপনি সোজা জিগ্যেস করলেই পারেন।

মিসেস ধরের কণ্ঠে আত্মগ্লানি আর আফসোস যেন দলা পাকিয়ে ওঠে,

—কাকে জিগ্যেস করবো? তিনি আজ আর মানুষ নেই। অথচ এই লোকটির জন্য কী না করেছি। তুমি আবার উঠে এলে কেন?

ফিরে তাকিয়ে দেখি মিঃ ধর। কার্পেটের ওপর পা টেনে টেনে এগিয়ে এসে দূরের সোফায় বসলেন। ডান অঙ্গটা পড়ে গেছে। একদিকের ঠোঁট বেঁকে গেছে অনেকটা। কথা জড়ানো। এই একই অবস্থায় দেখছি। আমাকে চেনেন বিলক্ষণ। আমি ধৈর্যশীল নীরব শ্রোতা, সেই কারণে হয়ত পছন্দও করেন। ঘরে আমাদের উপস্থিতি যেন চোখেই পড়ে না।

—পাকাপাকি খবর আমি তোমার কাছেই আশা করবো।

—আমি খবরটা বার করবার চেষ্টা করবো।

হয়ত আরও কিছুক্ষণ আটকে থাকতে হতো, কিন্তু মিঃ ধর আমাকে উদ্ধার করলেন। স্বামীর উপস্থিতি মিসেস ধরের বিরক্তির উদ্রেক করে। ঘড়ি দেখলেন। সুযোগটুকু আমিই তাঁকে করে দিয়েছি। নিচু গলায় বলি,

—ডেকে বসলে উঠতে পারবো না। কথা বললে হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

এক টুকরো ম্লান হাসলেন মিসেস ধর। পরক্ষণে শরীরে নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মিঃ ধর হাতের তালু নিরীক্ষণে ব্যস্ত। বিনা বাক্য ব্যয়ে পর্দা সরিয়ে আমি ঘরের বাইরে আসি।

করিডরে মিসেস ধর বললেন,

—ড্রাইভার তোমাকে পৌঁছে দেবে। এতক্ষণে আলিপুর থেকে ফিরে এসেছে।

—আপনি আমার জন্যে ভাববেন না। বেরুলেই ট্যাক্সী পাব।

—আমি আর নিচে নামলাম না।

—কোন দরকার নেই।

—তুমি আমাকে সঠিক খবর দিচ্ছো?

—আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

পোর্টিকোর তলায় বিরাট ডজ কিংসওয়ে। তবু মিসেস ধরের ড্রাইভারের খোঁজ আমি করিনি। বাইরে এসে ট্যাক্সী নিলাম। ঘড়িতে দশটা পঁচিশ। নিতান্তই বেয়াড়া সময়। বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রণ শেষ করে ফিরতে সুতপার আজ রাত হবে। বাড়িতে এক ফোঁটাও ড্রিঙ্কস্ নেই। বার বন্ধ। পরিচিত কোন আড্ডায় যাবার ইচ্ছেও হলো না। চোরা গোপ্তায় আদৌ অভ্যস্থ নই। তবু জায়গা বুঝে সর্দারজীকে গাড়ি রুখতে বলি। শীতের রাত। ফুটপাতে একটা পুলিশ। বিলিতি মদের দোকানের সামনে অপেক্ষারত দুটো লোক। একটি কুকুর। সর্দারজী অন্তর্যামী। টাকা বার করতে বলে। ছোট একটা হর্ন দেয়। আলোয়ানে জড়ানো শীর্ণ একটা দেহ এগিয়ে আসে। জানান দেয়। আঁধার রাতের ব্যবসায়ে কালো টাকা কবুল করতে হবেই। তবু এক বোতোল সোলানের দাম ত্রিশ নিল।

বাড়ি ফিরে সোনালী মদ বেশ খানিকটা তারিয়ে তারিয়ে শেষ করলাম। মিসেস ধরের কথা আমার মাথা থেকে গেল না। বেচারা মিসেস ধর। বয়স হচ্ছে। মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। সুলেখা বক্সীকে দেখে নেবার তাঁর নিষ্ফল আস্ফালন সত্যিই করুণার উদ্রেক করে।

দেবু সেনের খবরে আদৌ কোনো ভুল নেই। সিমলার বাড়ি হস্তান্তরের ব্যাপারের মূল দলিলে আমি একজন উইটনেস। কিন্তু আমি নিরুপায়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুবিমল রায়কে কথা দিয়েছি, তাই সরাসরি মিথ্যে বলতে হলো। সুলেখা বক্সীকে চিনি বিলক্ষণ। ভাইফোঁটার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির ঘটনা ছাড়াও সুবিমল রায়ের সুলেখা বক্সী ঘটিত মুখরোচক সিকোয়েন্স আমার জানা আছে।

মিনাক্ষী ধরের সঙ্গে আমার পরিচয় আকস্মিক ভাবে। এখানে একটু বিস্তারিত বলা দরকার। সামনে এগুতে আমার তাতে সুবিধে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির সেদিনের জঙ্গী রাজনীতির আমি তখন সক্রিয় কর্মী। মাস তিনেক টানা-হেঁচড়ার পর পুলিশ শেষ পর্যন্ত তাদের মিথ্যে চার্জ প্রমাণ করতে পারলো না। ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে ছাড়া পেলাম। আশঙ্কা করেছিলাম, আদালতের বাইরে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আবার নিশ্চয়ই ধরা হবে। তাই একটু চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়। সবার চোখে ধূলো দিয়ে কোনো ক্রমে আমি কোর্ট থেকে বেরিয়ে পড়ি। কৌশল কী অবলম্বন করেছিলাম, সে প্রসঙ্গ এখন এখানে অবান্তর। গা ঢাকা দেবার পক্ষে কলকাতা চমৎকার জায়গা। কিন্তু মনের দিক থেকে আমি ফুরিয়ে এসেছি। বুঝেছি এ রাজনীতি আমার দ্বারা হবার নয়। জেল থেকে বেরিয়েও মুক্তি পাচ্ছিলাম না নিজের কাছে। পূর্ব জীবন অসহ্য। অন্য জীবন অচেনা। অপর্যাপ্ত আত্মীয়-স্বজন, শহরের অসংখ্য মানুষ—কিন্তু আমার কাছে সবাই যেন অপরিচিত—অজানা।

কলকাতার জীবন অসম্ভব হয়ে উঠলো। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমাকে আরও বেশী হতাশ করে। আর্থিক সমস্যায় জীর্ণ হচ্ছি শুধু। সুযোগটা এলো আকস্মিক ভাবে। খুব একটা আশা নিয়ে যাইনি। যোগ্যতার প্রামাণ্য নথিও আবেদনপত্রের সঙ্গে ছিল না। তবু ইণ্টারভিউয়ের টেবিলেই বুঝলাম, চাকরিটা হবে। লক্ষ্ণৌ যেতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

সর্বহারা বিপ্লব ছেড়ে এসে ঠেকলাম মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের চাকরিতে। সেলস্‌ম্যানশিপের মারপ্যাঁচে অভ্যস্থ হবার কায়দাকানুন রপ্ত করা চললো। সুখেই ছিলাম, তবে শান্তি ছিল না। একটা চূড়ান্ত টালমাটালের মধ্যে কলকাতা ছেড়েছি। এ পরিবর্তন মানিয়ে নিতে পারবো না বুঝতাম। তবু বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে কাজটাতে টিকে থাকবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছি।

ক'মাস পর বোম্বেতে এলাম ট্রেনিং নিতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় জনা বিশেক ট্রেনির একত্রে থাকবার ব্যবস্থা। সবাই বিলিতি ওষুধ কোম্পানীর সফল ফিরিওয়ালা হতে আগ্রহী। পরিপাটি পোশাক। অনেকের দেখেছি পঙ্গু ইংরেজী নিয়ে চেষ্টাকৃত ফিরিঙ্গীয়ানা। হিন্দী ছবির জারক রসে অনেকেই দেখতাম জারিত। আলাপ হয়। পরিচয়ও বেশ জমে ওঠে। কিন্তু অন্তরঙ্গ হওয়া কঠিন।

প্রায় মাস খানেক পরের কথা। ছুটিব দিন ছিল সেদিন। পথে অজিতেশের সঙ্গে দেখা। অজিতেশ আমাদের আমলের প্রেসিডেন্সির পহেলা নম্বর। রাজনীতি করতো না কিন্তু আমাকে পছন্দ করতো। অজিতেশ বিশ্বাস করে, ইচ্ছে করলে তার মত ফার্স্ট ক্লাস আমার পক্ষে মারা আদৌ অসম্ভব ছিল না। অজিতেশ আমেরিকা যাচ্ছে। আমার অবস্থা শুনে প্রথমটা একটু দমে গেল। চায়ের টেবিলে বসে মুখ খুললো,

—সবই বুঝলাম অরুণ। তোমার এখন একমাত্র কাজ হওয়া উচিত কোনো কাগজের অফিসে ঢুকে পড়া। দেখা হয়ে ভালই হলো। তুমি আমার মামীর সঙ্গে আলাপ কর।

—অজিতেশ, আমি পলাতক। অবস্থা থাকলে এ চাকরিতে এসে ঠেকতাম না। চাকরি করছি, পালিয়েও বেড়াচ্ছি। এখন কিছুদিন এ জীবন আমার মেনে নিতে হবেই।

অজিতেশ নিজের কথা বলে চলে,

—আমি থাকতে থাকতে মামীর সঙ্গে আলাপ কর। তুমি লেখো, আমার বিশেষ বন্ধু। এই পরিচয়ই যথেষ্ট। আমার এই মামীর যথেষ্ট বদনাম আছে, কিন্তু মানুষটা ভাল। বেশ পজিটিভ চরিত্র। ইচ্ছে থাকলে অনেক কিছুই করতে পারেন। আমেরিকান স্কলারশিপ আমি বাপের জন্মেও পেতাম না।

পরদিন অজিতেশ আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বললো,

—তুমি বোম্বেতে গপ্পো-টপ্পো বেচতে এসেছো ব'লে আমি চালাবো। পার্টি করছো, বা মেডিক্যালের দালাল, সে পরিচয় আমি দেব না। বোঝো তো সবই। সবটাই তো সেলস্।

—ভদ্রমহিলা তোমার কী রকম মামীমা?

—মামীমা ব্যস। এর বেশী তুমি জানতে চেও না। প্রয়োজনও নেই। আমি চাই এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ কর। কাজে লাগাতে চেষ্টা কর। আমাকে খুব স্নেহ করেন। মানুষটা ভাল।

—কাগজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী ভাবে?

—অনেক ভাবে।

—খুলে বল।

—ভদ্রমহিলার কোথায় যে হাত পৌঁছায় না আমি বুঝতে পারি না। আমার ইচ্ছে তুমি এই ভদ্রমহিলাকে ধরে 'সমন্বয়'-এ ঢোকো।

—'সমন্বয়'। সে যে পুরোপুরি রিঅ্যাকশনারী কাগজ।

—তোমার ঐ জার্গন্‌গুলো বন্ধ করো। পার্টির ত্রিশ টাকার হোল টাইমার হতেই আসলে তোমার ভাল লাগে।

—পার্টি আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—ভাল মারছো।

—সত্যি আমি পার্টি ছেড়ে দিয়েছি।

—আমাকে খুশী করছো। তুমি শালা পার্টি ছাড়বে!

—বিশ্বাস করো, পার্টি লাইন আমার ভাল লাগছে না।

ট্যাক্সীর মধ্যে অজিতেশ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে,

—দেখ অরুণ, আগেও তোমাকে বলেছি। নিজের হিম্মৎ ছাড়া কোথাও গিয়েও তুমি কিছু করতে পারবে না। যোগ্যতা ছিল, নষ্ট করেছো। এখনও নিজেকে নষ্ট করছো। তুমি যে রাজনীতি কর, সে কাজ করবার মত এ্যাভারেজ মানুষ বাংলা দেশে প্রতি মুহূর্তে জন্মাচ্ছে।

—তুমি কী কেরিয়ারের কথা বলছো অজিতেশ?

—জানি তুমি হাসছো। আমি নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছি নিজের পায়ে না দাঁড়ালে কিছুই সম্ভব নয়। নিজে পস্তাবে, সর্বহারা বিপ্লবেরও কোনো কাজে লাগবে না। দিল্লীর জোর আমার নেই। তাই নাকের ডগার ওপর দিয়ে গভর্নমেণ্ট স্কলারশিপগুলো একটার পর একটা বেরিয়ে গেল। অতি কষ্টে সেকেণ্ড ক্লাশ, আমাদের হিন্দু হেস্টেলের বেঁটে শ্রীমন্ত, প্রেমে হেরে গিয়ে স্লিপিং ড্রাগস্ গিলেছিল— সেদিন চলে গেল অক্সফোর্ড। আর আমি বাঁকুড়ার কলেজে দেড়শো টাকায় আমার ফার্স্ট ক্লাস ভাঙাতে যাব! এতবড় বুদ্ধু আমি নই। তোকে হাতে তুলে কেউ দেবে না। জোর করে অধিকার করতে হবে।

—অজিতেশ আমি সুন্দর করে ভবিষ্যৎ গড়বার কথা কোনো দিনই ভাবিনি। আমার চরিত্রে প্রপার্টি সেন্সের বাস্পমাত্র নেই। তাছাড়া 'সমন্বয়' পত্রিকা আমাকে নেবে না।

—যদি আপত্তি না করে।

—আমি টিকতে পারবো না। অজিতেশ তোমার কথা আমি বুঝতে পারি কিন্তু আমার দিকটা তুমি ভেবে দেখছো না।

—'সমন্বয়' পত্রিকা খারাপটা কী?

—আমি সেখানে মানিয়ে চলবো কেমন করে! 'সমন্বয়'-এর পছন্দসই লেখা কী আমার পক্ষে সম্ভব।—তাই কী কখনও হয়!

—অমিয় পালিত কী করে কাজ করছেন? তিনি তো একজন মার্ক্সবাদী।

—কার সঙ্গে কার তুলনা। অমিয় পালিতের নামটাই সমন্বয় ব্যবহার করে। তাছাড়া সমন্বয় পত্রিকার সঙ্গে অমিয় পালিতের খুব একটা সম্পর্ক নেই। পত্রিকার মালিক যিনিই হোন, 'সমন্বয়'-এর সাফল্যের পেছনে ঐ অমিয় পালিত।

—বুঝতে পাচ্ছিস সবটাই হিম্মৎ। অমিয় পালিত জুতিয়ে চাকরি করে। আমিও সেই কথাই বলি। তোকে সমন্বয়-এই ঢুকতে হবে।

আমার আস্তানা থেকে মেরিন ড্রাইভ অনেকটা পথ। দীর্ঘ রাস্তা অজিতেশ তার জীবনবোধ সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেল। অজিতেশের কথা আমি বুঝতে পারি। মিনমিনে স্বভাবের ভাল ছেলে সে নয়। আমাকে ভালবাসে। আমার উপকারে লাগতে চায়।

—তুমি যখন এত বলছো, আলাপ আমি করছি।

অজিতেশ ছোট্ট করে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে,

—আলাপ রাখ। দেখিস কাজে আসবে। কবে দেখা হবে কে জানে।

—আমেরিকায় তুই কতদিন থাকবি?

—কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। তবে আমার ইচ্ছে কিছু পয়সা কড়ি জমিয়ে একটা থিসিস শেষ করে ইংলণ্ডে আসবো। এখন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানি না এই রকম ভাব দেখাবো।

— এটা কী স্কলারশিপ?

—চেঁচিয়ে বলবার মত নয়। তুই যা ভাবছিস তার চেয়েও জঘন্য। তবু উপায় নেই, আমাকে বেরুতেই হবে। তবে জব-ভাউচার নিয়ে লণ্ডনে অদৃষ্ট খুঁজতে যাবার চেয়ে অনেক ভাল।

অতিভঙ্গী করেনি অজিতেশ। আমার আঁটো জীবনের সীমিত অভিজ্ঞতায় মামীমার ইমেজের সঙ্গে মিনাক্ষী ধরের এতটুকু মিল

খুঁজে পাইনি সেদিন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবার মত চেহারা তখন। নিটোল স্বাস্থ্য—জোয়ারের ঢেউ-এর মাথার ফস্‌ফরাসের দ্যুতির মত চেহারায় যেন ঝলকানি।

পর পর দুদিন দেখা হলো। অজিতেশ বললো,

—কেমন লাগলো।

আমি মুগ্ধ। সম্পূর্ণ বিমূঢ়,

—অপূর্ব। কিন্তু অজিতেশ, এ যে বোতিচেল্লীর 'বার্থ অফ ভেনাস' দেখছি। শালা ফিগার দেখেছিস।

—মামীমার ফিগারই তো সব। তবে ক্লাসিক-পেন্টিং-এর সঙ্গে অনেক মেলাবার সুযোগ পাবি। তোমার মধ্যেও একট দুর্ধর্ষ পার্সোনাল ম্যাগনেটিজম আছে। ওয়েস্টার্ণ পেন্টিং নিয়ে তুই তো দারুন সমালোচনা করতে পারিস। আসলে মামীমা তোকে পছন্দ করেছেন। তবে এখনই চাকরির উমেদারীতে আমাদের দরকার নেই, প্রয়োজনও নেই। ওয়ারেণ্ট উঠে গেলে তুমি কলকাতায় ফিরে দেখা করবে যা বলার আমি বলে রাখবো।

এই ঘটনার মাসখানেক পর এক বন্ধুর চিঠিতে জানলাম অবস্থার পরিবর্তনে অনেকের ওপর থেকেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়েছে। আমারও আর পালিয়ে বেড়ানোর দরকার নাই। কলকাতায় বদলীর জন্যে বন্ধুটি তদ্বির করবার পরামর্শ দিয়েছে। ট্রেনিং ফুরিয়ে এসেছিল। ইচ্ছে না থাকলেও ক'মাসের অভ্যাসে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। চাকরিস্থল লক্ষ্ণৌ চলে গেলাম।

তবে লক্ষ্ণৌতে সপ্তাহ তিনেকের বেশী টিকতে পারিনি। জরুরী তার পেয়ে কলকাতায় রওনা হলাম। কিন্তু বাবা আমার জন্যে অপেক্ষা করেননি। অন্য ভাইরা তখন থান পরে ফেলেছেন। ট্রেন হাওড়ায় ঠিক সময়ই এসেছিল, কিন্তু আমি প্রায় বিশ ঘণ্টা লেট। করনারী থম্বোসিস্—চিকিৎসার সুযোগই পাওয়া যায়নি। তবু দু'চার কথার পর দাদা জানালেন ইতিমধ্যে শতিনেক টাকা তাঁর খরচা হয়ে গেছে।

বুঝলাম আমাকে নিয়ে বেশ আলোচনা হয়ে গেছে। একরকম সবাই ধরে নিয়েছিলো থান আমি প'রবো না। মাথা কামাবো না। খালি পায়ে চলতে ফিরতে আপত্তি করবো।

—পাঁচজন যা করে আমি তার ব্যতিক্রম নই। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা গোটা পরিবারের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। বাবা এসব মানতেন। ধর্ম আমি মানিনে, কিন্তু এ সমস্তই কুসংস্কার আমি মনে করি না।

সবাই খুশী হয়েছেন। শুনলাম দাদা কার কাছে মন্তব্য করেছেন, ক'মাসেই বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। অরুণ হয়তো বিয়ে করতে চায়।

পারিবারিক নিত্য-পুরাণের প্রসঙ্গ এখন থাক। কাজকর্ম মেটার পর মিনাক্ষী ধরের সঙ্গে দেখা করবার কথা মনে হলো। ডায়রী খুলে ঠিকানা-পত্র দেখে নিলাম। ফোন করলাম। পেলাম না। তবে কলকাতাতেই আছেন।

দেখা করলাম পরদিনই। এই বাড়িতেই।

ভয়ানক ব্যস্ত। কিন্তু চিনতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয়নি। দু'চার কথার পর নিজেই কথা তুললেন,

—তোমার কথা আমি বলে রেখেছি। তবে এত ব্যস্ত। কিছু যদি মনে না কর তবে পরশু একবার আসবে? পশুক্লেশ নিবারণী সভার বার্ষিক মিটিং নিয়ে এত ব্যস্ত আছি।

চলেই আসছিলাম। পিছু ডাকলেন।

—পরশু তো তাঁকে আবার পাচ্ছি না। একটু দাঁড়াও।

মিনাক্ষী ধরের ক্ষিপ্রতা আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। কলমের ডগা দিয়ে ডায়েল করলেন। রিসিভার তুলে মিষ্টি হেসে বললেন।

—মাথায় টুপি কেন?

—বাবা মারা গেছেন।

মিসেস ধর লাইন পেয়েছেন ততক্ষনে,

—অজিতেশের বন্ধুর কথা তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে? ওকে পাঠাচ্ছি। কেন? কাজ তো তোমার সব সময়ই। একটু নেড়ে চেড়ে দেখবে না? আমাকে খুশী করছো? কেন, আমার হাত দিয়ে ব্রিলিয়েন্ট ছাড়া এ পর্যন্ত কিছু গেছে নাকি? আবার অমিয় পালিত কেন! তুমি একবার দেখো। দরকার নেই? তুমি বলে রেখো। চিঠি আমি একটি দিয়ে দেব।

হঠাৎ রিসিভারের মুখ চেপে ধরে আমার দিকে ফিরে বললেন,
—অরুণ সান্যাল তো?

আমি মাথা নাড়লাম।

মিনাক্ষী ধর পর মুহূর্তেই টেলিফোনে আমার নামটা জানিয়ে দিলেন। ফোন নামিয়ে রেখে প্রসন্ন হেসে বললেন,

—অমিয় পালিতের সঙ্গে কাল দেখা করবে বিকেলের দিকে যাবে। আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।

মিনাক্ষী ধরের সুন্দর মুখশ্রীতে আশ্চর্য মধুর এক রমণীয়তা আমাকে অভিভূত করে।

এই ভাবেই মিনাক্ষী ধরের সুপারিশে আমার সময়ে প্রবেশ। ঠিক প্রবেশ নয়—অনুপ্রবেশ।

—তুমি কতক্ষণ।

নিস্তরঙ্গ জলরাশিতে স্থির প্রতিবিম্ব আচমকা এক বিক্ষেপে যেমন হারিয়ে যায়, সুতপার কথায় মিনাক্ষী ধরের অনুস্মৃতি ঠিক তেমনই নাড়া খেয়ে ভেঙ্গে গেল।

—ব্যয়সাপেক্ষ শনিবারের সান্ধ্য মজলিস ছেড়ে একা একা বাড়ি বসে আছো। প্রণববাবুর ওখানে যাওনি?

—অফিসেই আজ দেরী হয়ে গেল, তারপর মিসেস ধরের ওখানে আটকে গেলাম।

—হঠাৎ মিসেস ধর !

—কাজ ছিল।

বোতলের কোমর পর্যন্ত নিঃশেষিত। খেতেও আর ভাল লাগছিল না। সুতপা আমার সামনে দাঁড়িয়ে সাদা বেনারসী ছাড়ছিলো। আমি বাধা দিলাম,

—থাক না। পরে খুলো। একটু বসো। সাদা বেনারসীতে তোমাকে দেখতে বেশ হয়েছে।

বোতলের দিকে এক নজর তাকিয়ে বলে,

—এদিকেও তো বেশ হয়েছে, থাক না।

—খেতে আজ কেন ভাল লাগছে না।

—খেও না।

—আর খাব না।

—নিমন্ত্রণে গেলে পারতে, সবাই তোমার কথা জিগ্যেস করছিলো।

—তুমি কী বললে ?

—মিথ্যে বলতে হলো, বিশেষ কাজের অজুহাত দিতে হলো।

—আসলে সুতপা, বাঙ্গালী বাড়ির এই নেমন্তন্ন আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না। এক গাদা পরিচিত-অপরিচিত লোকের সঙ্গে পরের ইচ্ছে মত পিঠে পিঠ দিয়ে লাইন করে বসা। সারা বাড়িতে রান্নার গন্ধ। আমি কেমন ধৈর্য হারিয়ে ফেলি।

—সংসারে থাকতে গেলে অনেক কিছুতেই ধৈর্য চাই। অনেকে অনেক কিছু মনে করে।

—তা অবশ্য ঠিকই। কী খেলে কী ?

—তিনটে মাছ খেয়েছি। তাছাড়া অনেক কিছু।

সুতপাকে আজ খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। শরীরটা এখনও অটুট। পূর্বের মতই আছে। আগের চেয়ে ভরাট, তবে জমাট ভাবটা

ক্ষুণ্ণ হয়নি এতটুকু। মনটাও আজ বেশ খুশী। মাঝে মাঝে যে কী হয়, বুঝেই উঠতে পারি না।

—তোমার দাদার চিঠি পড়েছো ?

পানীয়ের শেষটুকু আমার বিস্বাদে ভরে ওঠে,

—টাকা চায় ?

—অমিতের এঞ্জিনিয়ারীং পড়ার ভারটা তুমি নিতে পার না ?

—ভর্তির ফিস দিয়েছি। বই-পত্তর, মাস মাইনেও দিচ্ছি। হোস্টেলের খরচও আমাকে এবার দিতে বলো ?

—হোস্টেলের খরচ তোমার দাদার পক্ষে টানা অসম্ভব।

—টাকাটা দিতে চাও ?

—দাদার ওপর রাগ করে অমিতকে শাস্তি দিও না। আর বেশী দিন তো টানতে হবে না। অমিত ভাল ছেলে।

—ভাল ছেলে সে নয়। ভাল ছেলেদের পড়বার জন্যে টাকা লাগে না। আমি তো সারা জীবন ফ্রি-তে পড়েছি। তবে আসল কথা কী জান সুতপা, দাদার কথা মনে হলেই মেজাজটা আমার খারাপ হয়ে যায়। টাকা দিতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু তাতে অমিতের সূত্র ধরে চিঠির পর চিঠিতে আমাকে পাগল করে তুলবে। আমাদের পরিবারের লোকগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে।

—অমিত তো আমাদের এখানে থেকেও পড়তে পারে।

—টাকার ওপর দিয়ে যায় সে একরকম, কিন্তু এ বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। কেন, তুমি অমিতকে কিছু বলেছ নাকি ?

—অমিত এ সবের কিছুই জানে না। তোমার ছাত্রজীবনের একটা পুরোণো গল্পের খাতা বোধ হয় পিসির বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে। সেই গল্পটাই আমাকে শুনিয়ে খাতাটা ফেরত দিয়ে গেল। অমিত তোমাকে ভয়ও পায়। খুবই শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

—অমিতের লেখা-টেখার বাতিক নেই তো ?

—তোমারই তো ভাইপো।

—হেসে উড়িয়ে দিও না। অমিত সম্পর্কে সত্যিই যদি তুমি কিছু দায়িত্ব নাও, এসব প্রথম থেকেই নজর রাখতে হবে।

—তোমার 'আদার সাইড অফ দি রিভার' বইটা অমিত সেদিন নিয়ে গেছে।

—ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্লাসে এডগার স্নো পড়ানো নয় নাকি।

—চাইলো।

—এ সব ভাল লক্ষণ নয়।

—কদিন পরেই রেখে যাবে।

—পড়বার বই আমার কাছে অনেক আছে। বেছে বেছে এডগার স্নো কেন?

—অত শত বুঝি না বাবা, বললো, বইটা পড়বার জন্যে ক্লাসে নাকি মারামারি হচ্ছে। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে, সেই সুযোগে বইটা শেষ করে আসবে।

—ব্যাপারটা তুমি যতটা সহজ মনে করছো, আমি কিন্তু ততটা তুচ্ছ মনে করি না। অমিত এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। আমি কথা বলতে চাই। 'আদার সাইড অফ দি রিভার' পড়বার জন্যে ক্লাসে মারামারি হচ্ছে। অমিত কাদের সঙ্গে মিশছে? সেদিন একটা দাড়িওয়ালা ছেলেকে দেখেছিলাম।

—তুমি বকাবকি করো না। কিন্তু টাকার ব্যাপারটা কি করবে?

—লিখে দাও। হোস্টেলের খরচা তুমি দেবে।

—দাদার চিঠির জবাবে তোমাকেই লিখতে হবে।

—বুঝেছি।

—কী বুঝেছো?

—দাদার আত্মসম্মানের ব্যাপার। কিন্তু লেখালেখি আমার দ্বারা হবে না। অমিতকেই বলবো। হোস্টেলে আবার তো দল পাকাবে।

—তোমার দাদা রিটায়ার করায় সবই গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু হোস্টেলে না দিয়ে উপায় কী! এখানে থাকা যখন সম্ভব হবে না।

—যাক, এ আলোচনা এখন থাক। তুমি আমার কাছে এসো।

—বাব্বা, তোমার মুখে এখন যা গন্ধ!

—তা হোক।

—শাড়িটা পাল্টে আসি।

—থাক না।

—লাট হবে।

—হোক না।

কৃত্রিম অনুযোগ সুতপার। এগিয়ে এসে আমার কোলের উপর মাথাটা রাখলো। অমিত আর এডগার স্নো তখনও বোধ হয় চিন্তা করছিলাম। জানতে ইচ্ছে হলো,

—আচ্ছা সুতপা, তোমার কি মনে হয় অমিত ছাত্র ফেডারেশন করে? অমিতের ঐ দাড়িওয়ালা বন্ধুর হাতে সেদিন কিন্তু আমি চে-গুয়ে-ভারার বই দেখেছিলাম।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্ত রকম দোষগুণ নিয়েই ছিল সুখরঞ্জন সান্যালের সংসার। শৈশব থেকে দেখেছি, বাবা জীবন-যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক। ওকালতি ব্যবসায় তিনি ছিলেন শেষের বেঞ্চের উকিল। অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ, নিরুদ্বিগ্ন এই মানুষটির বিরুদ্ধে আমার নিজের কোনো অভিযোগ নেই। বাবা আমাকে শাসন করেননি কোন দিন। তা ছাড়া মোটামুটি ক্লাসে ভাল ছেলে ছিলাম, বিনা বেতনে লেখাপড়া করেছি। প্রচ্ছন্ন একটা দম্ভ, গোটা পরিবারের প্রতি একটা উপেক্ষা আমার ছিলই।

মা ছিলেন চিররুগ্না। দৈহিক অক্ষম হলেও মায়ের কাছে বাবাকে প্রতিনিয়ত নিগৃহীত হতে দেখতাম। সামান্য একজন মুহুরীর যোগ্যতাও যে বাবার নেই, সে কথা তাঁর মুখে হামেশাই শুনেছি। জীবন যুদ্ধে সফল পিতাদের নামের তালিকায় সুখরঞ্জন সান্যালের নাম না থাকলেও একটা জায়গায় বাবা ছিলেন দুর্লভ চরিত্র। অসম্ভব ভীতু ছিলেন কিন্তু এই মানুষটিকে দিনের পর দিন বিনা পারিশ্রমিকে স্বদেশী আন্দোলনের আসামীদের বেল পিটিশন ম্যুভ করতে দেখেছি; কণ্ঠে সুর ছিল না, কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভুল উচ্চারণ তাঁর কানে ধরা পড়তো ঠিক। বাবার শেক্সপীয়ার পড়ানো আজও আমার কানে বাজে। বাবার মধ্যে সুপ্ত কবিচরিত্র সাংসারিক নানা আবিলতায় প্রতিনিয়ত আঘাত পেয়েছে। প্রতিযোগিতায় তিল মাত্র আকর্ষণ ছিল না, তাই জিতে নেবার আনন্দ বা হেরে যাবার দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করেনি কোনদিন।

দেশ বিভাগের বেশ কিছুদিন পর ভাঙ্গা-চোরা সংসার কলকাতায় এসে দানা বাঁধলো। মা মারা গেছেন। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ভাই এখন সংসারের মধ্যমণি। কবীর রোডে তাঁর বাড়ি হলো হেড কোয়াটার্স। দাদা সেক্রেটারীয়েটে চারশো টাকার অতি কষ্টে

গেজেটেড্ অফিসার। স্ত্রীর বাধা। বাস্তুহারা পরিচয়ে জমি করেছেন। তিন ছেলেমেয়ে। মেজদা পাটনায় ব্যাঙ্ক কেরানী। বিবাহে ইচ্ছুক। ছোট বোন কল্যাণী স্টেনোগ্রাফী শিখছে। আমি চুটিয়ে রাজনীতি করছি। এম. এ. ক্লাশ টিকিয়ে রেখেছি। নিয়মিত ছাত্র পড়াই।

সংসারে আমি থেকেও নেই। নিয়মিত টাকা দিতাম, হয়তো সেই কারণে আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন অভিযোগ ছিল না। বাবা যে নিতান্তই অপদার্থ, সেটা দাদা নতুন করে আবিষ্কার করলেন। রাজসাহীর বাড়ি বাবা বেচতে পারেন নি। এত দিনের আইনের কেতাবগুলোও মুসলমান এক উকিল যুবাকে বাবা দান করে এসেছেন। বাবার একমাত্র দুঃখ ছিল ভোলাকে নিয়ে। একটা চতুষ্পদ দেশী সারমেয় সম্পর্কে বাবার উৎকণ্ঠা নিয়ে নেপথ্যে বৌদির ইতর রসিকতায় আমি একদিন ধৈর্য হারাতে বসেছিলাম।

বাবা হাঁপিয়ে উঠছিলেন। বৈষয়িক বুদ্ধিহীন মানুষটি তবু নিজের বহু পুরাতন অভ্যস্ত পৃথিবীতে এক রকম চলছিলেন, কিন্তু কলকাতার মাপা জল, মাপা বাজার, মাপা মাপা ভদ্রতায় খুবই বিব্রত বোধ করতেন।

এদিকে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো। দাদার শ্বশুরমশাই একদিন শুনলাম বাবার কাছে বসে আমার মতিগতি সম্পর্কে নিদারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। আমার মত অবাধ্য চরিত্র সংসারে বিপর্যয় ডেকে আনবে, সে সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করে গেছেন। দাদাই আত্মপ্রকাশ করলেন একদিন।

—রাজনীতি করতে হয় বাইরে গিয়ে কর। তোমার জন্যে আমাদের সর্বনাশ হবে।

—তুমি কি বলতে চাও?

—এ বাড়িতে থেকে কমিউনিস্ট পার্টি-টার্টি চলবে না।

—মানে।

—তুমি ও সব করতে পারবে না।

—বাড়ি ছেড়ে দে'ব।

—সে তো সোজা, দায়িত্ব এড়ানো সংসারের।

—কিসের দায়িত্ব ?

—সংসার তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করে।

—তোমাদের সংসার বড় বেশী কিছু আশা করে। টাকা তো দিচ্ছি।

—কল্যাণীর বিয়ে দিতে হবে।

—বাবার লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকা আছে, তোমাকে ভাবতে হবে না। তা ছাড়া কল্যাণী দু'দিন পরেই রোজগার করবে।

—সব কিছু সহজ করে নেওয়া তোমার একটা বেয়াড়া স্বভাব।

—জট পাকানোতে তোমাদের আনন্দ খুব আমি জানি। ব্যাপারটা কী।

—ভদ্র জীবন যাপন কর।

— তুমি কী বলতে চাইছো কী ?

—রাজনীতি করতে পারবে না। তোমার কাছে এত লোক আসে কেন ?

—তোমার কী মাথা খারাপ !

—এ বাড়িতে থেকে রাজনীতি করতে পারবে না।

—বাড়ি ছেড়ে দে'ব।

—আমার চাকরি যাক তাই তুমি চাও ?

—অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের মত কথা বোলো না। বলছি তো, বাড়ি ছেড়ে দেব ! শান্তিতে থেকো।

ক্রমে তর্ক একটা জঘন্য পর্যায়ে পৌঁছোলো। ছোট বোন কল্যাণী আমাকে ধরে টানে। বৌদি দাদাকে ঘরে ধরে নিয়ে যায়। পুরোনো খবর কাগজ আর রুটি বানানোর আটা আমি কী পরিমাণ পোস্টারের পেছনে খরচ করেছি, বৌদি সেকথাও সরবে ঘোষণা করলেন। অনেক রাত্রে সেদিন বাড়ি ফিরেছি। বাবা তখন জেগে। বললেন,

—অবিনাশ আসলে ভয় পায়! তোমার উপর রাগের চেয়ে ওর ভয়ের মাত্রাই বেশী।

—তুমি কী বল!

—আমার আবার মতামত, তোমাদের ওপরই আমি নির্ভর। তবে মানিয়ে চলতে পারবে না যখন অন্যত্র থাক। আমাদের কথা মনে রেখো। কল্যাণীর জন্যেই আমার যা চিন্তা। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারি।

তবু হয়তো কিছু দেরী হতো। কিন্তু এই ঘটনার ক'দিন পর পুলিশ বাড়ি সার্চ করতে এলো। গন্ধ আগেই পেয়েছিলাম, তাই রাত্রে বাড়িতে শুতাম না। শুনলাম আজেবাজে কাগজ কিছু সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। পরদিন দাদা অফিস যাননি। নিজে সারাবাড়ি খানাতল্লাসী করেছেন। দাদার কাছে সমস্ত কিছুই আপত্তিজনক। অতএব প্রচুর অগ্নিসংযোগ। প্রচুরতর ধোঁয়া। হাসপাতালে পাঠানোর পর মারাত্মক সংক্রামক রোগীর ঘর আর বিছানা পরিষ্কারের বিড়ম্বনার চেয়েও হাজারগুণ পীড়াদায়ক।

দাদার আস্তানা ছাড়তে হলো। এখানে সেখানে থেকেছি। পাঞ্জাবীর দোকানে লাঞ্চ। মেটেবুরুজের সরাইতে ডিনার। বড় পবিত্র, বড় মধুর, বড় নিষ্ঠুর সেই দিনগুলো। কাটা ঘুড়ির মত লাট খেতে খেতে এসে ঠেকেছিলাম টালিগঞ্জের এক ধনী গৃহে। দৈনন্দিন থাকা-খাওয়ার বাধাবরাদ্দের বিনিময়ে তাঁর একমাত্র পুত্রকে পড়াতে হবে। হাত খরচও কিছু জুটবে। ছাত্রটি ছিল রূপরসগন্ধ বিবর্জিত সরণশীল নিরেট এক বস্তুবিশেষ। দু'চার দিন নেড়েচেড়ে বুঝলাম, ছেলেটিকে আর যাই হোক, আমার পক্ষে মানুষ করা অসম্ভব। কলি ফেরানোর আগে ঘরের দেওয়ালের চুনবালি যেমন ঘষে তুলতে হয়, শিরিষ কাগজ, কাঁচের কোনা কর্ণিক চালিয়ে বিবর্ণ তেলতেলো ময়লা সরানোর প্রয়োজন পড়ে, তেমনি ছাত্রটিকে কিছু শেখানোর আগে সে ইতিমধ্যে যে মর্মান্তিক জ্ঞান আহরণ করেছে, সেটি ভোলানো

দরকার। ছাত্রের পিতা পুত্রের ভবিষ্যতের চেয়ে গুদাম বোঝাই তেলের পিপের দৈনন্দিন বাজার দর নিরীক্ষণে ব্যস্ত থাকতেন। তৈলাক্ত মসৃণ পথ ছাত্রটির ভবিষ্যৎ জীবনে কখনও মরচে ধরবে না, এই ভেবে আমি কিছুটা মরাল সাপোর্ট পেতাম। অর্থাৎ ছাত্রটিকে কিছু শেখানোর চেয়ে না-শেখানোর চেষ্টাতেই আমি কেমন যেন অভ্যস্ত ছিলাম।

য়ুনির্ভারসিটির প্রাঙ্গণই আমাদের পলিটিক্সের অঙ্গন। নিয়মিত আসর। পলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডে আমরা সবাই ভেসে চলেছি। দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হয়েছে। দুই যুগ ধরে কমিউনিস্ট পার্টির ক্লীবত্বের সমস্ত দায়িত্ব যোশী-অধিকারীর কাঁধে পৌঁছে দিয়ে পার্টি তখন প্রকৃত বৈপ্লবিক মার্কসবাদ লেলিনবাদের রাস্তা পেয়েছে বলে মনে করেছি। কিন্তু পরিবর্তিত নেতৃত্বে সুবিধাবাদী ষড়যন্ত্রমূলক বেইমানি যে নতুন করে শক্তি সংহত করছে, আমরা তার কণামাত্র বুঝতে পারিনি। 'লাস্টিং পীস-'এর সম্পাদকীয় মুখস্ত বলতে পারতাম। ট্রটস্কীর 'পার্লামেণ্ট রভোলিউসান'-ও আমাদের হাতের কাছেই ছিল। মার্কিন ও বৃটিশ ফৌজ ভারতের মুক্তি ফৌজ হতে পারে না একথা পূর্বে যেমন বুঝিনি, এখন বিশ্বাসই করলাম না, 'বৃহৎ দেশীয় পুঁজি-পতিরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রত্যঙ্গ।

যৌবনের ডাকে ও রাজনৈতিক উত্তেজনায় আমরা সবাই অল্পবিস্তর বিক্ষুব্ধ। পলিটিক্যাল চোলাইয়ের মদিরতায় প্রাণমন তখন ভরপুর। মনে মনে বিশ্বাস করেছি, বিপ্লব এসে গেছে। জাগতিক সমস্ত কিছুর আকর্ষণ অতি স্থূল, নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। এ্যাজিটেশন ছাড়া কিছুই বুঝতাম না। প্রেম পড়াকে মনে হয়েছে ভালগার। কারো সুন্দর পরিপাটি পোশাক দেখলে তার ইনটেলেক্ট সম্পর্কে হতাশ হতাম।

এই সময় আমার প্রথম উপন্যাস 'ইস্তাহার' প্রকাশিত হয়। পার্টির সুপারিশ ছিল। সাধারণ পাঠকমহল বইটি গ্রহণ করেছে। আমি একজন সম্ভাবনাপূর্ণ লেখক, ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান

কিছু সৃষ্টি করবো—এ নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে। ছমাসে বাইশ শো কপি নিঃশেষিত। আমার রয়্যালটির টাকা পার্টি তহবিলে দান করলাম। তরুণ পার্টি ক্যাডারস্ মুগ্ধ। কেউ কেউ মন্তব্য করে, চেলকাস-টেলকাস মেরে বেরিয়ে যায়। নিজেকে গোর্কি ভাবিনি। কিন্তু মনে হয়েছে বাংলা সাহিত্যে মানিকবাবুর কাছে পাঠক যা আশা করেছিল, সে দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হবে। বছরের শেষে পুলিশ একদিন রাস্তা থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করলো। এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া আর হলো না।

ছাড়া যখন পেলাম পার্টির তখন অন্য চেহারা। পার্টি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, বিচ্ছিন্ন। সাধারণ ক্যাডারস্ হতাশ, পরাজিত। নেতাদের আস্ফালন কিন্তু বন্ধ হয়নি তখনও। তাঁরা ঘোষণা করলেন, ভুল করেছিলাম, এবার প্রকৃত রাস্তা পাওয়া গেছে।

টালিগঞ্জের আস্তানা গেছে। এখানে-সেখানে থাকি। আর্থিক অনটন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে। তবে বেশীদিন বাইরে থাকতে পারিনি। গোপন এক সেল মিটিং-এ ধরা পড়লাম। কৃষকরাই যে ঔপনিবেশিক-বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি, আমি বালাবুশেভিচের উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাচ্ছিলাম।

পুলিশের কাগজপত্র সাজানোতে এবার ভুল ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সবাইকেই বেকসুর খালাস করলেন। কোর্টের বাইরে পুলিশ চার জনকে আবার তুলে নিল কিন্তু সেদিন কৌশলে আমি গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছি।

জেলে বসেই ভাবছিলাম। নিজের মধ্যেই দুরন্ত ভাঙ্গাগড়া চলছিল। মনের দিক থেকে ফুরিয়ে এসেছিলাম। পার্টি লাইন সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আমার জমা হয়েছিল। বার বার মনে হতে লাগলো আমি ভুল করছি। আমার সম্ভাবনার কথা ভেবেছি। আমি লেখক, আমার সমস্ত শক্তি পার্টি নয়-ছয় করছে। আমার যোগ্যতার অপচয়ই হচ্ছে শুধু।

আমি শুধু একা নই, অনেকেই দেখলাম আমার মিয়মে ভাবছেন। নিজের কথা যাঁদের কোনোদিন মনে হয়নি, তাঁরাও দেখলাম অনেকে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে বিচলিত। মধ্যবিত্তের বিপ্লবী আন্দোলন সামান্য রিপ্রেশনের সামনে দেউলে। 'ওভাবে বিপ্লব-টিপ্লব হয় না', শিক্ষিত এক বিরাট অংশের এই সান্ত্বনায় পেয়ে বসে! নতুন প্রেরণায় তাঁরা উদ্দীপিত। পার্টির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ। চাকরির চেষ্টা, বিবাহ ও হারানো কয়েকটা বছরের আত্মগ্লানি আর আফসোস। যোগ্যতা ও ক্ষমতার তারতম্যে কেউ সওদাগরী অফিসের সেলস্‌ম্যান, কেউ সিনেমার কাহিনী লেখক। গণ-নাট্য সঙ্ঘের কাঁধে পা রেখে গড়ে তুলেছেন স্বতন্ত্র নাট্যকে দল। পার্টি ভাঙ্গিয়ে গণ-সাহিত্যের নাম করে কেউ ঢুকে পড়েছেন পাবলিকেশনে। পিকাসোর আঁকা শান্তির পায়রার ডানায় ভর করে আধা-রাজনৈতিক সংস্থার কল্যাণে কেউ কেউ আড্ডা গেড়েছেন মস্কো আর বুখারেস্ট।

আজ অনেকে বলে বেড়ায় আমি নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। আমি নাকি মুচলেকা দিয়েছিলাম, ভবিষ্যতে পার্টি-টার্টি আমি করছি না। ধ্বংসাত্মক কাজে আমি নেই। আমি নাকি কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতেও রাজি হয়েছিলাম; আমি একটা বেইমান। পাক্কা কেরিয়ারিস্ট।

এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে পাঁচজনের মত বসে আমি পড়িনি। পার্টি লাইন যে ভুল, একথাই আমি প্রাদেশিক দপ্তরে সাত পাতার দীর্ঘ পত্রে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। সভ্যকার্ড ফেরত দিয়ে চিঠির শেষ লাইনে বলেছিলাম, 'তেলেঙ্গানা নেই, আমিও নেই।'

তারপরের ঘটনা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত। পলাতক অবস্থায় মেডিক্যাল রিপ্রেজন্‌টেটিভ-এর চাকরি নিয়ে লক্ষ্ণৌ পালানো। বম্বের ট্রেনিং। অজিতেশের সঙ্গে দেখা। মিনাক্ষী ধরের আবির্ভাব। বাবার মৃত্যু। সর্বশেষে 'সমন্বয়' পত্রিকায় এসে ঠেকবার পরিবর্তন।

বাবার মৃত্যুর পর সাংসারিক বন্ধনটুকু ছিন্ন হলো। বাবার লাইফ

ইনসিওরেন্সের টাকায় হাত পড়েনি, কল্যাণী প্রেম করে বিয়ে করেছে। পদবী তার 'দত্ত'। দাদা বিয়েতেই যাননি। অব্রাহ্মণ দত্তকে তিনি বরদাস্ত করেননি। কল্যাণী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মুখে নাকি চুণকালি দিয়েছে।

আমার মতই দলত্যাগী ছিল নিখিল রায়। আমি তার বাড়িতে পেইংগেস্ট্। নিখিল অধ্যাপক। দেশ পাঁশকুড়া। কলকাতায় বউ নিয়ে একা থাকে। নিখিলের অপরাধ-প্রবণতা আমি কাটিয়ে দিতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি, বিপ্লবেব সময় আমরাই সংগ্রামের প্রথম সারিতে থাকবো। মার্ক্সবাদ কারুর বাবার সম্পত্তি নয়। দলত্যাগী আমরা নই। পার্টিই তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়েছে। আমাকে জায়গা দিতে নিখিলের আগ্রহ। ড্রইংরুমের চেহারা খারাপ করতে নিখিলের স্ত্রীরও ইচ্ছে।

অল্পদিনেই বুঝেছি কাগজের অফিসে দুটো দল। একটা মালিকপক্ষ। সম্পাদক অমিয় পালিতের আস্থাভাজন চক্রটিও কম শক্তিশালী নয়।

অমিয় পালিতকে দূর থেকে এতদিন শ্রদ্ধা করেছি। সমন্বয় এক রকম নিজের হাতে গড়া পাণ্ডিত্য অসাধারণ। তাঁর জোরালো সম্পাদকীয় পড়ে এককালে মুগ্ধ হয়েছি। রসিক লোক। সন্ধ্যের পর পানীয়ঘটিত বুদ্ধিজীবীদের আসরের মধ্যমণি। অকৃতদার। অসম্ভব মুখ খারাপ করেন। এ রকম আসর জমানো মানুষ নাকি সত্যিই দুর্লভ।

প্রথম দিনের পরিচয় কিন্তু আমার ভাল লাগেনি। ভাল করে মুখের দিকেই তাকাননি। যোগ্যতা সম্পর্কে এতটুকু কৌতূহল ছিল না। মিনাক্ষী ধরের চিঠিটা পড়ে বললেন,

—আপনিই সেই অরুণ সান্যাল! কাজে লেগে যান।

কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা তাচ্ছিল্য ছিল। ফোনে কাকে যেন ডাকলেন। এলেন অদিতিবাবু।

—ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, আমাকে সর্দারী দেওয়া কেন! কে কোথায় কাজ করবে সে কী আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে? এসব ছেনালীর কী মানে হয়? নিয়ে যাও। ইনিই সেই অরুণ সান্যাল।

বলা বাহুল্য অমিয় পালিতের সেদিনের ব্যবহার আমার এতটুকু ভাল লাগেনি।

লীগ আমলে কুলীন ব্রাহ্মণ সেক্রেটারিয়েট-এ নিয়োগপত্র পেলে, তার গা থেকে যেমন পেঁয়াজ-রশুনের গন্ধ পাওয়া যেত, আমার 'সমন্বয়'-এ ঢোকার পেছনে স্বয়ং যে সুবিমল রায় আছেন—এটা দেখলাম সবাই জেনে গেছেন।

মাস দুই পর অমিয় পালিত আমাকে ডেকে পাঠালেন।

অদিতিবাবু ঘুষ দেবার জেস্‌চারে নিভৃতে ডেকে বললেন,

—এসব কী শুনছি অরুণবাবু! আপনি কী কমিউনিস্ট?

—এ কথা বলছেন কেন?

—শুক্রবারের কাগজে কী সব লিখেছেন? অমিয়বাবু পর্যন্ত ঘাবড়ে গেছেন। বড়বাবু শুনলাম খচে গেছেন।

—তুমি সুবিমল বাবুর সঙ্গে দেখা করো নি?

ঘরে ঢুকতেই অমিয় পালিত প্রশ্ন করলেন। থতমত খেয়ে একটু অপরাধীর মত বললাম।

—না।

—কেন?

—প্রয়োজন হয়নি। দেখা করবার কথা কেউ আমাকে বলেননি।

—দেখা করা উচিত ছিল। কলকাতায় থাকলে সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টা খানেকের জন্যে তো একবার আসেন।

—আপনি দেখা করতে বলছেন?

—আজ আর তাঁকে পাচ্ছো কোথায়? কাল দেখা করো। শুক্রবারের কাগজে কী আজেবাজে কথা লিখেছো। ভুলে যেও না,

পরের দোকানে কাজ কর। তোমার আবার আদর্শ-টাদর্শ আছে নাকি ?

কথার ঢঙটাই ভদ্রলোকের বেয়াড়া। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—পশ্চিম বার্লিনে আমেরিকা যত ডলারই ঢালুক তাতে তোমার কী ? সমন্বয়-এ কাজ করতে হ'লে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী চালিয়ে যেতে হবে। অদিতি যা বলে সে কথা শুনে চলবে। বেশী আদর্শ-টাদর্শ সুবিমল রায় বরদাস্ত করবেন না। তিনি প্রায় অগ্নিযুগের লোক। পুড়ে মরবে হে।

একটু থেমে অমিয় পালিত একটুকরো হেসে বলেন,

—তুমি তো তাঁর সুপারিশেই ঢুকেছো। তুমি তো মিনাক্ষী ধরের লোক।

—সুপারিশ বলতে পারেন, কিন্তু কারো সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই। সুবিমল রায়ের সঙ্গে একবারও আমার দেখা হয়নি।

ভদ্রলোক একটু দমে গেলেন। অল্পক্ষণ পর বললেন,

—'ইস্তাহার' তোমার লেখা ? বইটা আমিই রিভিউ করেছিলাম। তা ও মাগীটার সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কেমন করে ?

কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম। সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন,

—আমেরিকা নিয়ে খিস্তি-খেউড় কোরো না। তাছাড়া চাকরি যেখানে কর, সেখানে তোমার রাজনৈতিক প্রবন্ধ নাই বা ছাপলে। সমন্বয়-এর রুটীন মাফিক কাজই কর। স্রেফ শ্রম বিক্রি কর। এটা মস্কো নয়—আমেরিকান ডেমোক্রেসীও এখানে অচল। এটা 'সমন্বয়'। সুবিমল রায়ের একমাত্র নির্ভীক জাতীয় পত্রিকা।

অমিয়ভূষণ পালিত আমাকে বসতে বলেননি। খুব একটা আমলও দেননি। তবু কেন যেন ভালো লাগলো। আমার ওপর প্রচ্ছন্ন একটা সমর্থন আমি লক্ষ্য করেছি। সেইসঙ্গে সুবিমল রায়ের প্রতি মানুষটির একটা চাপা উপেক্ষাও আমার চোখ এড়ায়নি।

পরদিনই দেখা করেছি। ঝলমলে ঘরে সুবিমল রায় একা। শুক্রবারের কাগজে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ নিয়ে কোনো কথাই বললেন না। বরং আশাতীত ভদ্র ব্যবহার করলেন। তবে মিনাক্ষী ধরের নাম একবার মুখেও আনলেন না।

ব্যস্ত ছিলেন। ফোনে কথা বলছিলেন। বসতে বললেন ইঙ্গিতে। বেশ খুশী খুশী ভাব। ফোনে কথা হচ্ছিলো,

—খুব মনে আছে, হ্যাঁ ঠিকই বলছি। মহাত্মাজী তাঁর আগের বছর পেট অপারেশন করিয়েছিলেন আমার খুব ভাল মনে আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমেদাবাদ এ আই. সি. সি.। মহাত্মাজী তিন ভোটে মতিলাল নেহেরু আর সি. আর. দাশকে হারিয়ে দিলেন। মনে নেই। 'কাউন্সিল আন্দোলন' হেরে গেল। সি. আর. দাশ আর মতিলালজী সভা ছেড়ে চলে গেলেন। তা থাকে। এসব পুরোনো কথা কী সহজে ভোলা যায়। আচ্ছা, আচ্ছা।

কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে পুরো দৃষ্টি আমার মুখের ওপর মেলে ধরে বলেন,

—কী ব্যাপার ?

—স্যার আপনি আমার খোঁজ করেছিলেন। ডেকেছেন ?

—আমার জানা উচিত কে কোথায় কাজ করে। কাদের নিয়ে আমার 'সমন্বয়'। অবশ্য তোমাকে আমি ঠিক ডাকিনি। অমিয়-বাবুকে জিগ্যেস করেছিলাম—কেমন কাজকর্ম করছে। তুমি তো অদিতির সঙ্গে আছো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভাল করে কাজকর্ম শেখো। আমার নতুন নতুন পরিকল্পনা আছে। আস্তে আস্তে সব জানতে পাবে। কাগজের অফিসের ঘরোয়া পলিটিক্সের মধ্যে যাবে না। কিছু বলার থাকলে সঙ্কোচ করবে না। আমার কাছে চলে আসবে।

দু'চার কথার পর হাবভাব দেখে বুঝলাম এবার আমি উঠতে

পারি। উঠছিলামও। ঘরে ঢুকলেন রাখাল দত্ত। হাতে সাদা ফুরফুরে দু'খানা কাগজ। অপরাধীর মত টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

—আবার কী চাই?

—মদনবাবু আজ আসেননি। এখনই আপনাকে দিতে পাচ্ছি না, কাল সকালে যদি বলেন আমি বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি।

বিরক্তির সুরে সুবিমল রায় বলেন,

—দরকার হবে না, চিঠিটা রেখে যাও। মদনবাবু ছাড়াও কলকাতায় ফরাসী জানা লোক আছেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে রাখাল দত্ত পাতলা কাগজ দুটি টেবিলে রেখে চলে গেলেন।

—ভারত কোনোদিন ফরাসীদের কলোনি ছিল না, চন্দননগরের বাসিন্দেও আমি নই। ফরাসী ভাষা যে আমাদের জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বেশ ঘা দিয়ে একটা জবাব পাঠাতে হবে।

কথাগুলো সুবিমল রায় আপন মনেই বলে গেলেন।

—চিঠিটা ফরাসীতে লেখা?

—তুমি জান নাকি?

—চেষ্টা করে দেখতে পারি। তর্জমা একটা খাড়া ক'রতে পারবো। খুব জরুরী থাকলে আমাকে দিতে পারেন।

—খুবই জরুরী। দ্বারিকা না থাকায় আমার খুবই অসুবিধে হয়েছে। কিন্তু বেচারীকে দোষ দেওয়া যায় না। মদনবাবু আবার আজ আসেননি। একবার দেখবে? কতক্ষণ লাগবে?

—আধঘণ্টার মধ্যে একটা তর্জমা আমি করে আনছি।

—দেখো। চিঠিটা গোপনীয়। কাউকে বলবে না।

অর্থপূর্ণ একটুকরো হেসে সুবিমল রায় কাগজ দু'খানা আমার হাতে তুলে দিলেন।

সময় আমার কিছুটা বেশীই লেগেছে। আমার জন্যে অপেক্ষা

করছিলেন। চিঠিটাই ভাল, খুশী হবার মত যথেষ্ট কারণ ছিল। সুতরাং আমার অনুবাদের খামতিটুকু নজরেই আসেনি। সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়ে বললেন,

—বেশ হয়েছে। মিনাক্ষী কী আর আমার কাছে বাজে লোক পাঠাবে। ধন্যবাদ।

সুবিমল রায়ের সঙ্গে এই আমার প্রথম দিন। সফল ইঙ্গিত-পূর্ণ প্রথম দেখা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তারপর একটানা কয়েক বছর। প্রচুর অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অমিয় পালিতের কথায় আমি 'সমন্বয়'-এর শক্তিশালী এক প্রত্যঙ্গ। সুবিমল রায় আমাকে পছন্দ করেন। ঈর্ষার কারণও আমি অনেকের। আমি দলত্যাগী কমিউনিস্ট, একথা সবাই জানেন। তাতে ঈর্ষাকাতর উপদলটি সুবিধে করতে পারেননি। স্বয়ং সুবিমল রায় মৃগেনবাবুকে নাকি বলেছেন, দলত্যাগী কমিউনিস্টকে ষোলআনা বিশ্বাস করা চলে। ছোকরা ক্ষমতা রাখে।

কথাটার মধ্যে তীব্র একটা ব্যঙ্গ ছিল। আমাকে চিনতে ভুল'ই করেছেন সুবিমল রায়। মৃগেনবাবুকে জবাবে বলেছি, পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে, কিন্তু আপনার জানা থাকা উচিত আমি একজন প্রকৃত মার্ক্সবাদী। শ্রেণী-সংগ্রামে আমি বিশ্বাসী।

দিন অতিবাহিত হয়। সবচেয়ে অতি নিকটের কাছের মানুষ অমিয় পালিত। তিনি আমাকে পছন্দ করেন। তাঁর কথাবার্তা আমার ভাল লাগে। বহু টালমাটালের মধ্যেও মানুষটি তাঁর রাজনৈতিক চরিত্র হারাননি। একটার পর একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পেয়েছি। সুবিমল রায় মনে করেছেন আমি তাঁর লোক। অমিয় পালিত বিশ্বাস করতেন আমি তাঁর কথাতেই চলি-ফিরি।

বেশ চলছিলো, এমন সময় উল্লেখযোগ্য একটা কাণ্ড ঘটলো। এককালের সহপাঠী বন্ধু হৃষীকেশ একদিন দমদম এয়ারপোর্টে জরুরী

তলব করলো। সঙ্গে ক্যামেরাম্যানও নিতে বলে। জানালো, বিশেষ জরুরী খবর আছে। একদম দেরী করবে না।

হৃষীকেশ ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের প্রিভেনটিভ অফিসার। ভেবেছি খুব বড় ধরনের স্মাগলিং-এর রসালো কিছু পাব। কিন্তু এয়ার পোর্টে এসে দেখলাম পুরোপুরি রাজনৈতিক হেডলাইনের ব্যবস্থা। সশস্ত্র ফরাসী সেনারা ভিয়েতনামে যেতে দমদম এয়ারপোর্ট ব্যবহার করছে। সাংবাদিকের কাজ ভুলে আমি দস্তুরমত রাজনৈতিক ভূমিকাই নিয়ে বসলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তোলপাড় করে ফেলি। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কেবল্ ছুটলো দিল্লী। প্লেন আটকানো হলো। দিল্লী অপ্রস্তুত। নিরপেক্ষ নীতির বেইজ্জতী। ফরাসী সামরিক বাহিনীর বিমান ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

অন্যান্য দৈনিকে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু হৃষীকেশের কল্যাণে গোটা ব্যাপারটার পেছনে আমার ভূমিকা ছিল অসাধারণ। অমিয় পালিত বললেন,

—চুটিয়ে ফ্লাশ করো। কেন্দ্রের রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশ করে দাও।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফস্টার ডালেসের মতিগতি সম্পর্কে আমি নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিলাম। পরদিন কেন্দ্রের পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে অমিয় পালিতের তীব্র শ্লেষাত্মক সম্পাদকীয় 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হয়। বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে দীর্ঘ রিপোর্টিং ক্যামেরাম্যান পল্টুর প্রামাণ্য দলিল চিত্রসহ আমার নামে প্রকাশিত হলো।

দু'একজন কমরেড বন্ধু টেলিফোনে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, তোমার সম্পর্কে আমরা দেখছি অনেক অবিচার করেছি। পার্টি ছাড়লেও তুমি পূর্বের মতই সত্যনিষ্ঠ আছ। তুমি হাটে-হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছো। 'সমন্বয়' পত্রিকায় তুমি আছো, তাই এরকম দুর্ধর্ষ রিপোর্টিং সম্ভব হয়েছে।

জবাবে বলেছি,

—আমি ডায়লেকটিকে বিশ্বাসী। 'সমন্বয়'-এ এসেছি, বলে দালাল হয়ে গেছি এমন মনে করা ভুল হবে। আমি স্রোতের সঙ্গে ভাসছি। মাও-ৎসে-তুং ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখ। ইয়েনানে একবার চৌ এন লাই....

লাইন অপারেটার কেটে দিল। বললো, বড়বাবু ডাকছেন। শীঘ্রই ওপরে যান।

স্রোতেই ভাসছিলাম। রিসিভারটা বড়শিঁর কাজ করলো। এক ঝটকায় সুবিমল রায়ের দোরগোড়ায় এনে ফেললো।

সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। মুখটা গম্ভীর। চোখে সন্দেহ,

—ভারত সরকারকে অপ্রস্তুত করা 'সমন্বয়'-এর লক্ষ্য নয়, তোমার জানা দরকার। গোটা ব্যাপারটার জন্যে দিল্লীকে তুমি দায়ী কর কী ভাবে? যে মুহূর্তে সরকার জানতে পেরেছে, তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ট্রুপস্ মুভমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়েছে। ভারত সরকারের কোন হাতই নেই। 'সধবার একাদশী' আমি পড়েছি। অমিয়বাবুর বাল-বিধবার মত খেদোক্তিতে সস্তা হাততালি পাওয়া যায়, পপুলার তুমিও হবে, কিন্তু সাংবাদিকের সততা রক্ষা হলো কী? তুমি এটা কী করেছো? একটা মটোর দুর্ঘটনার খবরের চেয়ে এই পুরো নিউজটার বেশী প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয়। তোমাকে আজ হঠাৎ বামপন্থী তারুণ্যে মেতে উঠতে দেখবো সত্যই আমি ভাবতে পারিনি। তোমার বিচার বিবেচনার ওপর আমার আস্থা ছিল। 'সমন্বয়'-এর আভিজাত্য নষ্ট করতে বসেছো। যলস্ এ্যাজিটেশনে তুমি থাক আমি চাই না। শুনছি আজও একটা বড় লেখা বেরুচ্ছে। ছবিও ছাপছো।

আমি নিরুত্তর। ডান হাতের আঙ্গুলগুলো দেখছিলাম।

—কী উত্তর দিচ্ছো না যে?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকাই।

—মৃগেনকে বলেছি গ্যালি ভেঙে দিতে। আমি জানি এ সবের পেছনে কে? অমিয় পালিতের জানা উচিত, 'সমন্বয়' পত্রিকার মালিক তিনি নন। মিনিস্ট্রি অফ হেলথ্-এর জন্ম নিয়ন্ত্রণের এক বছরের বিজ্ঞাপনের টাকা যে তার মত গোটা চারেক সম্পাদকের সারা জীবনের মাইনে একথা তিনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হয়। কী বোবা বনে গেলে যে!

—মৃগেনবাবুর গ্যালি ভেঙে ফেলবার দরকার নেই। আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে। সেই নিযমে কাজ করবো। আজকের ম্যাটার আমি তুলে নিচ্ছি।

—আমি কী মরে গেছি নাকি! এ সব হচ্ছে কী"!

—আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি উত্তেজনাই খুঁজেছি, রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারিনি।

—পারা উচিত ছিল। অন্তত তোমার বোঝা উচিত ছিল। পার্টি করেছো তুমি, আর সামান্য জিনিসটা বুঝলে না। আমি খোঁজ নিয়েছি। 'আর্মি ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়েল' আর 'আর্মি পে বুক' দেখেই বুঝে নিলে ফরাসীরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। এ অভিযোগের কোনো মানে হয়।

—আমার অন্যায় হয়েছে। কোনো লেখা আজ যাচ্ছে না।

—থাকবে। এয়ারপোর্টের খবর আজ দিতে হবে। তবে মৃগেন সেটি তৈরী করবে। অমিয়বাবু আশা করি আজ আবার সম্পাদকায়তে 'ডেমোক্রেসীর শাঁখা-সিঁদুর অক্ষয় হোক' গোছের কিছু ছাপবেন না। ওটা কী একটা লেখা হয়েছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সুবিমল রায় আমাকে জ্ঞান দিলেন। সামনা-সামনি সম্ভব নয়, অমিয় পালিতের ওপর যত ঝাল আমার ওপর ঝেড়ে দিলেন।

বেরিয়ে এসে পেলাম না। অমিয় পালিত চলে গেছেন।

পরদিন অমিয় পালিতের বাড়ি গেছি। বলেছি, সমস্ত নষ্টের মূল মৃগেন দত্ত।

লেবু দেওয়া র-চায়ের বিস্বাদ যেন আরও তিক্ততায় ভরে ওঠে,

—এয়ারপোর্টের খবরটা উপড়ে ফেলে জোড়া বেশ্যা খুনের খবরটা ছাপাতেই বুঝতে পেরেছি। দিন দিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। চাকরি করা যাবে না। বয়সও তো হলো, একটা চোখে আবার কম দেখি। আমারও তো বুড়ো বেশ্যার অবস্থা। আমাকে কে নেবে? এ বয়সে কোন কাগজে যাব?

সূত্রপাত এখান থেকেই। সুবিমল রায়ের সঙ্গে অমিয় পালিতের তিক্ত সম্পর্ক ক্রমেই তীব্র হতে শুরু করে অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলে।

আমি ছিলাম নেপথ্যে। নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্যে প্রমাণ হয়েছে সুবিমল রায় আমাকে বিশ্বাস করেন। মৃগেন দত্ত আমার বিরুদ্ধে লাগাতে সাহস করেন না। অনেকের প্রবল ঈর্ষা ও আপত্তি থাকা সত্ত্বেও চারের পাতায় সম্পাদকীয়র পাশে তিন কলম জায়গা আমার ফিচারের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হলো। অমিয় পালিত আমাকে স্নেহ করেন। ভালবাসেন। সুবিমল রায় আমাকে পছন্দ করেন। বিশ্বাস করতে শুরু করেন।

একমাত্র বিদুষী কন্যার ধনী পিতাকে কব্জা করার আনন্দ যে কী আমি জানি না, অকৃতদার মাতুলের উইলে জায়গা পাবার সুখ যে কতখানি, বুঝি না—কিন্তু তুলনা খুঁজতে গিয়ে আমার আগে মনে পড়ে, অনেকটা যেন দাম না মেটানো জুয়ার টিকিটের সূত্র ধরে অপরিচিত এক ঘোড়া ঘাড় বেঁকিয়ে মুখে গেঁজা তুলতে তুলতে প্রথম বাজি যেন আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেল।

সুন্দর কথা বলতে পারি, আমি জানি। বুদ্ধিগ্রাহ্য হাস্যরস পরিবেশনায় আমার নাম ছিল। অমিয় পালিত আমাকে সেই খাতিরে বেশী পছন্দ করতেন। রাজনীতি ছেড়েছি কিন্তু পলিটিক্যাল সিলেবাসে

আমার নিখুঁত জ্ঞান। ছবি আঁকতে জানতাম না, টানটোন ধরে ঘরানা বুঝতে পারতাম। তর্কের চেয়ে বিতর্কে গতি দিতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। দস্তুর মত ইনটেলেকচুয়াল কনইসার।

তবু অমিয় পালিতের তেহাই আমি ঠাওর করে উঠতে হিমসিম খেয়েছি। ধর্মঘটী শ্রমিকের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে তাঁর মর্মস্পর্শী সম্পাদকীয়, 'রুটীতে বারুদের গন্ধ' পড়ে দশজন পাঠকের মত আমিও মুগ্ধ হয়েছি। উগ্র একটা বামপন্থী চরিত্রের যখন হিসেব আসছে, তখন পলিটব্যুরো থেকে বিতাড়িত পাঁচ ও সতেরোর ঐতিহ্য-মণ্ডিত রুশ বিপ্লবীর রেলের সামান্য হিসেব পরীক্ষকের চাকরিতে এসে ঠেকার খবরকে কেন্দ্র করে অমিয় পালিতের 'ক্রেমলিনের তক্ত-তাউস' সম্পাদকীয় আশ্চর্য রকম বিভ্রান্তিকর। কোনো এক সাহিত্যবাসরে প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলা গণসাহিত্যে 'গণ' ও 'সাহিত্য' দু-এরই অনুপস্থিতিতে যশস্বী সাহিত্যিকদের মুণ্ডপাতে তিনি যেভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তাতে অনেকেই মনে করেছেন সবটাই তাঁর পানীয় ঘটিত উচ্ছ্বাস।

প্রথমটায় মনে হয়েছে, অমিয় পালিত একজন দস্তুরমত সুবিধাবাদী। অতিশয় 'পপুলার' হবার কায়দা-কানুন রপ্ত করেছেন। মানুষের মন নিয়ে ফাটকা খেলেন। পাঠককে ক্ষেপিয়ে তুলতে শিখেছেন দীর্ঘদিনের অভ্যাসে।

আসলে অমিয় পালিত ছিলেন অতিশয় ঝাঁঝালো মানুষ। চরিত্রের দেদীপ্যমান সত্য পুরুষটির মৌলিকতায় কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না। তবে তিনি যে শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করেন, তাতে আমার সন্দেহ আছে। গুরুতর প্রশ্নের উত্তরেও খিস্তিখেউড় থাকেই,

—মার্ক্সবাদে পৃথিবীর মঙ্গল হবে কিনা সে কথা আমার পক্ষে বলা মুশকিল, কিন্তু আমেরিকা যদি মনে করে স্রেফ উলঙ্গ নিকেতন দিয়ে সাম্যবাদ ঢেকে ফেলবে তাহ'লে খুবই ভুল করবে।

আমার নিজস্ব একটা ঢং আছে কথাবার্তায়, যা নাকি মানুষকে

আকর্ষণ করে। লেখারও নাকি একটা স্বতন্ত্র স্টাইল আছে—কানে আসতো। কিন্তু অমিয় পালিতের পক্ষপাতিত্ব অনেকের নজরেই ভাল লাগেনি। আমার বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষ আমি অনুভব করতে পারতাম। একটা দল আমাকে প্রাণপণে অপমান করবার চেষ্টা করতো।

অমিয় পালিতের মনটা ছিল দিনের আলোর মতন। অন্তরের সমস্ত কিছু প্রকাশ ক'রে দিতেন। আমার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেকের যে তিনি বিরক্তির কারণ হয়েছেন, তিনি নিজে সেটি বুঝতে পারতেন না। প্রতিদিনের নাটমঞ্চে নানা ঘটনাপ্রবাহ বা সিচুয়েশনের 'মুড' ধ'রে আলো ফেলাতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। সাধারণের শ্রদ্ধা ভালবাসা যেমন পেয়েছেন—সক্ষম মানুষ তাঁকে সমপরিমাণ বর্জন করেছেন। ক্ষমতাশালী মানুষের সুনজরে তিনি ছিলেন না কোন দিনও। সামনে তাঁরা ভয় করতেন। মিথ্যে শ্রদ্ধা দেখাতেন।

সংসারে তিনিই ছিলেন একমাত্র ও অদ্বিতীয় মানুষ। কিন্তু তাঁর আয়ের সঙ্গে বহু মানুষের ব্যয়ের অতি নিকট সম্পর্ক লক্ষ্য করেছি। আত্মীয়-স্বজনের হাঁটা-চলা চলেছেই। ডাকযোগে, তারযোগে, লোক-যোগে নিয়মিত এখানে-সেখানে টাকা পাঠানোর বিরাম নেই।

কেউ এসে জানালো—পাত্র প্রস্তুত, পঞ্জিকাতেও শুভদিন আছে বিস্তর। অর্থাৎ তার মেয়ের বিয়েতে অমিয় পালিত কত টাকা খরচা করবেন বলে ঠিক করেছেন, সেটা এখন জানা দরকার।

এক রবিবারের সকাল। ঘর ভর্তি লোক। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে আলোচনা চলেছে। এমন সময় এক প্রৌঢ়া বিধবা একরকম ঠিকরে ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন। অসংবৃত বেশবাস। পরণের কাপড়টি একরকম বগলের কাছে দলা পাকানো। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ ; অমু, মঙ্গলা কিন্তু সব ভাইঙ্গা চুইর‍্যা দিবের নিলো!

সকলেই আমরা হতচকিত। আলোচনায় ছেদ পড়ে। নির্বিকার অমিয় পালিত ঠোঁটে সামান্য একটু হাসলেন। বললেন—মঙ্গলার সঙ্গে

আমার কথা হয়েছে। কাল আমি ফোন করে দিয়েছি। টাকা ফেরত পেলে চাকরি ওর যাবে না। তবে মঙ্গলাকে বোলো ভাঙ্গা কাশ আমি আর জোড়া লাগাতে পারবো না। হারামজাদা বিয়ে করেছে তাই—নইলে একটা পয়সাও দিতাম না। মান সম্মান গেল দেখছি।

সম্পর্কে মঙ্গলা ভাগ্নে। ছয়শো টাকা দিয়ে মঙ্গলার সাংসারিক জীবনে মঙ্গল ফিরিয়ে আনলেন অমিয় পালিত।

এ রকম বহু। এ ধরনের বহু চোর মঙ্গলা, সাধু মঙ্গলার মঙ্গল সাধনে অমিয় পালিতকে সর্বসময়েই প্রস্তুত থাকতে হতো।

সাংসারিক জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত, কিন্তু অবাঞ্ছিত নিত্য অসুখের গ্লানি ছিল অহরহ।

সংবাদ পত্রের মালিক সুবিমল রায়। অমিয় পালিত কিন্তু এই মানুষটিকে কোন দিনই আমল দিতে চাইতেন না। আলোচনা বসতো হামেসাই। কিন্তু কাগজের পলিসি বা পলিটিক্স নিয়ে সুবিমল রায়ের সঙ্গে ভুলেও কোনো দিন আলোচনা শুনিনি। শুধু বুঝতাম সামনে বসে হাসাহাসি আছে, চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলা আছে, এ মুখ থেকে ও মুখে সিগারেটের আগুন ফেরানো আছে—কিন্তু ওগুলো নিতান্তই মামুলী ভদ্রতা। একেবারেই খাতিরের খাতিরে খাতির।

সম্পাদকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি সাংবাদিক গোষ্ঠীর পাশাপাশি, কর্মচারীদের মধ্যেই সুবিমল রায় নিজের শক্তিশালী দল গঠন করেছেন বুঝতে পারতাম। কাগজের সারকুলেশন-এর খাতিরে এত দিন অমিয় পালিতের দরকার ছিল—আজ প্রয়োজন ফুরিয়েছে। চাপা অসন্তোষ প্রকাশ হয়ে পড়তে সুরু করলো দিনে দিনে।

চাই চাপা আগুন আত্মপ্রকাশ করলো একদিন। হনুমানদাস বাজোরিয়ার বক্তৃতা কাগজের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হলো।

নিউজ এডিটরকে ডেকে অমিয় পালিত বললেন—দিন দিন কাগজ যে 'বড়বাজার সমাচার' হয়ে উঠলো হে! হনুমান-টনুমান নিয়ে লঙ্কা-কাণ্ড বাধিয়ে তুললে দেখছি।

নিউজ এডিটর নিজে ছিলেন সুগ্রীব দোসর—তাঁর লেজ অনুসরণ করে রামের হদিশ পাওয়া গেল। বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যান অমিয় পালিত,

—সুবিমল রায় এসবও আরম্ভ করেছেন নাকি! বাজোরিয়ার ছবি আর বক্তৃতা কাগজের ঐ জায়গায় ছাপতে বলেছেন? এটা কি তামাশা! আমি আজ সম্পাদকীয় লিখবো বাজোরিয়াকে নিয়ে। ঠেকাও তুমি!

'কলিযুগের হনুমান' সম্পাদকীয় কিন্তু পরদিন প্রকাশিত হলো না।

অপমানিত অমিয় পালিত আমাকে ডেকে বললেন, আজ একটা হেস্তনেস্ত হবে। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। আমি অমিয় পালিত, বড়বাজারের বেশ্যাবাড়ির দালাল নই। বড়বাবু এলে খবর দেবে।

খবর দেবার প্রয়োজন হলো না। স্বয়ং সুবিমল রায় মটোর থেকে নেমে সোজা অমিয় পালিতের ঘরে এলেন। বললেন,

দেখুন অমিয়বাবু, আপনাকে কিছু বলতে ভয় হয়। আপনি জ্ঞানী লোক, কিন্তু কাগজের ভবিষ্যৎ ভেবে আপনার কড়া কড়া লেখা একটু যদি........। সরকারী বিজ্ঞাপনের মুখ চেয়ে অন্ততঃ।

—আপনি কী বলতে চান?

—'কলিযুগের হনুমান' আমি ছাপতে বারণ করেছি।

—কেন করেছেন?

—হনুমান আমার বন্ধু।

—এ আপনার আশ্চর্য যুক্তি। একটা চোরাকারবারী, দেশের শত্রু, আপনার বন্ধু। সেটাও না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু কোন্ অধিকারে আমার লেখা ছাপা বন্ধ করেন।

—অনেক দিন থেকেই ভাবছি। 'সমন্বয়'-এর গোড়া থেকেই আপনি আছেন, সেই কারণে সঙ্কোচ বোধ করছি। কিন্তু আপনি অসম্ভব বাড়াবাড়ি করছেন।

—আপনি স্পষ্ট করে বলুন! বাড়াবাড়ি বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন?

—আপনার ইচ্ছেমত কাগজ চালাবেন?

—আমি কাগজের সম্পাদক।

—কিন্তু কাগজটা আমার।

অল্পক্ষণের আলোচনা, তারপর রীতিমত বাক্‌যুদ্ধ। অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন অমিয় পালিত। সুবিমল রায়ের ইচ্ছেও ছিল মানুষটিকে অসহিষ্ণু করে তোলা।

—আপনি সপ্তাহে একদিন এডিটোরিয়াল ছাড়া অন্য কিছুতে হাত দিতে পারবেন না। যদি কিছু না করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমার মনে হয় মৃগেনকে আপনি যথেষ্ট মর্যাদা দিচ্ছেন না।

—আমি যত দিন আছি গোটা কাগজটা আমার নিয়মেই চলবে। উপযুক্ত মানুষকেই আমি মর্যাদা দিয়ে থাকি—মৃগেনকে নয়।

—আমাকে তাহ'লে অন্য নিয়মে ভেবে দেখতে বলছেন।

সাপের মতন তাকান সুবিমল রায়।

—আপনি কী নিয়মে ভাববেন সে সম্পর্কে আমি কী বলবো। তবে বেশ কিছুদিন বুঝতে পাচ্ছি আপনি আমার বিরুদ্ধে একটা নোংরা রাজনীতি পাকিয়ে চলেছেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি অমিয় পালিত।

—নোংরা রাজনীতি কী দেখলেন?

—আমার ঘৃণা হয় সুবিমলবাবু। পাঁচজনের মত আমাকেও আপনি শুধু কর্মচারী মনে করেন। সমন্বয় আপনার কাগজ। চমৎকার!

—আপনি আমাকে বাধ্য করছেন। বেশ, আমার নিয়মেই আমি ভাবছি।

সুবিমল রায় অন্য নিয়মেই ভাবছিলেন। শুধু ভাবছিলেন না,

মৃগেন দত্তকে সামনে রেখে নিজেই সম্পাদক হলে কেমন হয়, সে নিয়ে রুদ্ধকক্ষে অধিবেশন তিনি শেষ করেছিলেন অনেক আগেই।

আপাতদৃষ্টিতে অমিয় পালিতের সঙ্গে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মতবিরোধ মনে হলেও সুবিমল রায়ের আসল মতলব ছিল অন্যরকম। নতুন নিয়মে পূর্বের মত ব্যক্তিগত মালিকানার লাঠি ঘোরানো চলবে না সুবিমল রায় বুঝতে পেরেছিলেন। নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী একমাত্র অমিয় পালিতকেই আরও হাজার টাকা বেশী মাইনে কবুল করতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের সহকারী সম্পাদক থেকে আরম্ভ করে সামান্য কর্মচারীদের পেছনে বিপুল অর্থ খরচ করবার কথা ভেবে সুবিমল রায় এই চাল চালছেন।

সুবিমল রায় এতদিন শুধু সুযোগ খুঁজেছেন। হনুমানদাস বাজোরিয়া ঘটিত কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডটি তিনি যথানিয়মে কাজে লাগালেন।

চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন অমিয় পালিত। সুবল দত্ত ছুটি নিয়ে মিহিজাম চলে গেলেন।

অমিয় পালিতের কাছে ছুটে গেলাম। বললাম—এসব কী শুনছি?

—ঠিকই শুনছো। ওরা সত্যি কথা বলতে দেবে না। আমাকে সরে আসতেই হবে। আমি সব পারি, শুধু জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারবো না।

—কিন্তু 'সমন্বয়'-এ আপনি না থাকলে 'সমন্বয়' থাকবে কী?

—খুব থাকবে। তবে মৃগেনের জন্যে খারাপ লাগে। সুবিমল রায় গাধাটিকে পাপোষের মত ব্যবহার করলো। আমাকে সরালেও মৃগেন যে সম্পাদক হবে না এটা বেচারা আজও বুঝলো না।

—কিন্তু এভাবে হার স্বীকার করতে হবে?

অমিয় পালিত একটুকরো হাসলেন,

—এটাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে ভুল করবে। এটাই স্বাভাবিক। এখানেও হনুমান বাজোরিয়া। তাছাড়া শাসনযন্ত্রের অদৃশ্য চাপ। সুবিমল রায়ের কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু আমি আশা করিনি। যে ভাবে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে এ অবস্থা হতোই। সমাধান ছিল একটাই। সুবিমল রায়কে পুরোপুরি মেনে নেওয়া। আমি পারলাম না।

—কিন্তু আমরা এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো।

—তোমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত—কিছু নেই শুধু বাসনা আছে। তবে তোমাদের নিজেদের জন্যেই প্রতিবাদ ওঠা দরকার।

—দেখুন না আমরা কী করি।

—হেরে যাবে।

—কিন্তু আমরাও সুবিমল রায়কে দেখে নেব।

—দেখ অরুণ, জীবন দিয়ে এই 'সমন্বয়' আমার নিজের হাতে তৈরী। এমনও দিন গেছে, পাঁচ কিস্তিতে মাসমাইনে নিয়েছি। প্রথম দিকে মাইনেই পাইনি। পুরানো যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই সে কথা জানেন। সত্যি কথা বলতে কী 'সমন্বয়'-এর জন্যে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করেছিলাম। এই হয়। এই নিয়ম। আজ আমাকে যেতে বাধ্য করা হলো। কাল দেখবে তোমাকে ধরে টানাটানি করছে। আমার জন্যে না হলেও তোমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে জোরালো প্রতিবাদ হওয়া দরকার। নইলে সুবিমলবাবু মাথায় পা দিয়ে কাজ করাবেন।

সেইদিনই আমাদের গোপন এক অধিবেশন হয়ে গেল। একটা জোরালো প্রতিবাদ নিয়ে সুবিমল রায়ের ঘরে আমি একাই গেলাম।

সুবিমল রায়ের মত মানুষের মুখের ওপর কথাগুলো ছুঁড়ে মারলাম—অমিয় পালিতের সঙ্গে কাজ করতে না পারলে আমরা কাজে ইস্তফা দেব! আমি অন্ততঃ বেরিয়ে যাব!!

প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের জন্যে তৈরী ছিলাম। কিন্তু সুবিমল রায় সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। আমার আস্ফালন নজরেই পড়লো না।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সহজ অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,

—তোমাকেই আমি খুঁজছি। আমার সঙ্গে এসো। চাকরি ছাড়বার সময় তুমি অনেক পাবে।

'সমন্বয়'-এ আবার এসেছি তিন চারদিন পর। আবহাওয়া থমথমে। আমাকে অনেকে এড়াতে চেষ্টা করেছেন। তবু কথা কানে আসে। আমি নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এ-কদিন আমি সুবল দত্তের মিহিজামের বাড়িতে ছিলাম। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে আধ মাইল রাস্তা খুঁড়ে আমার বাড়িতে টেলিফোন বসানো নাকি আশ্চর্য রকম ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা। সুবিমল রায়ের ঘরে ঢুকে আমার প্রচণ্ড প্রতিবাদ চাপরাশির চোখে দেখা, কিন্তু নিজের বুদ্ধিভ্রংশ নিয়ে আত্মধিক্কারে আমাব তিন দিন নাকি অতিবাহিত হয়েছে। আমি একজন দুমুখো সাপ। পুরোপুরি ডবল ক্রস। সুবিমল রায়ের পায়ে ধবে ক্ষমাও নাকি চেয়েছি, একথাও আমার কানে আসে।

আমাকে সবাই যেন জোর করে সুবিমল বায়ের চক্রের দিকে ঠেলে দিল। পরশ্রীকাতর, ক্ষুদ্র এই জীবগুলোকে অমিয় পালিতই ঠিক ধরেছিলেন—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, কিছু নেই, শুধু বাসনা আছে।

তবু আশঙ্কা করেছি আর পাঁচজনের মত স্বয়ং অমিয় পালিত নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝবেন। প্রগতিশীল জোরালো গলাবাজীর তলায় আমার মধ্যবিত্ত স্বার্থপর চরিত্র আবিষ্কার করে হাসবেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার যে কিছুই করার ছিল না, সে তাৎপর্য বোঝাতে না পেরে নিদারুণ জ্বালায় জ্বলেছি। আমার তরফ থেকে পরিষ্কার হবার তাগিদ বোধ করেছি।

অমিয় পালিতকে সামনে রেখে যে দল এতকাল টেবিল চাপড়াতো তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছি সবই মাটি। এই সুযোগ সন্ধানী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ

আন্দোলন-টান্দোলন অসম্ভব। তাই এ্যাডভেঞ্চারিজম আমি এড়াতে চেয়েছি। পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি আমিও বিতাড়িত হবো। কৌশলের আশ্রয় নিতে আমি বাধ্য হই। বেরিয়ে গিয়ে বা বিতাড়িত হয়ে আমি কারো উপকারে লাগবো না। কিন্তু 'সমন্বয়'-এর ভেতর থেকে প্রগতিশীল আন্দোলনের যতটুকু সুযোগ সেটুকুর সদ্ব্যবহার করতে হবে। এ এক ধরনের সহাবস্থান। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণও এই শিক্ষাই দেয়। বৃহত্তর শত্রুর সামনে পিছু হটবার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে।

টুকরো-টাকরা কথা যা কানে এসেছে, তা থেকে বুঝেছি পূর্বের অধিকার আমার নেই। অমিয় পালিতকে আমি চিনি। অভিযোগ করবার মানুষ তিনি নন। তবে তাঁর ঘরে বসে দেশের হালচাল কিংবা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনার আসরে আমার পূর্বের ভূমিকা হয়তো থাকবে না। সকালের মজলিসে হা হা করা হাসি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য রম্য-রচনা পরিবেশন করে আসরে তুফান তোলবার অধিকার আমি বিসর্জন দিয়েছি। আমাকে আজ নিশ্চয়ই ভুলই বুঝবেন মানুষটি।

সপ্তাহখানেক পরের কথা। চীফ রিপোর্টার রাখালবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা টাওয়ার হোটেলে দেখা। মানুষ হিসেবে ভদ্রলোকটিকে মোটামুটি পাস নম্বর দেওয়া চলে। আমাকে পছন্দ করেন। অমিয় পালিতের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। অমিয় পালিতেরই হাতে তৈরী। তবে রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান কম। চিরদিনই 'সমন্বয়'-এর ঘরোয়া পলিটিক্সের বাইরে। নিয়মিত মদ্যপান করেন। অমিয় পালিত চলে যাওয়ায় মর্মাহত। অপমানিত। মনে মনে ক্ষুব্ধ।

পর পর দুটো পেগের পর প্রশ্ন করেছি। রাখালবাবু হেসে বলেন,

—আপনার সম্পর্কে আলোচনা কিছু হয়নি। তবে আপনাকে ভুল বোঝবার অবকাশ আছে। আপনি মশাই কমিউনিস্ট লোক হয়ে ঠেকাতে পারলেন না। সবাই আপনার ওপর ভরসা করেছিল। আপনাকে অনেকেই ভুল বুঝেছে।

—কমিউনিস্ট আমি নই। আমাকে এত ভুল বোঝবার কী যুক্তি ?

—আপনার বিদ্রোহ ঘোষণা, অন্তর্ধান ও পরে আবার সব মানিয়ে নেওয়া অনেকেই সহজভাবে নিতে পারেননি।

—আপনি কী আমাকে সন্দেহ করেন ?

—আদৌ নয়। আপনি কী করবেন !

—সবই তো জানেন। মাল চিনতে আপনার কী বাকি আছে। এরা কী ধর্মঘট করতো ?

—এক রকম তাড়ানো হলেও অমিয় পালিত পদত্যাগ করেছেন। ধর্মঘটের যুক্তি কী ? অমিয় পালিত কাঁচা কাজ করবার লোক নয়।

—আমি অবস্থার গুরুত্ব বুঝেই ভরসা পাইনি। চুপচাপ থাকাই ঠিক করলাম।

—বাদ দিন মশাই। অনেকে অনেক রকম বলবেই। কেউ বলে, আপনি ঠিক করেছেন। কেউ বলে, আমরা মজুর নই যে ধর্মঘট করবো। কেউ বলে, আপনি আন্দোলনের পেছন থেকে ছুরি মেরেছেন।

—অমিয়বাবু আমার সম্পর্কে কী বললেন ?

রাখালবাবু একটু বিব্রত বোধ করেন। আমি হাঁ হাঁ করে উঠেছি,

—আপনি সঙ্কোচ করবেন না। আমার শোনা দরকার। আমি শীঘ্রই দেখা করবো। গোটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুলে বলা দরকার। তিনি নিজেও বেশী হৈ চৈ করতে বারণ করেছিলেন। আমাকে ভুল বোঝবার কোনো স্কোপ্ নেই। অমিয় পালিত আমার সম্পর্কে কী ভাবছেন আমার জানা উচিত। অমিয়বাবু আপনাকে অন্তত কিছু বলেছেন। অন্যের কথা আমি অংশত বিশ্বাস করি না।

রাখালবাবু ইতস্তত করে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর এক টুকরো হেসে বললেন,

—আপনার সম্পর্কে কিছু বলেন নি।

—সুবল দত্তকে এক হাত নিলেন ?

—তাও নয়। বড়বাবু বা সুবল দত্তের বিরুদ্ধে অমিয়দার কোনো অভিযোগ নেই। বললেন, এদের আমি বুঝতে পারি রাখাল, এরা ডার্টি। সমাজের সর্বস্তরে এরা থাকে। সর্বত্রই এদের এই ভূমিকা। কিন্তু তোমরা করলে কী! চুপ করে হজম করলে ? একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত হলো না!

—আমার কথা উঠলো না ?

—আপনি ঢাকের কাঠি, আপনার কথা আমিই তুলেছি।

—কোনো মন্তব্য করলেন না ?

—যথেষ্ট পেটে পড়েছিল। অনেক কথাই বলছিলেন। আপনার সম্পর্কে অভিযোগ অবশ্য করেন নি।

—আপনি আমার কথা বলেছেন ?

—অরুণবাবু, অন্যেরা কী লাগিয়েছে আমি জানি না, কিন্তু আমি গোপন করি নি। আপনি বড়বাবুর ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'অমিয় পালিতের সঙ্গে কাজ করতে না পারলে আমরা কাজে ইস্তাফা দেব! আমি অন্তত বেরিয়ে যাব।' —এ কথা আমি বললাম।

—ভেরী গুড! তাতে কী বললেন ?

—একটু হাসলেন।

—হাসলেন!

—তারপর অমিয়দা হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে বুক শেলভ্-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু খুঁজতে হলো। তারপর একটা বই টেনে আবার বিছানায় এসে বসলেন।

—বই ?

—রবীন্দ্রনাথের।

—তার মানে ?

—অনেকক্ষণ ধরেই চালাচ্ছিলেন। পা টলছিলো। পাতা উল্টে

খুঁজে পেলেন। তারপর অরুণবাবু সে একটা সিন! অমিয়দা আপনার কথাগুলো চীৎকার করে অভিনয় করলেন, 'অমিয় পালিতের সঙ্গে কাজ করতে না পারলে আমরা কাজে ইস্তাফা দেব। আমি অন্তত চলে যাব।' চমৎকার!

আমি উত্তেজিত,

—তারপর! তারপর!!

—অমিয়দা বইটার একটা জায়গা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, রাখাল আমার মত চেঁচিয়ে পড়বে। দেখবে কী আশ্চর্য মিল। অনেক কিছুই পড়ি কিন্তু বুড়োর লেখা আমাকে আজও পাগল করে দেয়। বুঝলেন অরুণবাবু, আমিও কয়েক পেগ চড়িয়েছিলাম। অমিয়দা উত্তেজিত। আমিও ঠিক হুঁশে নেই। তবে উদাত্ত কণ্ঠে পড়ে চললাম,

'বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন।....বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন। যদি লোক ধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করতে আছে। জান তোমরা? যে দিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা শ্রবণ করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন।

—রাখালবাবু!

পর মুহূর্তেই গ্লাসের ঝনঝনানিতে সম্বিত ফিরে আসে। পর্দা সরিয়ে উর্দি পরা বেয়ারা এসে কেবিনে ঢোকে। আমি মত্ত নই, কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রকিতিস্থ। তছনছ হচ্ছিলাম।

রাখালবাবু মৃদু হেসে বলেন,

—'হৈমন্তী'-কে আপনি মারেননি, কিন্তু দামী পেগটি এক আছাড়ে দু' টুকরো করে ফেলেছেন।

অমিয় পালিত চলে গেলেন।

সুবিমল রায় হলেন 'সমন্বয়'-এর সম্পাদক।

দেখা করেছি। ব্যবহারে খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি অমিয় পালিতের।

দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত জীবনে বড় রকমের একটা নড়চড়, তাছাড়া আচমকা চার অঙ্কের মাস মাইনে খসে যাবার অসুবিধেতে একটু বিব্রত। ভবিষ্যৎ ঠিক করতে পারেননি।

সুবিমল রায়কে আমি যতটা নিরেট মনে ক'রেছিলাম কাছে এসে দেখলাম ততটা নির্বোধ তিনি নন। কথা যখন বলেন, তখন তাঁর জ্ঞানের গভীরতা নিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়। আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি। সাধারণত চুপ ক'রে থাকেন। মুখ যখন খোলেন, তখন দেখতাম বেশ বলেন। খবরও রাখেন বহু।

নাম শুনলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায় এমন মানুষও দেখতাম সুবিমল রায়কে খাতির ক'রে কথা বলেন। ভাবতাম দৈনিক কাগজটা আছে—ছাঁট কাগজে সাপ্তাহিক—তাই হয়তো সবাই খাতির রাখেন। আগাগোড়াই ভদ্রলোককে আমি খাটো করেছি। তাঁর স্বল্প-পরিধির বিছে বুদ্ধি নিয়ে খামাখা ছোট করেছি।

আমার মনে হয় এই মানুষটির সবচেয়ে বড় ক্ষমতা ইনি মানুষ চেনেন। কাকে দিয়ে কী কাজ হবে, কোথায় কী ভাবে চলতে হবে, সেটি ইনি সবচেয়ে ভাল বোঝেন।

কাগজের অফিসে মাইনে নিতাম কিন্তু সুবিমল রায়ের অন্য কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকতে হতো সারাদিন। সুবল দত্ত একদিন রসিকতা ক'রে বললেন: কাজের মানুষটিকে আপনি টেনে নিচ্ছেন—আমার সুবিধে-অসুবিধে কই আর আপনি দেখছেন!

কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করেন সুবিমল রায়ঃ অকাজের মানুষের তালিকা একটা আমাকে দেবেন তো।

দিনে দিনে আমাকে সরিয়ে নিতে সুরু করলেন সুবিমল রায়। কখনও একা, সঙ্গে কখনও কখনও, আমাকে বোম্বে-দিল্লীও করতে হয়।

মানুষটির ক্ষমতা অসীম। হাটে বাজারে চলতে ফিরতে সুবিমল রায় সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়। পঁচাত্তর টাকায় নাকি ব্যবসা শুরু, দৈনিক পঁচাত্তর টাকার ডাকটিকিট আজ তাঁর নিত্য লাগে। ঈর্ষাকাতর বহু মানুষের ইতর রসিকতায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু প্রামাণ্য নজীর যেটুকু পেয়েছি তাতে আমি হতবাক হয়েছি। অবিশ্বাস্য গল্পের মত। পরে ভেবেছি পাঠকের বিশ্বাস কাড়বার জন্যে সচেতন লেখক গল্প ভেবেচিন্তে সাজান। কিন্তু রক্তমাংসের চরিত্র পাঠককে গ্রাহ্য করবে কেন। মিল বা সঙ্গতি রক্ষার দায়িত্ব থেকে তিনি মুক্ত।

ভ্রাম্যমান এক পেশাদারী অপেরা পার্টির নায়কের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে কুমিল্লা ছেড়ে সুবিমল রায় কলকাতা আসেন সে বহুদিন আগে। নায়কের সুপারিশে অপেরা পার্টির অনুষ্ঠানে আড়বাঁশি বাজানোতে তাঁর প্রমোশন হয়। মাল-পত্তর ওঠানো-নামানো ও অভিনয়ের পর টিনেব বড় বড় বাক্সে জমকালো পোষাক মিলিয়ে ভাঁজ করে তোলবার কাজেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। মাইনে পাঁচ টাকা। থাকা খাওয়ার ভার নিয়েছিলেন অপেরাওয়ালা।

সুবিমল রায় সম্পর্কে এই পূর্ব ভাষণের প্রয়োজন আছে। তাঁর বিস্তৃত অস্পষ্ট জীবন-ইতিহাস থেকে আমি আজ শুধু প্রামাণ্য সত্যটুকুর আশ্চর্যরকম বাঁকগুলো তুলে ধরবো। চড়াই-উৎরাই-এর মাথাগুলো ছুঁয়ে যাব।

আড়বাঁশির মেঠো সুর মন্দ নয়, কিন্তু যৌবনের তাজা তাজা বিক্ষিপ্ত অসুরের বিক্ষেপ বড় সাংঘাতিক। চিৎপুরের এক প্রায়ান্ধকার কক্ষে

মেঠো সুর ধরে সুবিমল রায় চিনে চিনে এলেন। মেয়েটির নাম ছিল পুতুলকণা। কলকাতায় সুবিমল রায়ের প্রথম সেদিন শুরু হলো পুতুল খেলা।

পুতুল বললো—তোর কাছে পয়সা নিতে পারবো নি। আমার কাছেই থাকবি। তোর বাঁশি শুনে আমার মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। অন্য মেয়েমানুষ ধরতে পারবিনে কিন্তু।

সকালে উঠে সুবিমল রায় বাজার করতেন। কুমড়োর ফালি, কৎবেল, ছোট চিংড়ী। পুতুলকণার টিয়াপাখী স্নান করিয়ে আনতেন কল থেকে। সন্ধ্যের সময় দোকান খুলে পুতুল বলতো হেসে: বেড়িয়ে আয় গে যা। কিছু রোজগার পাতি ক'রে নিই। তোকে দেখলে আমার মিনষেগুলো পালাবে।

পুতুলকে বুকে টেনে নিয়ে গভীর রাত্রে সুবিমল রায় বলেন, মথুরবাবু বলেছেন, আমাকে বড় পার্ট দেবেন। ইংরেজ সাহেবের চরিত্র। চ আমরা পালিয়ে যাই। বাড়িওয়ালি বুঝতে পারবে না। অন্য কোথাও আমরা থাকবো, চ।

পুতুল বলে: খাওয়াবি কী। ঐ জানোয়ারগুলো কী আমার ভাল লাগে রে। নাথি মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে খাট থেকে। তবে অশ্বিনী কুণ্ডু যদি মাসকাবারী রাখেন, একটা মিনষেও আর ঘরে ঢুকতে দেব না। অশ্বিনী কুণ্ডুর অনেক টাকা জানিস—পাতিপুকুরে পাইকারী মাছের কারবার। গদি থেকে যেদিন আসে পকেটে গাদা গাদা নোট। এই দেখছিস হার, হাতের এই কঙ্কণ—সব তেনাতেই গইড়ে দেছেন। থ্যাটার তো তিনিই আমাকে প্রথম দেখান। বজ্জাতি একটু বেশী। মাঝরাতে বমি পরিষ্কার কর। মদ খেয়ে বেহুস। কিন্তু বল্লে বিশ্বাস করবি নে, টাকা যেন খোলাম কুচি।

সুবিমল রায় বলেন: পুতুল আমাকে তুই খুব ভালবাসিস না রে। তুই বড় মিষ্টি।

পুতুল সুবিমল রায়ের ঠোঁট দুটো নাড়া দিয়ে ছড়া কাটে:

চিনি মিষ্টি, গুড় মিষ্টি আরও মিষ্টি মধু।
তার চেয়ে আরও মিষ্টি তোর মুখের মধু।।

অলস বিশ্রম্ভালাপ-এ বাধা পড়ে। বাইরে অনেকগুলো জুতোর আওয়াজ। পুতুল ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপচাপ থাকবার নির্দেশ দেয়। ফিস ফিস করে বলে: আবগারী পুলিশ—শেতলদের খোঁজে এসেছে। মদ চোলাই হয় এখানে। আফিম আর গাঁজা।

আস্তে আস্তে জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে যায়। পুতুলের নরম বুকটা দুহাতে নিয়ে সুবিমল রায় বিছানার মধ্যে ভেঙে পড়ে।

হঠাৎ সমস্ত নিরবতা ভেঙে পর পর দুটো গুলির আওয়াজ হলো। তারপর প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। হুইসিল, আর বুটের ত্রস্ত আনাগোনা। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক লাথিতে কপাটের পাল্লা বোধহয় খুলে এলো।

অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠ—কেউ পালাতে চেষ্টা করবেন না। কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

অর্ধউলঙ্গ সুবিমল রায় হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। পুলিশ ইনস্পেক্টরের পা জড়িয়ে ধরে বলেন: আর কোন দিন আসবো না, আমি কিছু জানি নে। আমাকে আপনি ছেড়ে দিন।

পিস্তল উঁচিয়ে অন্য পুলিশ অফিসার বললেন: কুকুরের মত গুলি করে মারবো। এক পা নড়বেন না। দেখছেন না কী বয়েস, সারা রাত ধরে এই রকম মাগী নিয়ে শোবার টাকা ইনি পাবেন কোথায়। কত টাকা আছে আপনার সঙ্গে? কী—দু' আনা....চোখ দেখছেন, চোখ দেখেছেন—।

হাউমাউ ক'রে কান্নায় ভেঙে পড়েন সুবিমল রায়।

—দু' আনা পয়সা নিয়ে সারা রাত ফুর্তি করতে এসেছিলেন? এসব আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। কী করছিলেন কী? কী নাম? সুবিমল রায়....আর কটা নাম আছে বলুন। আর সব দলের কোথায় গেল?

মেঠো সুর ধরে সুবিমল রায় চিনে চিনে এলেন। মেয়েটির নাম ছিল পুতুলকণা। কলকাতায় সুবিমল রায়ের প্রথম সেদিন শুরু হলো পুতুল খেলা।

পুতুল বললো—তোর কাছে পয়সা নিতে পারবো নি। আমার কাছেই থাকবি। তোর বাঁশি শুনে আমার মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। অন্য মেয়েমানুষ ধরতে পারবিনে কিন্তু।

সকালে উঠে সুবিমল রায় বাজার করতেন। কুমড়োর ফালি, কৎবেল, ছোট চিংড়ী। পুতুলকণার টিয়াপাখী স্নান করিয়ে আনতেন কল থেকে। সন্ধ্যের সময় দোকান খুলে পুতুল বলতো হেসে: বেড়িয়ে আয় গে যা। কিছু রোজগার পাতি ক'রে নিই। তোকে দেখলে আমার মিনষেগুলো পালাবে।

পুতুলকে বুকে টেনে নিয়ে গভীর রাত্রে সুবিমল রায় বলেন, মথুরবাবু বলেছেন, আমাকে বড় পার্ট দেবেন। ইংরেজ সাহেবের চরিত্র। চ আমরা পালিয়ে যাই। বাড়িওয়ালি বুঝতে পারবে না। অন্য কোথাও আমরা থাকবো, চ।

পুতুল বলে: খাওয়াবি কী। ঐ জানোয়ারগুলো কী আমার ভাল লাগে রে। নাথি মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে খাট থেকে। তবে অশ্বিনী কুণ্ডু যদি মাসকাবারী রাখেন, একটা মিনষেও আর ঘরে ঢুকতে দেব না। অশ্বিনী কুণ্ডুর অনেক টাকা জানিস—পাতিপুকুরে পাইকারী মাছের কারবার। গদি থেকে যেদিন আসে পকেটে গাদা গাদা নোট। এই দেখছিস হার, হাতের এই কঙ্কণ—সব তেনাতেই গইড়ে দেছেন। থ্যাটার তো তিনিই আমাকে প্রথম দেখান। বজ্জাতি একটু বেশী। মাঝরাতে বমি পরিষ্কার কর। মদ খেয়ে বেহুস। কিন্তু বল্লে বিশ্বাস করবি নে, টাকা যেন খোলাম কুচি।

সুবিমল রায় বলেন: পুতুল আমাকে তুই খুব ভালবাসিস না রে। তুই বড় মিষ্টি।

পুতুল সুবিমল রায়ের ঠোঁট দুটো নাড়া দিয়ে ছড়া কাটে:

চিনি মিষ্টি, গুড় মিষ্টি আরও মিষ্টি বধূ।
তার চেয়ে আরও মিষ্টি তোর মুখের মধু।।

অলস বিশ্রম্ভালাপ-এ বাধা পড়ে। বাইরে অনেকগুলো জুতোর আওয়াজ। পুতুল ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপচাপ থাকবার নির্দেশ দেয়। ফিস ফিস করে বলে: আবগারী পুলিশ—শেতলদের খোঁজে এসেছে। মদ চোলাই হয় এখানে। আফিম আর গাঁজা।

আস্তে আস্তে জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে যায়। পুতুলের নরম বুকটা দুহাতে নিয়ে সুবিমল রায় বিছানার মধ্যে ভেঙে পড়ে।

হঠাৎ সমস্ত নিরবতা ভেঙে পর পর দুটো গুলির আওয়াজ হলো। তারপর প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। হুইসিল, আর বুটের ত্রস্ত আনাগোনা। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক লাথিতে কপাটের পাল্লা বোধহয় খুলে এলো।

অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠ—কেউ পালাতে চেষ্টা করবেন না। কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

অর্ধউলঙ্গ সুবিমল রায় হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। পুলিশ ইনস্পেক্টরের পা জড়িয়ে ধরে বলেন: আর কোন দিন আসবো না, আমি কিছু জানি নে। আমাকে আপনি ছেড়ে দিন।

পিস্তল উঁচিয়ে অন্য পুলিশ অফিসার বললেন: কুকুরের মত গুলি করে মারবো। এক পা নড়বেন না। দেখছেন না কী বয়েস, সারা রাত ধরে এই রকম মাগী নিয়ে শোবার টাকা ইনি পাবেন কোথায়! কত টাকা আছে আপনার সঙ্গে? কী—দু' আনা....চোখ দেখছেন, চোখ দেখেছেন—।

হাউমাউ ক'রে কান্নায় ভেঙে পড়েন সুবিমল রায়।

—দু' আনা পয়সা নিয়ে সারা রাত ফুর্তি করতে এসেছিলেন? এসব আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। কী করছিলেন কী? কী নাম? সুবিমল রায়....আর কটা নাম আছে বলুন। আর সব দলের কোথায় গেল?

কেসটার সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও জড়াতে পারলাম না। দ্বীপান্তর কেউ ঠেকাতে পারতো না।

কাঠগড়া থেকে অন্ধকার ঘরে ফিরে গেলেন সুবিমল রায়। সেলের মধ্যে ঘুম আসে না রাত্রে। বিক্ষিপ্ত নানা চিন্তা তছনছ ক'রে দেয়। নানা কথা ভিড় ক'রে আসে। কুমিল্লার কথা, দু'কূল ছাপিয়ে পদ্মার ঢেউ-এর দৃশ্য চোখের উপর ভেসে ওঠে। পূজোর সময় অপেরাওয়ালা মথুরবাবু সাহেবের বড় চরিত্রে অভিনয় করতে দেবেন বলেছিলেন। সেই কথা বার বার মনে হতো। বিরজা চান্স পাবে, না অন্য কেউ কাজটা পাবে কে জানে।

সুবিমল রায়ের পরের সংবাদ আর পাওয়া যায়নি। অন্ধকার ঘরের সে নিষিদ্ধ সংবাদ জানা দুষ্কর। দীর্ঘদিন কী নিয়মে ভেবেছেন, কী সুর শুনেছেন সে কথা বাইরের জগতের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুবিমল রায়ের সে অদৃশ্য পুতুলখেলা অলক্ষ্যেই রয়ে যায়।

পুরো দশ বছরের মেয়াদ ছিল কিন্তু তার ক'মাস আগেই মুক্তি পেলেন সুবিমল রায়। একে নববর্ষ, তারপর রাজার ছিল জন্মদিন। অনেক রাজবন্দীর সঙ্গে সুবিমল রায় ছাড়া পেলেন।

আশ্চর্য, চেহারা যেন আরও ভাল হয়েছে। সুঠাম মেদবিবর্জিত গঠন। এক গাল দাড়ি। ময়লা পোশাক। জ্বল জ্বলে চোখের দৃষ্টি।

খবর পেয়ে পুতুলকণা এসেছিল কিনা জানি না, তবে লক্ষ্য করা গেল সুবিমল রায় কাকে যেন খুঁজছেন।

পুতুলই এলো—তবে পুতুলকণা নয়। সুন্দর ফুটেফুটে একটি মেয়ে সুবিমল রায়ের গলায় মালা পরিয়ে দিল। গৌরব-টিকা কপালে এঁকে দিল। মুক্ত রাজবন্দীদের নিয়ে উত্তেজনা। বহু মানুষের কণ্ঠে : বন্দে মাতরম্। বন্দে মাতরম্॥

কেউ কেউ কিছু বললেন। সুবিমল রায়ের যাত্রার ঢংয়ের বাচনভঙ্গী নিতান্তই আকর্ষণীয়। হাত জোড় ক'রে বললেন : আমি মাটির কান্না শুনতে পাচ্ছি। বিপ্লব আসন্ন। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে,

স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু নিঃশেষ ক'রে দেব। 'Swaraj shall be for the masses and must be won, by the masses.'

এ যে দেশবন্ধুর কথা।

সুবিমল রায়ের আশ্চর্য পুতুলখেলা।

শুধু পুলিশ নয় সুবিমল রায়কে সবাই ভুল করলো।

বিপ্লবীদের একজন বললেন : আশুদার ডান হাত ছিলেন আপনি, দেখলে কিন্তু মনেই হয় না। দু'হাতে রিভলভার চালাতে চালাতে পুলিশ ব্যারিকেট ভেঙে পালিয়ে যান। রাজসাক্ষী ছিল ঘটক। শেষ পর্যন্ত ঘটকের বিশ্বাসঘাতকতায় আশুদার ফাঁসি হয়ে গেল। আপনার নাম, আপনার কোনো কিছুই আশুদা আমাদের বলতেন না। দিবাকর দত্ত যে আপনার ছদ্মনাম আমরা কেউ জানতামই না।

উত্তেজক আরকের মতন বৃটিশ বিরোধী কিছু তরুণ চিত্ত ছিল উগ্র। স্থির বুদ্ধি ও পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার অভাব। সেই তাজা তাজা নিষ্পাপ বিক্ষুব্ধ তরুণ সুবিমল রায়কে লুফে নিল।

একটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগে চিৎপুরের পতিতালয়ে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আত্মগোপনকারী আশুদার দক্ষিণ হস্ত প্রকৃত দিবাকর দত্তের রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ দেহটির কোনো হদিশ হলো না। প্রকৃত দিবাকর দত্তের হলো কী সে রহস্য অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

সুবিমল রায়ের বিদ্যে ছিল চতুর্থ মানের। অভিজ্ঞতা নিতান্তই আঁটো মাপের। কিন্তু বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। অপেরা পার্টির রঙচঙ-মাখা নায়কের অল্প লোকের সামনে সামান্য সময়ের ওস্তাদীর চেয়ে, বহু লোকের সামনে হাত-পা নাড়ার আস্ফালন অনেক বেশী লোভনীয়। কষ্ট আছে, দুঃখ আছে, কিন্তু এ ধরনের জীবন বুদ্ধি দিয়ে গতি দিলে অকল্পনীয় ভবিষ্যৎকে কব্জা করা সম্ভব—সুবিমল রায় বুঝতে পারেন।

আসলে সুবিমল রায়ের প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল অসাধারণ। বন্দী জীবনে মহান চরিত্রের সান্নিধ্যেও এসেছেন। চতুর্থমানের বিস্তে নিয়ে প্রথমে অসুবিধে হয়েছে। চুপচাপ থাকতেন। শুনতেন। গল্পের মত এক একজন বন্দীর জীবন-ইতিহাসে মুগ্ধ হয়েছেন। দশজন সাধারণ মানুষের মাঝে থাকলে নিশ্চয়ই সুবিমল রায়ের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়তো। কিন্তু যাঁদের সঙ্গ পেয়েছেন—তাঁরা ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। না চেনবার চেষ্টা করেই সবাই ধবে নিয়েছিলেন সুবিমল রায় একজন বিপ্লবী। তাঁদের মতই স্বাধীনতা সংগ্রামের পবিত্র সৈনিক।

দশ বছর অনেক সময়। পুতুলকণার ঘর থেকে যে সুবিমল রায়কে পুলিশ রিভালভরের মুখে আটকে রেখে বাব ক'রে নিয়ে যায়, মুক্তিপ্রাপ্ত সুবিমল রায়ের সঙ্গে সে সুবিমল রায়ের কোনো মিল ছিল না। মথুববাবুর যাত্রা পার্টিব সুবিমল রায় আজ মৃত। পলিটিক্যাল অপেরার গ্রীনরুমে তাঁর নবজন্ম হয়েছে। নাট্যমঞ্চে যথাসময়ে দর্শকদের সামনে তিনি দেখা দিলেন।

জনাকয়েক মনের মানুষ নিয়ে এক দিশী কাববার খুলে বসলেন সুবিমল রায়। খদ্দর, আমের আচার আর পাঁপড়। তরল আলতা, সিঁদুর, ধুপকাঠি আর মটকার চাদর। নাম দিলেন—'সমবায় ভাণ্ডার'। বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দরিদ্র বাজবন্দীদের পরিবার প্রতিপালনে ব্যয় হবে।

জেল থেকে যখন ছাড়া পান, বাংলা দেশের রাজনীতিরও তখন পরিবর্তিত পটভূমি। ইংরেজ 'সাইমন কমিশন' ঘোষণা করেছে। কমিশন বয়কট করেছে কংগ্রেস। লর্ড আরউইন বিলেত থেকে ঘুরে এসে ঘোষণা করেছেন, ভারতে বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস। গান্ধী-আরউইন বৈঠক। লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ রেজোলিউশন পাস হ'লো। লবণ সত্যাগ্রহ সুরু হতে আর বাকি নেই। রাজনৈতিক উত্তাপে সুবিমল রায়ের 'সমবায় ভাণ্ডার'-এর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে।

তবে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিই 'সমবায় ভাণ্ডার'-এর শ্রীবৃদ্ধির নাকি সবচেয়ে বড় কারণ নয়। শোনা যায় সুবিমল রায় এক শ্বেতাঙ্গ দম্পতীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেন। তিনি ছিলেন পাকা ইংরেজ। বিলিতি এক রং-এর কোম্পানীর ওয়ার্কস্ ম্যানেজার। সুবিমল রায়ের সামান্য উপকারে লেগে তাঁরা ধন্য হতে চান। চতুর সুবিমল রায় উপযুক্ত বরই চেয়েছিলেন। কাজ চালানোর মত ইংরেজীতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আগে 'লিভার'-কে বলতেন 'নিভার', 'সিগ্রিগেশন ইয়ার্ড' এখন আব তাঁর ঠোঁটে দাঁড়ায় না 'ছিকলিগেশেন ওয়ার্ড'।

সুবিমল রায়ের প্রার্থনা সাহেবকে বিস্মিত করে। আশ্চর্য বিনয়। অত্যাশ্চর্য নিরাসক্তি। বাংলা দেশেব মেয়েদের সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় করবারই শুধু বাসনা। সুবিমল রায় বলেন,

—সাহেব, আমাদের দেশের মেয়েদের চুল উঠে যায়। সিঁদুরে টাক বেরিয়ে পড়ে। এব একটা বিহিত হয় না সাহেব ?

কথাটা মনে ধরে। সাহেব হেসে বলেছেন,

—এক প্যাকেট তোমাব সিঁদুর নিয়ে আমার টার্ফ ক্লাবে তুমি দেখা ক'রবে। দেখি তোমাব সিঁদুরে কী আছে।

সাহেব কথা রেখেছেন। কিছুদিন পব সুবিমল রায় হাতে পেয়েছেন এক ফর্মূলা। সাহেব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এই সিঁদুরে চুল উঠবে না। টাক পড়বার আশঙ্কা নেই। একজন কেমিস্ট তোমাকে দিচ্ছি। তুমি কাজ করে যাও।

এই সিঁদুর থেকেই সু বিমল রায়ের বরাত ফেবে। তবে সব কিছুই 'সমবায় ভাণ্ডাব'-এর স্বার্থে। ফর্মূলাটি শুধু গোপন রাখলেন নিজের কাছে।

একটা ছোট প্রেস কিনলেন সুবিমল রায়। 'তরুণ বাঙালী' প্রকাশিত হলো এখান থেকে। কাগজে আগুন ছুটতে লাগলো। সিঁদুরের আলোর মত ঝলকানি। সুবিমল রায় জনপ্রিয়। অল্পভাষী।

কর্পোরেশনের ধাঙড়ের কাঁধে চড়ে রাস্তার জঞ্জাল নিয়ে কমিশনারের ঘরেও তাঁর আনাগোনা। মোটা ভাত, মোটা খদ্দর। নিখিল ভারতীয় শ্রেষ্ঠ নেতাদের তাকিয়া এগিয়ে দেওয়ায় তাঁর ভুল হতো না কোনদিন।

সাধারণত কোনো দিশী জিনিসের ব্যবহারে তার প্রকৃত আকৃতি যেমন অল্পদিনেই প্রকাশ হয়ে পড়ে—তেমনি সমিতির দিশী মানুষগুলোর পরিচ্ছন্ন বহিরাবরণের তলায় অপরিষ্কার চরিত্রগুলো সক্রিয় হতে দেখা গেল। সুবিমল রায় বড় বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েছেন—এটা অনেকেরই ভাল লাগলো না। সামান্য চার হাজার টাকার এক ভাউচার নিয়ে প্রথম একজন সুবিমল রায়কে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করলেন।

নিষ্পাপ শিশুর মত সুবিমল রায় সকলের দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন,

আপনারা আমাকে সেক্রেটারী করেছেন, কমিটির তেত্রিশ জন মানুষের সততা ও বিশ্বাসের দাম আশা করি মাত্র চার হাজার টাকা নয়। আমি যতদিন আছি, ততদিন আমার নিয়মেই চলবে। মাননীয় সদস্য আমাকে অসম্মান করলেন, তাতে আমি দুঃখিত হলাম, কিন্তু সম্পাদক-এর অবমাননায় গোটা 'সমবায় সমিতি'কে অপমান করা হ'লো—এটি নিতান্তই মর্মান্তিক। সমিতির আগামী নির্বাচনে আমাকে সরিয়ে দিতে পারেন। আমিও তাই চাই। আমার একমাত্র অনুরোধ, সমিতিতে আজ স্বার্থান্বেষী লোভী মানুষ সক্রিয়—'সমবায় সমিতি'কে তাঁদের হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনাদের। 'সমবায় ভাণ্ডার'-এর আমি কতখানি—গোটা বাঙলা দেশ সে কথা জানে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার সন্দেহ হয় সমিতির মধ্যে পুলিশের স্পাই আমাদের ওপর নজর রাখছে। কিন্তু আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমি এখন সন্ত্রাসবাদী নই, কিন্তু আগুন আমি দেখেছি। নিজেও আমি জ্বলেছি। তাই ভয় পাইনি। 'সমবায় ভাণ্ডার'-এর স্বার্থই আমার কাছে নিজের মান-অপমানের

চেয়ে বেশী। দেশের সেবাই আমি জীবনের ব্রত বলে জানি। মহাত্মাজীর আদর্শ সামনে থাকায় মাননীয় সদস্যের অভিযোগে আমি ক্ষুব্ধ নই। ক্রোধ আমি জয় করেছি। বন্দেমাতরম!

বক্তৃতায় বড় একটা কাজ হলো না। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছিল। শুধু চার হাজার টাকার ভাউচার নয়, অনেক কিছুতেই গরমিল ছিল। পরাশর চক্রবর্তী বললেন,

—শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। আমি প্রমাণ করে দেব সুবিমলবাবু কী ভাবে ডান হাত বাঁ হাত চালাচ্ছেন। কমিটি থেকে তিনি আমাদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন। একচ্ছত্র নেতা হতে চান। ভূতের কাছে মামদোবাজী।

ভূতের শক্তি মামদো-র চেয়ে বেশী কিনা বলা মুশকিল কিন্তু নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে সর্ষের মধ্যে ভূতই যেন দেখলেন সুবিমল রায়। আশ্চর্য রকম শক্তি সংহত করেছেন পরাশর চক্রবর্তী। শুধু বাজীমাতটাই বাকি আছে। এমন কী নিতান্ত আপনার জনও মন্তব্য করেছেন—সেক্রেটারী মাঝে মাঝে বদল হওয়া মন্দ নয়। সকলেই টের পাক দায়িত্বটা কী। ঘাড়ে দায়িত্ব পড়লে বুঝলেন সুবিমলবাবু····।

কিছুই বুঝলেন না সুবিমল রায়। শুধু বুঝলেন দুর্দিন আসন্ন। পরাশর চক্রবর্তী এমন 'সংহিতা' রচনা করেছেন তাতে তাঁর পরাজয় নিশ্চিত। সে সংহিতায় ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হয়তো নেই কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অভিশপ্ত কল্মাষপাদ তাঁর সমস্ত ভোট উদরস্থ করতে উদ্যত। বশিষ্ঠের শত পুত্র ভক্ষণের চেয়েও সে মর্মান্তিক। নিখিল ভারতীয় নেতাদের মন্ত্রপূত জলেও শাপমুক্ত হবার আশা কম।

প্রলয়কাল আসন্ন। সুবিমল রায়ের স্থাবর, জঙ্গম সমস্তই যখন জলমগ্ন হবে, এমন সময় স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা যেন মৎস্যের ছদ্মবেশে জলমগ্ন পৃথিবীতে অদৃশ্য এক নৌকো চালিয়ে হিমালয়ের পর্বত শৃঙ্গে সুবিমল রায়কে পৌঁছে দিলেন। এই অত্যাশ্চর্য 'নৌবন্ধন'-এ দস্তুরমত তাজ্জব বনে যেতে হয়। সুবিমল রায়ের সলিল সমাধি হতে পারে

না। অনেক শ্লোক এখনও বাকি—তাঁর 'মনুসংহিতা' রচনা এখনও অসমাপ্ত।

নির্বাচনের দিন দশেক আগে বোম্বাই, গুজরাট ও কলকাতায় শ্রেষ্ঠ জননেতারা গ্রেপ্তার হলেন। মাদুরায় ধরা পড়লেন অবিসংবাদিত জননায়ক। সেই দিনই সুবিমল রায়কে বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়। লালবাজার থেকে পরোয়ানা নিয়ে স্বয়ং ইংরেজ অফিসার এসে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে গাড়িতে তোলবার সময় বললেন,

—You are still a friend and guide of the revolutioneries.

পুলিশ ভ্যানে ওঠার আগে পরাশর চক্রবর্তীকে আলিঙ্গন করে সুবিমল রায় বললেন,

—আপনারা বাইরে রইলেন। 'সমবায় ভাণ্ডার' আপনারা পরিচালনা করুন। আমি বৃহৎ পৃথিবীতে যে ভাবে জড়িয়ে পড়ছি, তাতে আমার ভয় হয় সমিতির কাজে সক্রিয় অংশ হয়তো আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না

তারপর ইংরেজ অফিসারের দিকে ফিরে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,

—Yes officer, you are right. I can not relinquish my relations with the revolutionary Bengal.

উপস্থিত সকলের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে আকাশের বুকে ঘুসি তুলে বলেন,

বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম।।

সেলুকস ঠিকই চিনেছিলেন—সত্যি, আশ্চর্য এই দেশ। আরও বিচিত্র এদেশের মানুষ। চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকলে 'মহাপুরুষ' আখ্যা যে দেশে পাওয়া যায়, একমাত্র 'অনশন'-এর দ্বারা সর্বসাধারণের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও স্থান পাওয়া যায়—সে দেশে শ্রেষ্ঠ জননায়কদের সঙ্গে ইংরেজকে দেখে নিতে নিতে সুবিমল রায় যখন কারাগারে চলে গেলেন, গোটা দৃশ্যপট অন্যরূপ গ্রহণ করলো। দ্বিধাগ্রস্ত

বিরোধী শুধু নয়, পরাশর চক্রবর্তীর অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিও অন্য সুরে কথা বললেন।

নির্বাচনের দিন একমাত্র সুবিমল রায় অনুপস্থিত। তাঁর প্রচারের দরকার হলো না। পাশ থেকে, পেছন থেকে মাথার চুল সামনে এনে টাক ঢাকবার চেষ্টা করেছেন পরাশর চক্রবর্তী। কিন্তু দিনের শেষে সমস্ত কিছুই প্রকাশ হয়ে পড়ে। ২৮—৪ ভোটে সুবিমল রায় নির্বাচিত হলেন। জেলে সংবাদ পাঠানো হলো। সুবিমল রায় হাত জোড় করে বললেন,

—পরাশরবাবু নির্বাচিত হলেই ভাল হতো। আমাকে আপনারা ছাড়বেন না দেখছি। কবে ছাড়া পাব জানি না, কাল আমাকে হিজলী পাঠিয়ে দিচ্ছে। সময় কাটছে বই পড়ে—জেলেই যা অবসর—পড়বার সময় বাইরে আর পাই কই!

বিপ্লবী বাংলার পটভূমি অশান্ত। ইংরেজের সদিচ্ছায় বিশ্বাসী ও সংগ্রাম-বিমুখ নিখিল ভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি বাংলাদেশের যুবশক্তি বিশ্বাস হাবাতে চলেছে। দেশব্যাপী সুরু হয় নতুন করে সন্ত্রাসবাদ। ঢাকা-কুমিল্লায় সাহেব খুন। মেদিনীপুরে পেডি, ডগলাস ও বার্জ মারা পড়লেন। ঢাকায় পুলিসের বড় সাহেব লোমান নিহত হন। তরুণবা চট্টগ্রামকে ইংরেজ মুক্ত করেছে। বীর বিপ্লবী সূর্য সেন, গণেশ ঘোষের নাম দাবানলেব মত শহবে ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। টেগার্ট আক্রান্ত হন কলকাতায়। সেনেট হলে লাট জ্যাক্‌সনের ওপব বীণা দাস গুলি চালান। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিনয়-বাদল আত্মহত্যা করে। দীনেশের ফাঁসী হয়। আবও বহু। আরও অনেক।

দেশব্যাপী পুলিশী সন্ত্রাস। নেতৃত্বের নির্লিপ্ততায় ইংরেজ শাসন আরও হিংস্র। ফাঁসী আর দ্বীপান্তর। গুলি আর অত্যাচার। সুবিমল রায়ের হু হু করা সিঁদুরের ব্যবসার সঙ্গে শুধু সে রক্ত স্রোতের তুলনা চলে।

বড় বড় রুই কাতলার সঙ্গে অস্থির ল্যাজের ঝাপটা মারতে মারতে সুবিমল রায় মুক্তি পেলেন একদিন। অনন্ত জলরাশিতে মাঝে মাঝে বিক্ষেপ তুলতেন, তারপর কোথায় যে মিলিয়ে যেতেন তার হদিশ সবারই অজ্ঞাত। কিন্তু 'সমবায় ভাণ্ডার'কে ভুললেন না।

ক্রেতার পছন্দসই কাঁকড়ার দিকে বিক্রেতার সাঁড়াশীটা যে নিয়মে ঝুড়িতে প্রবেশ করে, মুহূর্তে দেহটি ছিন্ন-ভিন্ন করা হয়, অনেকটা সেই নিয়মে সুবিমল রায় অদৃশ্য এক সাঁড়াশী-অভিযান চালিয়ে 'সমবায় ভাণ্ডার' থেকে পরাশর চক্রবর্তী গ্রুপ সমূলে উপড়ে ফেললেন।

এক নতুন নিয়ম সুরু করলেন সমিতিতে। শেয়ার বেচতে সুরু করলেন। দশটাকা ক'রে শেয়ার—এক শ'র বেশী শেয়ার কাউকে বেচা হবে না। বাইরের কাজ নিয়ে প্রেস থেকেও রোজগার হ'তে সুরু করলো। কিছু দিন পর বিপুল ভোটাধিক্যে করপোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন সুবিমল রায়।

খাটতে পারতেন অসম্ভব। নিয়মিত পড়াশোনাও করতেন। পলিটিক্যাল আবহাওয়ায় মানুষটির সিক্সথ্ সেন্স আশ্চর্য রকম কাজ করতো। অপেরা পার্টিতে মথুরবাবুর ট্রেনিং—বক্তৃতা দেবার নিজস্ব একটা ঢঙ রপ্ত করেছিলেন। তলায় তলায় নিজের নামে ব্যবসা সরিয়ে নেন। যুবশক্তিকে কব্জা করবার কায়দাও বেশ রপ্ত করেছিলেন। সবচেয়ে প্রখর দৃষ্টি ছিল নিখিল ভারতীয় নেতাদের খুঁটিনাটিতে। তাঁদের ঠেস দেবার তাকিয়া সম্পর্কে অসম্ভব সজাগ।

দীক্ষা নিয়েছিলেন সুবিমল রায়। মন্ত্র-তন্ত্র একান্তই গোপনীয়। বরাহনগরের এক বাড়িতে থাকতেন। দেশের জন্যে উৎসর্গ করা জীবনে অতি সাধারণ সুখ-শান্তি ও ভবিষ্যতের ছক মেনে চলতেন না ; মোটা ভাত, মোটা খদ্দর। নরম বিছানায় ঘুম হ'তো না।

ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন রাত্রে। কার ডাকে হঠাৎ ঘুম ছুটে যায়। চোখ খুলে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং প্রভু। গুরু কামদানন্দ।

স্বপ্ন, মায়া না বাস্তব! অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সুবিমল রায়।

কামদানন্দের পায়ের ওপর মাথা রেখে সানের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন সুবিমল রায়। বললেন—আজ আমার কী সৌভাগ্য! আমার কী সৌভাগ্য !!

সিল্কের গেরুয়া ও পাগড়ী। দীর্ঘদেহী স্বামী কামদানন্দকে দেখলে মাথা হেঁট হয়ে আসে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় সুবিমল রায় বলেন,

—প্রভু এত রাত্রে আমাকে মনে পড়লো। ডাকলেই আমি ছুটে যেতাম।

স্বামী কামদানন্দের চেহারা ও আকৃতিগত গঠন ছিল আশ্চর্যরকম বিদেশী-ঢঙয়ের। শালপ্রাংশু গৌরবর্ণ সুন্দর চেহারায় এতটুকু খুঁৎ নেই। মুখশ্রীটি যেন কোনো নিপুণ ভাস্করের হাতে তৈরী। চোখের গভীর দৃষ্টির তুলনা নেই।

প্রয়োজনেই এসেছিলেন স্বামীজী। গভীর রাত পর্যন্ত নানা পরামর্শ। স্বামীজী যেটুকু বলেন তাতেই সন্তুষ্ট হতে হয়। রহস্যদ্রষ্টা সুবিমল রায় সম্পূর্ণ সম্মোহিত।

আমি পারবো। আপনি আমার বল। আপনার অনুগত এত ভক্ত থাকতে আপনি এই অধমকে বেছে নিলেন! সত্যি আমি ভাগ্যবান। কাল রাত্রে আপনাকে আমি স্বপ্নে পেয়েছিলাম। সারারাত কেঁদেছি।

—কাল রাত্রেই তোমার কথা ভাবছিলাম।

—আমি ভাগ্যবান।

—এত জনের মধ্যে তোমাকেই আমি বেছে নিলাম।

—আপনি আমাকে চরণে স্থান দিয়েছেন।

—সে তোমার যোগ্যতা। তোমার মত মানুষই আমি খুঁজে বেড়াই। তোমার শক্তি আছে। দায়িত্ব বহন করতে পারবে।

সুবিমল রায় অভিভূত। আনন্দে অধীর। স্বামীজীর ঠোঁটে মধুর হাসি। মাথায় হাত রেখে বললেন,

এই দেবশিশুকে তুমি লালনপালন কর। সামনের রবিবার স্বয়ং দেবী দেবশিশুকে নিয়ে তোমার গৃহে আবির্ভূতা হবেন। তুমি তোমার ঘরে নতুন স্বর্গ রচনা কর।

—নিজের জীবন দিয়ে আমি সত্য রক্ষা করবো।

খুসীর হাসি স্বামীজীর ঠোঁটে ফুটে ওঠে,

তুমি প্রকৃত ভক্ত। ত্যাগ আর বিসর্জনের আনন্দ সবার জন্যে নয়। তোমার মধ্যে দেদীপ্যমান সত্যপুরুষ আত্মপ্রকাশ করছে। লোভ তুমি জয় করেছো। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, এতবড় কৌতূহল তুমি দমন করলে কী ভাবে! একবারও তো তুমি জানতে চাইলে না এ দেবশিশু কে? দেবী কোথা থেকে আবির্ভূতা হবেন। এ কথা তোমার সত্যিই কী জানতে ইচ্ছে করে না সুবিমল?

—আপনার চরণের কৃপায় আমি কৌতূহল দমন করতে শিখেছি। আদেশ বহন করাই আমার কর্তব্য বলে জানি। আপনার দীক্ষা ও রাজনৈতিক শিক্ষায় আমার চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। এ সবই আপনার। আপনারই মায়া।

স্বামীজীর ঠোঁটে শিশুর হাসি। সুবিমল রায়ের মাথায় হাত রেখে বলেন,

—Feel the presence of God everywhere. Have faith in His Grace. He is Mangalamaya.

স্বামীজী বিদায় নিলেন। সে রাত্রে আর ঘুম হলো না সুবিমল রায়ের। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। স্বামীজীর দেবশিশুর কথা, দেবীর আবির্ভাবের কথা ভাবতে ভাবতে রাত কাবার হয়ে যায়।

দেবী দোলাতে এলেন না। আগমন হলো না নৌকোতেও। দ্রুতগামী এক নতুন মোটর গাড়ি সন্ধ্যের সময় বাড়ির সামনে এসে থামলো।

সাক্ষাৎ যেন দেবী। তবু প্রণাম করতে পারলেন না সুবিমল রায়। তাঁর কাল্পনিক মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বারবার ভুল করলেন। মটোরের দরজা খুলে বোবা বনে যান।

অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। দৈবাৎ কখনও চোখে পড়ে। সুন্দর পোশাক। হাসিটুকুও অপূর্ব। পাতলা সিল্কের শাড়িতে জড়ানো নিটোল যৌবনশ্রী—সে নিতান্তই এক শোভা।

দেবশিশুকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলো এক নেপালী ললনা। সারথী স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে মাটিতে নেমে নমস্কার করে হাতে একটা খাম দিল। স্বামীজীর পত্র। দু-লাইনের লেখা,

—কাল আমি আলমোড়া রওনা হবো। ফিরবো ও-মাসের মাঝামাঝি। চিঠির সঙ্গে একটা চেক পাঠালাম। প্রয়োজনীয় খরচ-পত্র করো। তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছি, সে দায়িত্ব বহন করবার শক্তি তুমি অর্জন করেছো। তোমার জন্যে ভগবানের আশীর্বাদ আমি চেয়ে নিয়েছি। তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

—আয়া!

—মেমসাব!

—বেবি কো সামান কিধার রাখা? কুছ ছোড়না মাৎ।

নামাবলী গায়ে জড়িয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে এই দেবীর পূজো বসানো চলবে না, সুবিমল রায় বুঝতে পারেন। অপেরা পার্টির উর্বশীর সঙ্গেও কিছুমাত্র মিল নেই।

বিভ্রান্তির শেষ আছে। অল্পদিনেই গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে এলো। দেবীকে চিনতে দেরী হয়েছিল, তাই নৈবেদ্য সাজাতে ভুল হয়েছিল প্রথমটা।

চোখ থেকে আলগোছে সিগারেটের ছাই তুলে নিতে যে নিপুণতার প্রয়োজন, অনেকটা সেই নিয়মে বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ আহরণ করেন সুবিমল রায়।

দেবীর আগমন স্বর্গ থেকে নয়—তাঁর আবির্ভাব রাঁচী থেকে। দুর্ধর্ষ

দামোদর দত্ত-র কন্যা। খিদিরপুরের জাহাজের পেট থেকে দিবারাত্র মাল খালাসের ব্যবসা করেন দামোদর দত্ত। স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েছিলেন সপরিবারে।

সশরীরে ফিরে এলেন সবাই। শুধু ফিরলো না একজন। দীক্ষা তখনও শেষ হয় নি—শিক্ষা তখনও বাকি। চন্দন কাঠের পালং-এর পায়া ধরে স্বীয় আত্মজার করুণ মিনতি,

—ড্যাডি তুমি ফিরে যাও। আমি ক'দিন এখানে থেকে যেতে চাই।

বিশেষ আপত্তি ছিল না দামোদর দত্তের। তবে কী যেন ভাবছিলেন। স্ত্রী বললেন, স্বামীজীর কী আশ্চর্য দেবশক্তি। রঁাচীতে এসে বিশাখার কী চেঞ্জ হয়েছে দেখছো? ওর এস্‌থেটিক সেন্সগুলো কেমন খুলেছে। গরদের শাড়িতে কী চমৎকার মানিয়েছে।

বিশাখা রঁাচীতেই থেকে গেল।

স্বামীজীর কাছে জন্ম-জরা-মৃত্যু-ব্যাধির ব্যাখ্যায় বিশাখার মনে কতটা বিবেক-বৈরাগ্য জাগ্রত হয়েছিল বলা কঠিন, তবে সিদ্ধ সমাহিত অনন্ত বীর্য-বিক্রম-পরাক্রমশালী মহাপুরুষটি স্থির ভাবে পদ্মাসন-এ বসতে পারলেন না। 'মা পৃষ্ঠঃ কস্যচিৎ ব্রুয়াৎ'-তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে অনেক বেশী প্রগলভ হয়ে উঠলেন।

রিপুর উত্তেজনা তখন বিশাখার দেহে কি রকম প্রকট ছিল বলা শক্ত, তবে ইন্দ্রিয় সংযম প্রসঙ্গে স্বামীজী যে আলোচনা সুরু করলেন তাতে অতি বড় সংযমী মানুষের চিত্ত চাঞ্চল্য ঠেকানো সম্ভব নয়। আত্মতত্ত্বোপলব্ধির চেয়ে নিজের দেহতত্ত্বোপলব্ধি ঘটলো বিশাখার।

স্বামী কামদানন্দ তাঁর অঙ্গনে যেন অত্যাশ্চর্য এই অঙ্গনাকে আবিষ্কার করলেন। চিত্রার্পিত বিশাখাকে দেখে যেন বিচলিত হলেন স্বয়ং কামদানন্দ।

তবে রাত্রের পদ্মাসনে সমাধিস্থ স্বামীজীর চিত্তচাঞ্চল্য স্তিমিত হলো।

চিদানন্দ শক্তি দেখা দেয়। গোপনে অঙ্গন ত্যাগ করে গেলেন স্বামীজী। আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে চিত্রকূট পর্বত শিখরে চলে গেলেন।

তাতে শুধু ব্যয় হলো, পথই শুধু ঘোরা হলো। পর্বতমালার অনির্বচনীয় শোভায় এ প্রাণ চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি নেই। নির্ণিমেষ নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকেন। নিমীলিত নয়নে মহাশক্তির আরাধনায় নিজেকে অনন্ত অসীমের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

দেশে অভাব কী চিত্রসেনের! সঙ্গীত ও নৃত্য এ্যাকাডেমীর অভাব কী দেশে! স্বর্গলোকের ইন্দ্রের সভা একটাই। কিন্তু মর্ত্যলোকে আসর অনেক। টুকরো টুকরো চিত্রসেনের আনাগোনা আছে বিস্তর।

বিশ্বাসী এক চিত্রসেনের হাত ধরে বহু সন্ধান করে বিশাখা পাহাড়ে এলো একদিন। দামোদর দত্ত বলেন, কেস করবো।

বিশাখার এই পর্বত-অভিসার স্বামীজীকে স্তব্ধ করে দিল। মনে মনে ভাবলেন, 'খ্যাতি মিথ্যা, বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি—আজ মোর সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়।'

বিশাখা কিন্তু একবারও বললো না, 'কামনার প্রাতঃকালে যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায় তার বেশি আশা করিয়ো না" বরং গরদের শাড়ি একটানে সরিয়ে বলে, "যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ রাখো।'

স্বামীজী কিন্তু ফিরিয়েই দিলেন। চিত্রসেনকে বলে রাঁচীর আশ্রমে বিশাখার কুটীর নির্ণয় করে দিলেন।

উষ্ণ এক অঙ্গীকার নিয়ে বিশাখা ফিরে এলো আশ্রমে।

হিমালয় থেকে একদিন স্বামীজী ফিরে এলেন। যথেষ্ট সময় থাকতে গোপনে বিশাখাকে অন্য কোথাও চালান করে দেন। আর বিশেষ কিছু শোনা যায়নি। বিশাখার ফুল নিয়ে যাওয়া, আর ফল নিয়ে ফিরে আসা পরিচ্ছেদটুকু অস্পষ্ট।

তারপর দেবী স্বয়ং দেবশিশু নিয়ে আবির্ভূতা হলেন। পূজারী সুবিমল রায়ের বরানগরের বাড়িতে।

সুরলোকের কথা থাক—এখন নরলোকে আসা যাক। স্বর্গলোকের ভক্তি সাগরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে—এখন মর্ত্যলোকের রূপ সাগরের কথা বলা যাক।

অতিশয় ব্যস্ত মানুষ সুবিমল রায়। ক-দিকই বা তিনি দেখবেন। সমবায় ভাণ্ডার আছে, প্রেস আছে, দেশ আছে—তারপর এই নতুন দেবীর পুজো বসিয়ে হিমসিম খেয়ে যান।

তবু সামান্য রকম অসুবিধের মধ্যে পড়তে হলো না বিশাখার।

কথা হ'ত নিতান্তই কম। সুবিমল রায় দূর থেকে পুজোই দিতেন বেশী। দৈবাৎ কখনও বিশাখা দেবীর দিকে তাকিয়ে কেমন আনমনা হয়ে যেতেন। অন্ধকার আকাশের বুকে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত রূপ। বার বার দেখতে ইচ্ছে করে।

আলমোড়া থেকে স্বামীজী ফিবে এসেই সুবিমল রায়কে আশ্রমে ডেকে পাঠালেন। সমস্ত শুনলেন। নিমীলিত নেত্রেও শুনছিলেন কখনও কখনও। গেরুয়া রঙের সিল্কের খোলশের তলায় সোনার মত ঝলমলে গৌরকান্তি অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত।

কথা থামিয়ে স্বামীজী বললেন,

—সুবিমল তুমি আমার সঙ্গে এসো। কিছু গোপন আলোচনা আছে।

পায়ের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন সুবিমল রায়। বললেন,

—আপনার নির্দেশ নিতেই এসেছি।

আশ্রমটা নতুন। সিঁড়ি থেকে সুরু ক'রে ছাত পর্যন্ত মোজাইক্ করা।

চওড়া বারান্দাটা অতিক্রম ক'রে শ্বেত পাথরের বাঁধানো চত্বরে এলেন স্বামীজী। ঘরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

প্রথমটা সুবিমল রায়ের বুঝতে একটু অসুবিধে হয়। ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলেন—এটা শুধু ঘর নয়—নিতান্তই স্নান ঘর।

মাথা থেকে ফোয়ারার জল পড়তে সুরু করলো। চন্দনের সাবান। জলে আতরের গন্ধ। বিনা বাক্যব্যয়ে কিছুটা স্নান করলেন স্বামীজী। ফোয়ারার তলায় সমাধিস্থ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর বললেন,

—বরানগরে থাকা সম্ভব হবে না। চৌরঙ্গী বা পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে একটা ফ্ল্যাট দেখতে পার সুবিমল ?

—নিশ্চয়ই পারি।

—তুমি আমার জন্যে অনেক করলে।

—ক'রে ধন্য হলাম।

—বরানগরে আমার যাতায়াত করা বড্ড বেশী চোখে পড়বে। আর অগণিত শিষ্য, কে কোথা থেকে যে খবর পাবে—সে সম্ভব হবে না। তুমি ব্রহ্মচারী লোক—একা থাক। বরানগরের বাড়ি ছেড়ে দিযে তুমি বাড়ির খোঁজ কর এইদিকে। বিশাখারও তাই ইচ্ছে। পার্ক স্ট্রীটে ফ্ল্যাট কেন, চাইলে পুরো বাড়িই পাই। কিন্তু আমাকে তো নেপথ্যে থাকতে হচ্ছে। বিশাখা অবুঝ। রোজই আমার দর্শন কামনা করে।

অশালীন ইঙ্গিত করবার মানুষও দেশে কম নয়। পছন্দ মত একটা ফ্ল্যাট তুমি জোগাড় কর।

—আমি আজই অনুসন্ধানে লোক পাঠাচ্ছি।

—আমার সময় হাতে খুব কম। ভাবছি গোয়ালিয়র যাব। কোলকাতার বাইরে আমাকে অনেক দিন ঘুরতে হবে। তুমি ভেবো না তোমার কথা আমি ভুলে গেছি। আমি তোমাকে ভুলবো সুবিমল। তুমি দেশের জন্যে যে আত্মত্যাগ করেছো, কারা-লাঞ্ছনা ভোগ করেছো,—অত্যাচার সহ্য করেছো—তার তুমি মর্যাদা পাবে। আমি সর্বত্র তোমার নাম প্রচার ক'রে থাকি। আমি তোমাকে নেতা হিসেবে দেখতে চাই।

—আমি আপনার চরণে শুধু জায়গা চাই।

—আমি তোমাকে তুলবো। তোমাকে আমি তুলে ধরবো সুবিমল। আমার কাজটুকু তুমি ক'রে যাও। আমি অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলবো।

—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আপনার যেন সেবা করতে পারি। আপনার কাছে যে শক্তি পেয়েছি, কারা-লাঞ্ছনা আমাকে বিচলিত করে না। দেশের সেবা যেন আমি শেষ দিন পর্যন্ত ক'রে যেতে পারি। আপনার কাছে এইটুকু আমি ভিক্ষা চাই।

—তোমার সেই কো-অপারেটিভ-এর অবস্থা কী ?

—সে রকম ভাল চলছে না। বাংলার মুখে চুণকালি সবচেয়ে বেশী দিল বাঙালীরাই।

—শোন সুবিমল, আমি তোমার কথা অনেক ভেবেছি। আমার মত একজন মানুষ তোমার পেছনে আছে, তুমি ভয় পাও কেন ? ঐ সমবায় ভাণ্ডার বা সমিতির সভাপতি ক'রে আমাকে বসাও। কোলকাতায় আমার অন্তত হাজার কয়েক শিষ্য আছেন, তাঁদের একটা বিরাট অংশকে তুমি পাবে। শেয়ার ছাড়, হু-হু ক'রে বিক্রি হবে।

আবার ফোয়ারা খুলে দিলেন স্বামীজী। ঘাড় ফিরিয়ে দেওয়ালের বোতাম টিপলেন। পরক্ষণই দরজা খুলে দুটি মেয়ে প্রবেশ করলো। সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়ে। গরদের শাড়ি পরণে। হেঁট হ'য়ে মোজাইক করা মেঝেতে প্রণাম করলো।

ফিরেও দেখলেন না স্বামীজী। শুধু বললেন,

—মাখা।

নরম বাহুতে সাবানের ফেনায় ফেনায় স্বামীজীর সারা দেহ পরিষ্কার হতে থাকে। অবিশ্রান্ত ফোয়ারার সুগন্ধী জল পড়ছে ওপর থেকে। যেন অমরাবতীর ধারাজল আসছে আকাশ থেকে।

আরও কথা। প্রয়োজনীয় অনেক কথা। স্নান শেষ হলো স্বামীজীর।

সুবিমল রায়ের দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে বললেন,

—তুমি কিছু বলবে সুবিমল ?

—আমি ঐ ছাপাখানা সম্পর্কে আপনার নির্দেশ চাইছিলাম।

—সুবিমল তুমি আগে পার্ক স্ট্রীটে ঘর দেখো।. ছাপাখানার কথা আমার মনে আছে। তোমাকে যে কঠিন দায়িত্ব দিয়েছি সেটুকুর মূল্য অসীম। বিশাখা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তোমাকে অন্য কিছু ভাবতে আমি বারণ করি।

—কোথায় পাঠাবেন ?

—সবাই তোমার মত মানুষ নয় সুবিমল। আমাকে হেয় করবার একটা দল সর্ব সময়ই চেষ্টা করবে। বিশাখাকে শিশু পুত্র সহ আমি সুইট্জারল্যাণ্ড পাঠাবো ঠিক করেছি। কিন্তু কতগুলো বাধা আছে। কী অসম্ভব গোপনীয়তা আমাকে অবলম্বন করতে হয় নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পার। নইলে একটা ফ্ল্যাটের চিন্তা আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

শুয়ে পড়ে প্রণাম সেরে নিলেন সুবিমল রায়। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

—আমি খবর নিয়েই আসবো।

—খুব তাড়াতাড়ি।

আবার শুয়ে পড়া। স্বামী কামদানন্দের পা ছিল অনেক দূরে। মোজাইক ফ্লোর চেটে খেলেন সুবিমল রায়।

ঘরের বাইরে এসে একটু অবাকই হতে হলো। স্বামীজীর স্নানের জল পড়ছে একটা ফুটো দিয়ে। রবারের নল বসানো সেখানে।

স্নানের জল। সাবানের ফেনায় ধূসরবর্ণ নিয়েছে। সারি সারি বোতল বসানো। একজন ব্রহ্মচারী রবারের নলটা খালি বোতলে প্রবেশ করিয়ে একটির পর একটি বোতল ভরে চলেছে।

জানা ছিল, কিন্তু দেখা ছিল না আগে। স্বামীজীর শুধু চরণামৃত নয়, গোটা দেহামৃত এভাবে বোতলে বোতলে সংরক্ষিত হয়। চালান

হয় দেশের নানা দিকে। সারা ভারতে অসংখ্য শিষ্য। সন্তান-সন্তানদের সকলের কাছে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়, তাই এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। বহু দূর থেকে স্বামীজীর নিকট-সান্নিধ্য লাভ হয়। নৈকট্য সুখ লাভ করেন ভক্তেরা।

প্রাদেশিক দপ্তরে জরুরী মিটিং ছিল। ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট বক্তৃতা দিলেন সেদিন। সকালের দিকে স্বামীজীর নৈকট্য সুখ পেয়েছেন অনেকক্ষণ। তাই বোধহয় শক্তি কিছু বেশী ছিল। অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলেন সেদিন।

আজ আর ডেকে পাঠালেন না। বিশাখা দেবী নিজেই এলেন। পর্দার সামনে এসে বললেন,

—আসতে পারি?

কোথায় বসাবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না সুবিমল রায়।

—শুয়ে পড়েছেন মনে করে আর বিরক্ত করবো না ভাবছিলাম।

বিশাখা দেবী হেসে বললেন,—তাই আমিই বিরক্ত করতে এলাম। সারাদিন বাড়ি এলেন না। দেশের কাজ চিরদিনই থাকবে, কিন্তু নিজের শরীরটা বাঁচিয়ে চলবেন তো।

আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন সুবিমল রায়। তারপর স্বামীজীর সঙ্গে সকালের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির জন্যে কী পরিমাণ চেষ্টা সুরু করেছেন সে কথাও গোপন করলেন না।

—সত্যি, এখানে থাকা যায় না।

—আমি শীঘ্রই ব্যবস্থা করছি।

—আপনার এত কাজ।

—শীঘ্রই আমি ফ্ল্যাট দেখছি। কাজ তো থাকবেই।

—বাঙালী পাড়ায় আমি প্রথম থেকেই আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু তখন এমন অবস্থা হলো। উপায় ছিল না।

দেবশিশুকে নেপালী আয়া নিয়ে এলো। জেগে উঠে কান্নাকাটি করছিল।

সুবিমল রায় নরম শিশুটিকে কোলে নিয়ে সাফল্যের হাসি হাসেন।

বিশাখা বলে,—আপনাকে আজকাল বেশ চিনেছে।

নরম এতটুকু শিশু। আধবোজা চোখে মিষ্টি মিষ্টি হাসে। কিন্তু সুবিমল রায়ের নজরে হাসিটুকু চোখে পড়ে না। কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েন। স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণটি ঠোঁটে নিয়ে অবিশ্রান্ত তোতলামো করে যান ঠিকই ; কিন্তু নিজের বাহুকে দোলনার গড়ন দিয়ে, দোদুল্যমান শিশুর ওঠানামার সঙ্গে ঠোঁটের 'অ' 'অ' ধ্বনির সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেন না।

লাল লাল নরম গোলাপের পাপড়ির মত আঙুলে মোড়া এতটুকু মুঠি। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সুবিমল রায়। ধীরে অতি সাবধানে খুলতে চেষ্টা করেন—পারেন না। যেন মনে হয় শত শত টন ওজনের ইস্পাতের এক যন্ত্রদানব, সামান্য নরম অতি ক্ষুদ্র মুঠির মধ্যে লুকানো আছে। গোপন করা আছে শত সহস্র নানান ভাষার মরা টাইপ। লাইনো মেশিনের চাঞ্চল্য যেন সুপ্ত আছে শিশুর মুঠিতে। নির্ঘোষ যেন স্তব্ধ আছে রোটারী মেশিনের।

স্বামী কামদানন্দ ছিলেন দস্তুরমত যোদ্ধা। এক দিগ্‌বিজয়ী বীর। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ না ক'রে তিনি যদি অন্য কোনো কাজে ঢুকে পড়তেন, হয়তো সে বৃত্তিতে সবচেয়ে সেরা মানুষ হিসেবে নিজের আসন পাকা করে নিতে পারতেন।

কোটি কোটি অদৃশ্য দেবতার সঙ্গে তার কি রকম দহরম-মহরম বলা কঠিন। কিন্তু দৃশ্যমান জগতে তিনি যে নিয়মে হাঁটাচলা করেন তাতে তাঁর মহাশক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বৈকি। অতি সাধারণ শিষ্য ও দীক্ষিত ভক্তজনের কথা বাদ দিলাম। সমাজের যাঁরা মাথা, দৈনন্দিন রাজনীতিতে যাঁরা গন্তি

দেন, এমন বহু মানুষ স্বামী কামদানন্দের সামান্যক্ষণের সান্নিধ্যে ধন্য হন। ফাঁসীর হুকুম দিতে বিচলিত হন না এমন জজও ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত জোড় করে বসে থাকেন একটু দর্শনের আশায়। উন্মত্ত জনতার ওপর গুলি চালনার নির্দেশ দিয়ে কণ্ট্রোলরুমে বীয়ারের মগ হাতে নিয়ে যে দুঁদে বাঙালী সাহেব আশ্চর্য নির্লিপ্ততা নিয়ে বেতারে উপদ্রুত এলাকায় সংবাদ শুনে যান—সেই মানুষ স্বামীজীর সামনে এসে কিছুতেই যেন নিজেকে কণ্ট্রোল করতে পারেন না। ইলেকট্রন-প্রোটন নিয়ে নাড়া-চাড়া করে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁচেছেন এমন প্রবীণ অধ্যাপক স্বামীজীর চরণ স্পর্শে যে কী তড়িৎ প্রবাহ প্রত্যক্ষ করেন সে তথ্য সত্যি ভাববার।

স্বামী কামদানন্দের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল চেহারা ও আকৃতিগত গঠন। অতিবড় নাস্তিকেরও মাথা হেঁট হয়ে আসে সামনে দাঁড়ালে। তাছাড়া প্রচলিত কায়দা-কানুন সহস্র যোজন দূরে রেখেছিলেন স্বামীজী। গীতার ব্যাখ্যা নেই দুলে দুলে। কীর্তন হয় না সেখানে। জ্ঞান দেবার অভ্যস্ত প্রণালীর ধার ধারতেন না স্বামীজী। রূপ-রস গন্ধ বিবর্জিত, অনুস্বর-বিসর্গওয়ালা শ্লোক আওড়ানোও নয়। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি কী ভাবে জাগাতে হয় তার আলোচনা করতেন আলস্য জড়িত গদগদ ইংরেজীতে।

অতি বড় ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জীবনেও দৈবাৎ কখনও সুযোগ আসে। অন্ধকার দিনে ঝলকে ওঠা আলোর নিশানা নাকি একবার মেলেই। সেই হঠাৎ পাওয়া সুযোগ কেউ কাজে লাগাতে পারে—কেউ পারে না। আলোর ঝলকানিতে পথ খুঁজে পায় অনেকেই। আবার আলো-আঁধারীর মধ্যে বিভ্রান্ত হয় কেউ কেউ। চলার পথ আরও অসম্ভব আর দুর্গম ক'রে তোলে।

সুবিমল রায় পেলেন ঠিক সুযোগ নয়—দস্তুর মত পর পর কতগুলো অত্যাশ্চর্য মওকা। স্বামী কামদানন্দ-ঘটিত বিশাখাপর্ব তাঁর মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় ও চমকপ্রদ।

সুবিমল রায়ের এই জমাট মেলোড্রামার কাহিনী আমার অমিয় পালিতের কাছে অনেকখানি শোনা। গল্পের মত সে কাহিনীর আকর্ষণ। রসিক লোক অমিয় পালিত, বলতেনও বড় সুন্দর।

কিন্তু বিশাখা পর্ব-এ এসে একটু থেমে থেমে যেতে সুরু করলেন। একটা ঘটনা থেকে আর একটাতে লাফিয়ে আসতে সুরু করলেন। সেই কাটা-কাটা বিচ্ছিন্ন চিত্রই আমি সাজিয়ে যাব। যথাসাধ্য সঙ্গতি রক্ষা করবার চেষ্টা করবো।

আলাদীনের প্রদীপের ছোঁয়ায় অতি অল্প সময়ে আধুনিক আসবাব-পত্র সুন্দর গুছিয়ে ফেললেন সুবিমল রায়। রাসেল স্ট্রীটে দু-কামরার ফ্ল্যাট পাওয়া গেল। বরানগর থেকে দেবীকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন সুবিমল রায়।

ঠিক এই সময়টা সুবিমল রায়কে ভয়ানক ব্যস্ত থাকতে হলো। রাজনৈতিক একটা উত্তেজনা উঠছে সারা দেশ জুড়ে। এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে সুবিমল রায় মিরাট চলে গেলেন। যাবার সময় এক ঘরোয়া বৈঠকে হাত-পা ছুঁড়ে বললেন,

—একদিকে ইংরেজ, আর একদিকে সুযোগ সন্ধানী নেতৃত্ব বাঙ্গলার কণ্ঠরোধ করতে চায়। আমি আমার স্থির বুদ্ধি দিয়ে গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। আপনাদের বক্তব্য আমি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করবো।

সেই রাত্রেই মিরাট চলে গেলেন সুবিমল রায়।

গিয়েছিলেন নাচতে নাচতে। ফিরে এলেন হাসতে হাসতে। হাওড়া ষ্টেশনেই একটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে জানান দিলেন—

—আমি হাইকমাণ্ড-এর সুনজরে থাকবার চেষ্টা করবো না। আমি সাধারণ মানুষের কথা বলতে চাই। আমি তাদেরই একজন। তাই আজ আমি নিন্দার পাত্র। আমাকে বামপন্থী বলা হচ্ছে। আমি জনস্বার্থকে সবচেয়ে বড় স্বার্থ মনে করি। সেখানে পার্টি মিথ্যা, নেতৃত্ব

ও নেতাও সেখানে অবান্তর। আমি মিরাট থেকে শুধু পদাঘাত নিয়ে এলাম। রক্তক্ষরণ-এর কষ্ট আমি জেলে পেয়েছি। কারাগারের নির্যাতনে আমি ভয় পাইনে। কিন্তু আজ এই পদাঘাতের গ্লানি আমি ভুলতে পারি না। বাঙ্গলাকে হেয় করবার কী অধিকার হাইকমাণ্ডের আছে আমি জানি না, তবে বুঝতে পারি গভীর রাজনৈতিক সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গী এর পেছনে আছে। আমি অগ্নিযুগের মানুষ। আগুন নিয়ে খেলা করেছি—তাই বাঙ্গলার যুবশক্তিকে আমি আহ্বান জানাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল এই নেতাদের আপনারা চিনে রাখুন। বাঙ্গলা, আমার সোনার বাঙ্গলা দেশ········

তারপর পর পর দুটি ঘটনা ঘটলো।

হাইকমাণ্ডের সঙ্গে গুরুতর মতবিরোধ—দল ছেড়ে বেরিয়ে আসবার ভয় দেখান সুবিমল রায়। পরদিন লাট-ভবনে নিমন্ত্রণ এলো কিন্তু ঘৃণাভরে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দিলেন। ওয়ারেণ্ট তৈরীই ছিল কিন্তু আগেই আত্মগোপন ক'রেছিলেন সুবিমল রায়।

ঝুলে পড়া নাটকে মোক্ষম 'ফল্‌স্‌-ক্লাইমেক্স' যেমন নতুন ক'রে টেম্পো আনে—তেমনি ওয়ারেণ্ট নিয়ে সর্বত্র তালাশী আর অন্তর্ধানে জোলো রাজনৈতিক পটভূমিতে সুবিমল রায় হঠাৎ নতুন ক'রে জ্বলে উঠলেন।

সবটাই নাকি স্বামী কামদানন্দের হাত। শুধু পেনেটীর গঙ্গায় নৌকোর আস্তানা জোগাড় ক'রে দিলেন না, গভীর রাত্রে বজরায় চেপে এসে সুবিমল রায়কে বললেন,

—আই জি.-কে ব'লে ওয়ারেণ্ট ইস্যু আমিই করিয়েছি। এই সময় একটা রিপ্রেশন-এর সামনে না পড়লে আর ক'রে খেতে হবে না তোমাকে। আয়ারল্যাণ্ডের ব্যাপারটা তুমি লক্ষ্য করোনি। সুবিমল, আমি তোমাকে তুলবো। সত্যি তোমার একটা কাগজ দরকার। তোমার ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

—এ সব আপনি করেছেন ?

—হ্যাঁ।

—আমি না থাকায় মায়ের অসুবিধা হচ্ছে।

—তুমি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যস্ত। ব্যক্তিগত কারো ভাল-মন্দ দেখবার সময় তোমার কম। তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো। বিশাখা আমাকে সব বলেছে।

—মা ভগবতী।

—তুমি ভক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়া ছিল সুবিমল রায়ের। বিদ্রোহী সন্ন্যাসীর কথা স্পষ্টই মনে আছে। কিন্তু স্বামী কামদানন্দের মধ্যে আজ নতুন ক'রে ভবানন্দস্বামীকে যেন প্রত্যক্ষ করলেন। অস্পষ্ট এক বিস্ময়োক্তি। দস্তুরমত নির্বাক হয়ে গেলেন সুবিমল রায়।

পলাতক অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রইলেন। মহাত্মাজীর 'হরিজন' ইস্যুর ওপর দশদিন অনশন করলেন। পেটের চর্বি কিছু কমলো। নির্ভিক জাতীয় সংবাদপত্রে সুবিমল রায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দিনের পর দিন উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। স্বামীজী অতিশয় সক্রিয়।

মুক্তি যেদিন পেলেন মেদিনীপুর তখন ভাসছে। ঢেউ-এর মাথায় নাচতে নাচতে সুবিমল রায় চললেন জেলায় জেলায়। গাঁয়ে গাঁয়ে অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখে কলকাতা ফিরে এলেন। দিনে দশটা সভায় ভাষণ।

পথে পথে, লোকের বাড়ি বাড়ি অর্থ ভিক্ষা করলেন। ধনী-নির্ধন মুক্ত হস্তে দান করেছেন। মেয়েরা গা থেকে গহনা খুলে দিয়েছেন। দূরদূরান্ত থেকে ডাকযোগে, লোকযোগে টাকা আসতে লাগলো। টাকা জমা রাখবার ভার এলো সুবিমল রায়ের হাতে।

অক্লান্ত কর্মবীর সুবিমল রায়কে ডেকে পাঠালেন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। বললেন,

—আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই। Flood Enquiry

Committee-তে আপনি আসুন। আপনার বক্তব্য আমরা শুনতে চাই। আপনার কোনো আপত্তি আছে?

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন সুবিমল রায়। বললেন—ভাল কাজ কোনদিন প্রতিযোগী হ'তে পারে না। সে সর্বসময়ই অনুযোগী। দামোদর ও ময়ূরাক্ষী নদীর ছোবল থেকে যদি সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে চান, তবে আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে আছি। প্লাবন রোধ করবার ব্যাপারে আমার নিজেরও কিছু পরিকল্পনা আছে। আমি তো কাজই করতে চাই।

স্বামী কামদানন্দ বললেন,—রাজনীতির সাপ খেলাতে তুমি ভালই জান। Flood Control-Board-এ কতদিন থাকবে?

—দেখুন না কী করি। করপোরেশন-এর ইলেকশনের সামনে একটা হৈচৈ না করলে চলছে না।

তোমাকে আমি সাজানো বাগান দেব। নতুন মেশিন, নতুন বাড়ি। তুমি হবে সে কাগজের কর্ণধার। তোমার কাগজ শীঘ্রই চালু কর। একটা কাগজ আজ তোমার বড় দরকার। সবই মহামায়ার খেলা। বড়বাজারের বিটলভাই আমাদের জন্যে কিছু করতে চায়। তারই সব। সে সব ব্যবস্থাই করে দেবে।

সুবিমল রায় কোন কথা বলতে পারেন না। কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর স্বামী কামদানন্দেব পায়ের ওপর শুয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

—কান্না কেন! কান্না কেন সুবিমল !!

নিজেকে সংযত করে উঠে বসেন সুবিমল রায়।

স্বামীজী বলেন,—জানি তুমি কতটা দেশের জন্যে ভাব। এ কান্না ভাল। এ সাফল্যের কান্না। তোমাকে জগতের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব আমি নিয়েছি সুবিমল। তবে তুমি একা পারবে না। এক ছোকরাকে তোমার সঙ্গে দেবো। কাগজ চালাতে বিদ্যে-

বুদ্ধিওয়ালা একটা মাথা তোমার সঙ্গে থাকা দরকার। সবটাই আমার মাথায় আছে। প্রয়োজন মত জানাবো।

প্রায় দিন দশেক পর স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই আলাপ হলো। তরুণ এক যুবা। একমাথা চুল, সুন্দর মুখশ্রী, চওড়া কপাল। চোখ দুটো আকর্ষণীয়।

স্বামীজী বলেন,—সুবিমল, আমাদের কাগজে এই তরুণ যোগদান করবে। ইংরেজীতে আশ্চর্য রকম দখল। এর লেখা বাঙ্গলা গল্প-টল্প হয়তো তুমি পড়েছো। এর বাবাকে আমি জানি। আমি মনে করি এ সঙ্গে থাকলে তোমার মঙ্গল হবে। দস্তুর মত একটি প্রতিভা আমি তোমাকে সঙ্গে দিলাম।

তরুণ যুবার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে স্বামী কামদানন্দ বলেন,—সুবিমলের পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই। নিশ্চয়ই জানা আছে। প্রেস বসানোর আগে প্রাথমিক কাজগুলো শুরু করতে হবে। সুবিমল রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত—তোমাকেই গোটা জিনিষটা দেখতে হবে।

সুবিমল রায় প্রশ্ন করেন,

—আপনার নামটা····

তরুণ যুবা সুন্দর এক টুকরো হেসে বললো,

—অমিয়ভূষণ পালিত।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে সুবিমল রায় হেসে জবাব দেন,

—শোনা শোনা নামটা। আপনার নাম আমি শুনেছি। তবে সাহিত্য পড়বার আর সময় পাই কই। আপনিই সেই অমিয় পালিত !

সুবিমল রায়ের অত্যাশ্চর্য কর্ম জীবনে অমিয়ভূষণ পালিত সেদিনই প্রথম দেখা দিলেন।

অবিশ্রান্ত প্রবহমান সময়েরই বোধ হয় সময় নেই। নীরবে সে তার নিজের নিয়মে নানা কাহিনী আর আখ্যান গড়ে যায়।

অতি শক্তিশালী নাট্যকারও তাঁর নাটকের কুশীলব সাজাতে ও

গল্প গড়ে তুলতে দস্তুর মত ফল্স্-ক্লাইমেক্স-এর সাহায্য নিতে বাধ্য হন। লোকের তাতে ভাল লাগে। দর্শকের হাততালি মেলে স্বচ্ছন্দে। সুবিমল রায়ের জীবনে স্বামী কামদানন্দ একজন দুর্লভ চরিত্র। বিশাখা ও দেবশিশুর আবির্ভাবে মেলোড্রামার চড়া সুর থাকা সত্ত্বেও কাহিনীর ক্ষিপ্রতায় নাটুকে ভাবটা বড় চোখে পড়ে না।

অবস্থা বেশ জমজমাট। সমবায় ভাণ্ডারের হু হু করা শেয়ার উচ্ছৃঙ্খল বাতাসের ঝাপটার মত বিত্রস্ত হয়ে উড়ে যে কোথায় গেল তার আর সন্ধান মিললো না। সন্ধানী দলের দিকে এক নজর তাকিয়ে সুবিমল রায় বললেন: দেখুন, সমবায় শব্দের যথার্থ অর্থ আগে অনুধাবন করবার চেষ্টা করুন। সমবায় ভাণ্ডার কোন ব্যক্তিবিশেষ-এর সম্পত্তি নয়—তেত্রিশ জন সভ্য এর ভালমন্দের সঙ্গে জড়িত। বাজার নরম যাচ্ছে মানি কিন্তু ভয় খাবার কোনো কারণ দেখি না। দর আজ নেমে গেছে, কালকেই হয়তো দেখা যাবে চড় চড় করে দাম উঠতে সুরু করেছে।

শেয়ারের দর নেমে যাবার পেছনে কোন যুক্তি ছিল না। তবু দর পড়তে সুরু করলো। কে এক বিশ্বনাথ সরখেল অর্ধেক দামে সমস্ত শেয়ার বেচে দিল। তারপর থেকেই দর নামতে সুরু করলো হু হু করে। স্বনামে-বেনামে মুঠো মুঠো শেয়ার কিনে ফেললেন সুবিমল রায়। তারপর হঠাৎ একদিন ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করলেন। ধুলো মুঠো সোনা মুঠো হয়ে এলো। অর্থনীতির পাকা খেলোয়াড়ও দস্তুর মত তাজ্জব বনে গেলেন।

প্রেস চালু হলো। কাগজও আত্মপ্রকাশ করলো একদিন। সুবিমল রায়ের বিস্ময়কর জীবন এখান থেকে ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট ও আরও দুর্মদ।

দেবলোকে একদিন বিক্ষোভ দেখা দিল। বেমওকা এক ঠাণ্ডা লেগে ধরাশায়ী হলো দেবশিশু। কয়েক ডজন দুর্লভ ডাক্তারের

প্রাণপণ চেষ্টা চললো সকাল-সন্ধ্যে। কিন্তু মর্ত্যলোক ধরে রাখতে পারলো না। সুবিমল রায়ের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে চলে গেল।

তারপর মায়ের বিচিত্র রূপ।

স্বামী কামদানন্দ তখন বিদেশে। সংবাদ পেয়ে ফিরে এলেন। অনেক আলোচনা, বহু পরামর্শ। বিশাখা দেবীকে বড় চঞ্চল দেখা গেল। রুদ্ধ কক্ষে দীর্ঘ আলোচনা, কোনো সূত্রেই বাইরে প্রকাশিত হলো না।

সুবিমল রায়কে একদিন ঘরে ডেকে বিশাখা দেবী বলেন, এবার আমাকে বিদায় দিতে হবে সুবিমলবাবু। আমার যাত্রার সময় হয়েছে।

কেমন যেন রসিকতা বলে মনে হয়। বিস্মিত সুবিমল রায় বলেন, তার মানে ?

তার মানে অবশ্য প্রকাশিত হলো তারপর। বিশাখা দেবীর সময় ছিল না হাতে। রসিকতা করবার তিলমাত্র বাসনা ছিল না।

বিশাখা দেবী সমুদ্রযাত্রা করলেন। উচ্চতর গবেষণা করবার বাসনা নিয়ে চললেন ইয়োরোপ।

দিন যায়। সময় অতিবাহিত হয়।

হাইকমাণ্ডের সঙ্গে বাংলার নেতৃত্বের তিক্ততা সুরু হয়েছে। 'সমন্বয়' পত্রিকা সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়মিত শ্লাশ করে চলেছে। অমিয় পালিতের সম্পাদনায় অতি অল্পসময়ে পত্রিকা জনপ্রিয় হয়ে হয়ে ওঠে। পট্টভি সীতারামাইয়ার হার মহাত্মাজী নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করলেন। এই সময় সুবিমল রায়ের ভূমিকা আশ্চর্য রকম পরস্পর বিরোধী।

একদিকে সমন্বয় পত্রিকায় হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় নিত্য। অন্যদিকে নিখিল ভারতীয় নেতাদের তাকিয়া বহন সুবিমল রায়ের চলেছে অব্যাহত। শোনা যায় 'অ্যাড হক'

কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে সুবিমল রায় হাইকমাণ্ডের আস্থাভাজন হন। সুভাষচন্দ্র বসুর আপোষ হীন সংগ্রামের প্রস্তাব নাকি ভণ্ডুল করবার চেষ্টায় তিনি ছিলেন অন্যতম নেপথ্য চরিত্র। হিটলার এদিকে পোলাণ্ড আক্রমণ করেছে। লর্ড লিনলিথগো প্রায় পুরোপুরি ডিক্টেটর। রামগড়ে সুভাষচন্দ্র বসুর মিটিং ভাঙার জন্যে পলিটিক্যাল গুণ্ডা কলকাতা থেকে রপ্তানি করেছেন সুবিমল রায়—এ অভিযোগের অবশ্য কোনো ভিত্তি নেই সত্যি ; কিন্তু জ্বালাময়ী সম্পাদকীয়-র জন্যে অমিয় পালিত গ্রেপ্তার হলে শ্বেতাঙ্গ সচিবকে জানালেন,

—স্বাধীনতা সংগ্রাম চলবেই। সত্যাগ্রহ থামবে না। তবে আমি অহিংস সত্যাগ্রহে বিশ্বাসী। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কনস্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেম্বলী চাই।

সর্দার প্যাটেল যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি দেবেন বলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নোটিশ দিলে সেই রাত্রে পুলিশ সর্দারজীকে তুলে নিল। সুবিমল রায়কে বেরিলীতে আটক করা হলো।

অমিয় পালিত তখন প্রেসিডেন্সী জেলে। সমন্বয় দেখাশোনা করছেন মৃগেন দত্ত। সুবিমল রায়ের ছবি তখন মহাত্মাজীর ফটোর চেয়ে সমন্বয়ে বেশী প্রকাশিত হয়েছে। কাগজে নানাভাবে আকর্ষণীয় খবরে নিয়মিত সুবিমল রায়কে প্রাধান্য দিয়েছেন মৃগেন দত্ত।

ইয়োরোপে তখন ঘনঘটা। আধখানা ইয়োরোপ হিটলার ভেঙে নিয়েছেন। বিদ্যুৎগতিতে নাজী হিংস্র থাবা লেনিনগ্রাড, মস্কো ও স্ট্যালিনগ্রাড পর্যন্ত প্রসারিত। পার্লহারবারে আমেরিকার বিপর্যয়। অমিয় পালিত মুক্ত হলেন। তাতে সবচেয়ে দুঃখিত হন মৃগেন দত্ত।

অমিয় পালিত সমন্বয়-কে নতুন চরিত্র দিলেন। সমন্বয় এতদিন প্রচার করতে চেয়েছে, জর্মন-জাপানীদের ঠেকানো যাবে না। অমিয় পালিত ঘোষণা করলেন—লালফৌজ অপরাজেয়। স্তালিনের হাতে নাজী-জর্মনীর পতন হবে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষ রাশিয়ার পেছনে আছে।

রেঙ্গুনের পতনের পর ক্রিপস মিশন ভারতে এলো। তার আগেই প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন নেতার সঙ্গে সুবিমল রায় মুক্ত হলেন।

বিশ্রাম নেবার মানুষ নন। তবে স্বাধীনতা সংগ্রামে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে তলিয়ে রইলেন কিছুদিন। কুমার সিং হলে এক জনসভায় ক্রিপস মিশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিদারুণ সন্দেহ প্রকাশ করে হঠাৎ মানুষটি যেন হারিয়ে গেলেন।

সাময়িক ভাবে এই আত্মগোপনের নাকি পৃথক ইতিহাস আছে। পার্টি ফাণ্ডে বন্যা ও ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত অঞ্চলের সাহায্যে সংগৃহীত বিপুল অঙ্কের চাঁদা ও সমবায় ভাণ্ডারের মোটা টাকা ভেঙে সুবিমল রায় তখন সরকারী ওয়ার কণ্ট্রাক্ট দৃকপাতহীন ভাবে ধরে চলেছেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে আসে ক্ষীণ। শুধু নিখিল ভারতীয় নেতাদের দু-একজন সমন্বয় পত্রিকা ভবন সংলগ্ন সুদৃশ্য ফ্ল্যাটে উঠতেন। মোটরের দরজা খুলে সহাস্যে এগিয়ে আসা ও যথাস্থানে মোটা মোটা তাকিয়া সন্নিবেশে এই মানুষটির কোনো দিন ভুল হয় নি।

কলকাতায় এই আছেন, এই নেই। ইয়াঙ্কী পল্টনের উৎপাতে বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলেও সিফিলিস হু হু করে বেড়ে চললেও, দিল্লীর জিমখানা ক্লাবে এক লালমুখোকে কাৎ করে, সমন্বয়ের জন্যে সারা বছরের শুধু যৌন ব্যাধি থেকে দূরে থাকবার বিজ্ঞাপনই মেরে আনলেন কয়েক লক্ষ টাকার। দেরাদুনে গেলেন দেশের কাজে। সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন ডিফেন্সের মোটা কণ্ট্রাক্ট। কলকাতার শহরতলীর এখানে ওখানে সামরিক অস্থায়ী এয়ার পোর্ট তৈরী হচ্ছে। সুবিমল রায় সাপ্লাই করে চলেন লক্ষ লক্ষ ডাবের খোলা।

অনেকদির পর নিজের দিকে তাকাতে ফুরসুৎ পেলেন। কাগজের অফিসে ঘটা করে এলেন একদিন। বললেন, কাগজটা আমার ব্যবসা। আমি শুধু রীতিনীতি করতে বসিনি।

অমিয় পালিত বলেন, আপনি কী বলতে চাইছেন।

সুবিমল রায় অমিয় পালিতকে ভাল করেই জানেন। পয়সা ও

প্রতিপত্তি যতই হোক ধৈর্য রক্ষা করেন। নরমে গরমে বলেন, কাগজে আপনি রাজনীতি করুন, রাহাজানি করুন, আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমি চাই সার্কুলেশন। আমার মনে হয় ওদিকটা আপনি একদম ভাবছেন না।

অতিশয় আত্মসম্মানী লোক অমিয় পালিত। নিজেকে সংযত ক'রে বলেন, আমার মনে থাকবে। সার্কুলেশন যাতে বাড়ে সেদিকে নজর রাখবো।

—আপনি অসম্ভব রাশিয়া ভক্ত।

—গুরুবাদে আমার বিশ্বাস নেই। আপনি কী ভাবছেন বলুন না।

—কমিউনিস্টদের আপনি বড় বেশী পাত্তা দিচ্ছেন। ওরা সাপের বাচ্চা জানেন তো।

—দেখুন সুবিমলবাবু, কাগজটা যখন আমি চালাচ্ছি, সেটা আমার নিয়মেই চলবে। আপনি পরামর্শ দিতে পারেন। নীতিগত ভাবে········

কথা কেড়ে নিয়ে সুবিমল রায় বলেন,

—আপনি সমন্বয়-এর সব। এ কথা আর কারো জানা না থাকলেও আমি জানি। তবে কমিউনিস্টদের বেশী পাত্তা দেবেন না।

আসলে সুবিমল রায় নিখুঁত কারিগর। তিনি যে অনেক কিছুই জানেন না, সেটা তিনি কোন সময়ই ভুল করতেন না। নিজের বিত্তেবুদ্ধি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন। কী করে কাজ করতে হয় হয়তো জানতেন না, কিন্তু কাকে দিয়ে সবচেয়ে ভালভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব, সে জ্ঞান ছিল পুরোপুরি।

সমবায় ভাণ্ডার শূন্য করে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়ালেন একদিন। বিলিতি কোম্পানীর রবার আর ইস্পাতের শেয়ার কিনলেন গোপনে। দার্জিলিং মেলে চেপে চলে গেলেন শিলিগুড়ি। ডুয়ার্সে'র চা বাগান দেখে এলেন। ঝম করে অনেক টাকা ঢেলে ফেললেন সেখানে।

খদ্দর গায়ে রাখতে একটি দিনের জন্যেও ভুল করেননি, কিন্তু বাজারে বিলিতি কোম্পানীর শেয়ার কী ভাবে হাঁটা চলা করছে তার নিখুঁত ছবি চোখে চোখে রাখতেন।

নিজের একটা কাগজ থাকার অনেক সুবিধে। ভাল না করলেও খারাপ করবার ক্ষমতা অপরিসীম। ক্ষমতাশালী মানুষের সাহায্য শুধু নয়—নিতান্ত ভয়ঙ্কর ব্যক্তিরও খাতির পাওয়া যেত।

ঝিমিয়ে পড়া রাজনৈতিক পটভূমিতে নতুন টেম্পো উঠলো। মহাত্মা গান্ধী এবার আর কোনো কিছুতেই ভুলছেন না। ক্রিপস্ মিশন ফিরে গেল। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ। বিপ্লবের আহ্বান এলো চতুর্দিকে। 'কুইট্ ইণ্ডিয়া'—উৎসারিত হলো নেতাদের কণ্ঠে। চারদিকে চলে ধরপাকড়। মহাত্মাজী গেলেন আগা খাঁ প্যালেসে। প্রথম শ্রেণীর অন্য নেতারা গেলেন আমেদনগর দুর্গে।

অমিয় পালিত বললেন, একটি রাজনৈতিক চরিত্র না থাকলে কাগজ চালানো মুশকিল হবে এখন।

—আমি নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এক কাজ করুন অমিয়বাবু, আপনি টেম্পোটা চড়িয়ে দিন। এই যে ন্যাশনাল ইয়ে—এটাকে 'ক্ল্যাস' করুন। দেখবেন লোকে নেবে। আমি নিজে যে-কোনদিন গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারি। প্রশ্নটা তুলে আপনি ভাল করেছেন। সমালোচনা না করে 'নিউজ' বেশী করে দিন। মহাত্মা গান্ধীর 'ছবিটা' যেমন রোজ ছাপছেন—ছেপে যান।

শুধু কথা নয়। সুবিমল রায় আশা করেছিলেন গ্রেপ্তার হতে আর বিলম্ব নেই। ধরা দেবার জন্যে তিনি প্রস্তুতও হয়েছিলেন। কিন্তু একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে সুরু করলো, তবু পুলিশের চৈতন্য হলো না। এমন কি পরাশর চক্রবর্তীকে উত্তরপাড়া থেকে খুঁজে বার করলো পুলিশে, কিন্তু সেজেগুজে বসে থাকা সত্ত্বেও সুবিমল রায়কে কেউ স্পর্শ করলো না।

বিচলিত হন সুবিমল রায়। স্বামী কামদানন্দ হন উদ্বিগ্ন। বড় জটিল পরিস্থিতি। শঙ্কা প্রকাশ করেন স্বামীজী,

—আজকের দিনে তুমি যদি গ্রেপ্তার না হও, রাজনৈতিক জীবন তোমার শেষ হয়ে যাবে।

মুসড়ে পড়েন সুবিমল রায়। পরাশর চক্রচর্তী-গ্রুপ আবার ক্ষমতা দখল করেছে বুঝতে পারেন। পরিচিত এক পুলিশ কর্তার কাছে প্রসঙ্গক্রমে কথাটা তোলেন।

—আমরা কি করবো বলুন। ওপর থেকে আমাদের ওপর কোনো নির্দেশ নেই। আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পারি নে।

—এ রকম রাজনৈতিক গোলমালের মধ্যেও যদি আমি গ্রেপ্তার না হই, তবে আমার ভবিষ্যৎ ভেবে দেখেছেন? জনসাধারণ আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে। আমি কি আত্মগোপন করবো?

—ভুল করছেন, আমরা আপনাকে খুঁজে না বেড়ালে আপনার আত্মগোপন করা না-করায় কিছুই যায় আসে না।

—আমার সম্পর্কে নির্লিপ্ততার কারণ?

—হয়তো সরকার মনে করেন, আপনি আজকাল আর বিপজ্জনক মানুষ নন। তাছাড়া আজকাল আপনার একটা কাগজ আছে—ঝামেলা পাকাতে কতক্ষণ। অবশ্য আপনি যদি চান আমি কেস তৈরী করতে পারি। বলেন তো কাল ভোর রাত্রেই আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নেবার ব্যবস্থা করতে পারি।

—কথাটা যখন তুললেন, তখন খুলেই বলি। আমাকে কোণঠাসা করবার অনেকে চেষ্টা করছে। আমি দেশের স্বাধীনতা চাই। নেতা হতে চাই না। পার্টি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি, তাই ইদানিং একটু বসে গেছি। আমি পরশু মিটিং ডাকছি। নিশ্চয়ই একটা গোলমাল হবে। মিটিং থেকে ফেরার পথে আমি ধরা দিতে চাই। আপনি একটু দেখবেন। আমার মত এত ত্রিশঙ্কু অবস্থা আর কারো নয়।

—আপনি কালই ধরা দিতে চান ?

—পরশু করুন। কতদিন আটক থাকতে হবে কে জানে! একটু গুছিয়ে যেতাম এই।

—বেশ।

সুবিমল রায় গ্রেপ্তার হন ১৮ই আগস্ট, ভোর রাত্রে। যে পুলিশ অফিসার ওয়ারেণ্ট নিয়ে আসেন তার বিনয় ছিল যথেষ্ট,

—I am very sorry sir, but I must carry out my orders.

স্মিত হেসেছেন সুবিমল রায়,

—Yes, I am ready.

সমন্বয়ের প্রেস ফটোগ্রাফার তৈরীই ছিল। সমন্বয়ের প্রথম পাতায় ছবিসহ সুবিমল রায়ের গ্রেপ্তার হবার খবর ছাপা হলো।

জেল থেকে ফিরে এসে সুবিমল রায় আশ্চর্য রকম চুপচাপ থাকতে সুরু করলেন। অনেকে বললো—এ এক ভাব। নিশ্চয় গভীর কিছু নিয়ে চিন্তা করছেন। চুপচাপ বসে থাকবার তো মানুষ নন।

চিন্তামগ্নই ছিলেন! তবে চুপচাপ বসে তিনি ছিলেন না। চিন্তা বইছিল অন্যদিকে। সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অন্য কিছু নিয়ে। অন্যের কথা জানি না, খোদ সুবিমল রায়ই তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। ধূলো-মুঠো শুধু সোনা-মুঠো নয়—একেবারে হীরে-মুঠো হয়ে উঠেছে।

ইংরেজদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না, কিন্তু সাহেব কোম্পানীর শেয়ার ছাড়া অন্য কিছুতে হাত দেবার কথা তিনি চিন্তাই করতে পারতেন না। হু হু করে দাম উঠে যে কত ওপরে উঠে গেছে তা দেখে অবাক হয়ে যান সুবিমল রায়।

স্বামী কামদানন্দের কথামত জমি কিনতে সুরু করলেন এবার। খাল, বিল, জঙ্গল, বস্তি—সব কিছুই দু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন। কলকাতার চারপাশে জরিপ সুরু হলো।

অমিয় পালিতকে বললেন, কাগজ আপনিই দেখাশোনা করুন। লাট সাহেবের পিছনে একজন রিপোর্টার রাখুন। রোটারী আর ক্যালকাটা ক্লাবের বক্তৃতা ছাপুন। দেখুন আমি বিজ্ঞাপন সব কব্জা করে ফেলছি।

অমিয় পালিত বললেন, লীগ আমাদের কাগজের ওপর চটা। বিজ্ঞাপন আপনি পাবেন না।

—আপনাকে যা বললাম আপনি তাই করুন। লাট সাহেবকে চিত করে ফেললে বিজ্ঞাপনের বাবাদের দৌড়োদৌড়ি সুরু হয়ে যাবে।

জেল থেকে ফিরে এসে সুবিমল রায় যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। রাজনীতি থেকে দূরে সরে যেতে সুরু করলেন। শুধু টাকা, পয়সা আর কারবার হলো জপমালা।

আসলে দেশের মাটির সঙ্গে সুবিমল রায়ের ছিল নাড়ির যোগ। এ দেশের মানুষগুলোকেও তিনি খুব চিনতেন। অসম্ভব এই মানুষটি পয়সা করার অক্লান্ত সংগ্রামে দৈনিক যে অসাধ্য সাধন করেছেন তা অতি বড় কর্মবীরেরও ঈর্ষার উদ্রেক করবে।

'দেশের শিল্প দেশেতে রাখিব'—এই শ্লোগান দিয়ে চটপট এখানে সেখানে ঢুকে পড়েছেন। তারপর কি ইতিহাস রচনা করেছেন সাধারণ মানুষের সে তথ্য অজ্ঞাত। কারণ গোটা আখ্যানটাই অন্ধকারে রচিত।

পুরাণে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়ে যাবার কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। ধ্যানমগ্ন শনি ঋতুস্নাতা স্ত্রীর সঙ্গম ইচ্ছা উপেক্ষা করায় ক্ষুব্ধা স্ত্রী শনিকে শাপ দেন। এই রকম জানতে পারা যায়। কিন্তু গণেশের দৃষ্টিতে সুবিমল রায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির কোনো সকারণ যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মনে হয়, শনি যে ভুল করেছিলেন সুবিমল রায় সেটি করেননি। কলকাতায় চিত্ররথ বহু। তাঁদের কন্যারাও সংখ্যাতীত। ইচ্ছা অনিচ্ছাও বিস্তর। ধ্যানমগ্ন

শনির মত ভুল করবার মানুষ নন সুবিমল রায়। 'কে কোথায়, কার সঙ্গে সঙ্গ প্রার্থনা করে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। সুবিমল রায়ের নিজের হাতে তৈরী হাল-আমলের সেই 'নৈকট্য পুরাণ'-র কাহিনী প্রাচীন বহু মহা পুরাণের আখ্যানকেও তুচ্ছ করে দেবে।

চিত্ররথ দুহিতাদের সামনে রেখে গজাননকে হাতে পাওয়া গেল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অদৃশ্য পরশুরামের কুঠার সক্রিয় হয়ে ওঠে। মধুপুরে তাঁর চোরাই প্রেমের সঞ্চয়। চোরাই গহনা লুকিয়েই পরতে হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে এই নিরাভরণ জীবন বড় শূন্য মনে হয়।

এমন সময় হলো মীনাক্ষী ধরের আবির্ভাব।

সে এক বিচিত্র কাহিনী। কলকাতার অবিশ্রান্ত ক্লান্তিকর কর্মজীবন থেকে কয়েক সপ্তাহ পালিয়ে গিয়েছিলেন সিমলা। এক আই. সি. এস. সাহেব বিলেত ফেরার সময় সুবিমল রায়কে এই সিমলার কটেজ বেচে যান।

জানান না দিয়ে দিল্লী থেকে সোজা মোটর যোগে সিমলা পোঁছেছিলেন সন্ধ্যে নাগাত। কালীবাড়িতে প্রথম এসে কপালে সিঁদুর পরলেন। দরোয়ান জগীন্দর সিংকে কতটা বিব্রত হতে হবে, তাই নিয়ে স্তাবক পার্শ্বচরের সঙ্গে রসিকতা করছিলেন।

বাড়ির গেটের সামনে এসে কিন্তু ভ্যাবাচাকা খেয়ে যান। সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে। ভুল হয়নি কণামাত্র—হেডলাইটের আলোতে পেতলের নেম প্লেট স্পষ্ট পড়া গেল। নিজের বাড়ি, তবু একটু কুণ্ঠা নিয়ে এগিয়ে যান। কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হতে হয়নি। প্রায়ান্ধকার পোর্টিকোয় যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি খেলে গেল। স্বয়ং মীনাক্ষী ধর। গাড়ির হর্ন শুনে বেরিয়ে এসেছেন। রহস্য-দ্রষ্টা সুবিমল রায় বিস্ময়োক্তি করেন,

—আপনি!

—'কাকে খুজছেন'। মীনাক্ষী ধরের সুরেলা কণ্ঠে কৌতূহল।

—দরোয়ান কোথায় ?

—আপনি বরং ওদিকে খোঁজ করুন।

বাড়ির আউট-হাউস সুবিমল রায়ের ভালই জানা। মীনাক্ষী ধরের কথায় কর্ণপাত না করে বলেন,

—আপনারা এখানে কতদিন ? চিনতে আমার এতটা ভুল হবে !

—দিন চারেক।

—আশ্চর্য ! এ সব আমি কিছুই জানি না। দরোয়ান আমাকে কিছুই জানায় নি।

কাউকে তো কিছুই জানানো হয়নি।

মীনাক্ষী ধর এতক্ষণে হয়তো আন্দাজ করেছিলেন। ভেতরে ডাকলেন। ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললেন,

—ড্রইং রুমে আপনার অয়েল পেন্টিং দেখেছি। কি কাণ্ড ! আপনার বাড়ি, অথচ আপনাকে না বলে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে আপনার দরোয়ান। আমরা এ সবের কিছুই জানি না। আপনি সুবিমল রায়, আমি চিনেছি।

মৃদু হেসেছেন সুবিমল রায়।

সে এক নাটকীয় দৃশ্য। অল্পক্ষণ পরেই এলেন মিঃ ধর। অমায়িক। অপ্রস্তুতের এক শেষ। বাড়ি তিনি তখনই ছেড়ে দিতে চাইলেন। হাঁ হাঁ করে ওঠেন সুবিমল রায়,

—এই রাত্রে আপনারা যাবেন কোথায় ! সিজনের সময়, হোটেলে এখন জায়গা পাওয়া মুশকিল। আজকের মত একটা ঘর আমাকে ব্যবহার করতে দিন। কাল দেখে শুনে চলে যাবেন। আমিই আপনাদের বিব্রত করেছি। আমিও অপ্রস্তুত। জগীন্দর সিং কত টাকা নিয়েছে ?

—একশো দিয়ে গৃহপ্রবেশ। পনেরো দিনের মেয়াদে সাড়ে তিন শো'তে রফা হয়েছে।

সুবিমল রায় হো হো করে হাসতে থাকেন।

সবচেয়ে ভাল ঘরটিই মীনাক্ষী ধর ছেড়ে দিয়েছেন। ডিনার সেরেছেন এক টেবিলে। নরম বিছানা। তবু ঘুম হলো না সারারাত। মীনাক্ষী ধরের আলোর ঝলকানির মত চেহারা, আর তাঁর সুরেলা কণ্ঠই হলো সুবিমল রায়ের বিনিদ্র রজনীর কারণ।

ভোর হয়। ব্রেকফাস্টও সারা হলো। নরম ডিম ও পরিজ্ সহযোগে কিছুক্ষণ চলে পলিটিকস্। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর নির্ভীক জীবন-ইতিহাস কিছু কিছু সামনে রাখলেন। নিখিল ভারতীয় নেতাদের ব্যক্তিগত জীবনের মুখরোচক খুঁটিনাটির কথা। কোন নেতা মাগুর মাছের ঝোল খেতে খুব ভালবাসেন, কোন নেতার বেরুনোর সময় ডজন খানেক গান্ধী-টুপি নষ্ট করে একটা বেছে নেবার মজার হবি। ছাগলের অভাবে কবে কোথায় মহাত্মাজীর দুগ্ধপান এক রকম বন্ধ হতে বসেছিল—কৌতূহলোদ্দীপক নানা আখ্যান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করলেন সুবিমল রায়। একবর্ণও অতিরঞ্জন নয়। অতিভঙ্গি নয় এতটুকু। ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি। মোটা গদির ওপর নিখিল ভারতীয় নেতাদের ঠেস দিয়ে বসার ছবি। তাকিয়ার ফাঁকে সুবিমল রায়। বিয়াল্লিশের আগস্টে ভোর রাত্রে গ্রেপ্তার হবার ছবিটা অপেক্ষাকৃত বড়। সাহেব পুলিশ অফিসারের পাহারায় সুবিমল রায় গ্রেপ্তারের পর পুলিশ জিপে উঠছেন।

আস্তানা খোঁজার প্রসঙ্গ উঠতে সুবিমল রায় প্রসন্ন হেসে বলেন,

—যদি খুব অসুবিধে না হয়, তবে এ ক'টা দিন সিমলাতে আমার কটেজেই আমি আপনাদের থাকতে অনুরোধ করবো।

—আপনার অসুবিধে হবে।

—আদৌ নয়। বরং আপনাদের সঙ্গী পেলে আমার ভাল লাগবে।

মিঃ ধর একটু মুখচোরা। সামান্য সময়ে সুবিমল রায় বুঝতে

পারেন ভদ্রলোক স্ত্রীর বাধ্য। স্ত্রী মেনটেন করতে দস্তুর মত হিমসিম খাচ্ছেন। কোনো কিছু মন্তব্য করবার আগে স্ত্রীর দিকে মিঃ ধর একবার তাকিয়ে নেন।

—আপনার মত মানুষের সঙ্গ পাব এ আমাদের সৌভাগ্য। কী আশ্চর্য যোগাযোগ। একা মানুষ আপনি, দুনিয়ার যত জগীন্দর সিং আপনাকে শুধু ঠকাচ্ছে।

মিসেস ধরের কথায় আত্মপ্রসাদের সপ্রসন্ন হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে,

—জগীন্দর সিং আর আমাকে কত ঠকাবে। যৌবনের প্রথম দশ বছরই আমার ইংরেজ ঠকিয়ে নিয়েছে। এ প্রতারণা তুলনাহীন। বাইরে আর থাকতে পারলাম কই!

মিসেস ধর হঠাৎ মন্তব্য করেন,

—আমাদের দেশে ধরা দেবার একটা রেওয়াজ আছে। ইয়োরোপে বড় বড় বিপ্লবীকে কিন্তু কিছুতেই ধরা যায়নি। আত্ম-গোপন করেই তাঁরা কাজ চালিয়ে গেছেন।

—আমি আপনার সঙ্গে একমত। তবে গ্রেপ্তার আমিও এড়াতে পারতাম। কিন্তু গুলিতে আহত দুই সঙ্গীকে পরিত্যাগ করতে পারিনি। নিরাপদ আস্তানায় তাদের পৌঁছে দিয়ে বোটম্যানের ছদ্মবেশে নৌকোতে বসিরহাট পৌঁছলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার এড়াতে পারিনি। সামনে-পেছনে রিভলবার। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। সে একদিন গেছে। কে কাকে ঠকায় মিসেস ধর! এ সম্পূর্ণ জীবনবোধের ব্যাপার।

সুবিমল রায় যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। মীনাক্ষী ধরকে দেখে যেন নতুন করে হৃত যৌবন ফিরে পেলেন। দু'দিনেই হাঁপিয়ে পড়লেন সিমলায়। চললেন কসৌলি। পাইন অরণ্যের অপূর্ব শোভা দেখলেন নয়ন ভরে। ভোর বেলায় জাখু পাহাড়ে সূর্যোদয়। স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্টে চক্কর। শতদ্রুর কোলে 'তপ্তপানি' দেখে ফরেস্ট রেস্ট হাউসে রাত্রি

যাপন। মিঃ ধরের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেল। সিমলাতে গাড়ি পাঠিয়ে ডাঃ পরিমুকে ধরে আনলেন সুবিমল রায়। দিন পনেরো পর সিমলায় ফিরে এসে মিঃ ধরের সামনে মীনাক্ষী ধরকে যখন 'তুমি তুমি' করছেন, তখন প্রায় সাত হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে।

সিমলাতে পৌঁছেই কলকাতা থেকে জরুরী তার পেলেন। নিতান্তই ব্যবসা-ঘটিত প্রয়োজনের। বললেন,

—পালিয়েও শান্তি নেই। কাল সকালেই আমি কলকাতার পথে দিল্লী যাচ্ছি।

মিঃ ধর মন্তব্য করেন,

—বিশ্রাম আপনার হলো না। তবে আপনাকে কাছে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। আপনার মত মানুষের সান্নিধ্যে এসে আমরা কৃতার্থ হলাম।

মৃদু হেসেছেন সুবিমল রায়।

একলা ঘরে মীনাক্ষী ধরের কৃত্রিম অভিমান,

—সত্যিই আপনি কাল চলে যাবেন?

—নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে যেতে হচ্ছে।

—আবার আমাদের কবে দেখা হবে?

—না হলেও ক্ষতি নেই। ভাল জিনিষ যত কম হয় ততই ভাল। নইলে ভাল জিনিষের মাহাত্ম্য তাতে কমে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে আমি ঠকে যাওয়া, প্রতারিত মানুষ। তুমি আমাকে অনেক দিয়েছো। এ ঋণ শোধ হবে না কোনদিন।

—কলকাতায় ফিরে আপনাকে আমি ফোন করবো।

—আমি প্রতীক্ষা করবো।

—'আপনি একটা কী', মীনাক্ষী ধরের বাষ্পার্দ্র কণ্ঠ।

—মীনাক্ষী।

—আপনি চলে গেলে আমিও আর সিমলে থাকতে পারবো না। আমিও চলে যাব।

—তোমার যা ভাল লাগে তুমি তাই করবে। শুধু একটা কথা তোমাকে আমার বলবার আছে। যদি কোনদিন আমাকে মনে পড়ে, কোনদিন যদি প্রয়োজন বোধ কর, আমাকে ডেকো। একটি জায়গায় আমাদের আশ্চর্য মিল। আমি ঠকেছি। তুমি ঠকছো। তুমি কোথায় যেন একা, আমি সম্পূর্ণ নির্বান্ধব। তোমাকে মর্যাদা দেবার মত মানুষ নেই মীনাক্ষী।

পরদিন সকালে সিমলা পাহাড় ছেড়ে এলেন সুবিমল রায়। গাড়িতে উঠে মীনাক্ষী ধরকে আর দেখতে পেলেন না। পুরো কটেজটিই ঢাকা। হু হু করে কুয়াশায় সব ঢেকে গেল। বাঁকের শেষে আরও উঁচুতে কালীবাড়ি সম্পূর্ণ অন্ধকার।

তার পরের অধ্যায় অস্পষ্ট। অনেকে অনেক কথা বলেন। পর্বত মহম্মদের কাছে এসেছে, না মহম্মদ গেছেন পর্বতে, সে সম্পর্কে অনেক রসাল কাহিনী বাজারে প্রচলিত। ব্রিফলেস ব্যারিস্টার মিঃ ধরকে সুবিমল রায় নাকি কল্পনাতীত ব্যাক করেছেন। আকর্ষণীয় কেস হয়তো দিতে পারেননি, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই করে দিয়েছেন তিনটে কোম্পানীর লিকুইডেটর। টাকা ধার দিয়ে পার্টনার করেছেন বিলিতি কোম্পানীর। মীনাক্ষী ধরকে নিয়ে লঞ্চ ভাড়া করে সুন্দরবনে কাটিয়ে এসেছেন সপ্তাহখানেক। বছর ঘুরতেই অসম্ভব ভাঙাচোর হলো। মিঃ ধরের পৈত্রিক বাড়ি ছিল একডালিয়ায়। চলে এলেন ফিরিঙ্গী পাড়ায়। রাত্রে নিয়মিত সুবিমল রায় ডিনার খেতে আসতেন। পশ্চিমী চিত্রকলায় মীনাক্ষী ধর একজন উঁচুদরের কনৈসার্। প্যারী থেকে দুর্মূল্য ছবি এসে পৌঁছতে বিলম্ব হলো না। আনন্দে হাততালি দেন মীনাক্ষী ধর,

—বালুচরে তাহিতি মেয়ে আমার শোবার ঘরে থাকবে। এত বড় গোঁগ্যা কলকাতায় কারো নেই।

পুরুষত্বহীন, নির্জীব মিঃ ধর তবু সবটা মেনে নিতে পারেননি। সন্দেহ হচ্ছিল। একদিন হয়তো দেখেই ফেলেছিলেন। পুরীর

মন্দির-গাত্রের বা খাজুরাহোর প্রাচীন শিলায় খোদিত দেহ ও দাহ-ময় মূর্তির রূপান্তরিত রক্ত-মাংসের সজীবতা, নিজের বিছানায় দেখে চমকে উঠেছিলেন। হিংস্র ব্যাঘ্রের সামনে তুচ্ছ চতুষ্পদ যেমন মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি এই মানুষটি উদ্ধত রিভালভার নিয়ে সুবিমল রায়ের সামনে বেপরোয়া ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

—কাম এ্যালঙ্, ইফ ইউ বি এ সন অফ এ ম্যান!

সুবিমল রায় অপমানিত। একটা কথাও বললেন না। মাথা নত করে চলে গেলেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার শুধু ঘুরে তাকালেন,

—আমারই ভুল। আমাকে ক্ষমা করবেন।

সেই রাত্রেই উন্মাদের মত টেলিফোন করেছেন মিঃ ধর। অনেক রাত। সুবিমল রায় 'ওয়ার এণ্ড পীস' পড়ছিলেন।

—মিনু কী রকম করছে। ও বোধ হয় বাঁচবে না।

নার্সিং হোম। ডাক্তার বললেন, পাম্প করে সব তুলে নিয়েছি। বেশী দেরী হলে আর বাঁচাতে পারতাম না।

সুবিমল রায় গাড়িতে এসে বসলেন। মিঃ ধরকে বললেন,

—অসম্ভব অভিমানী। আঘাত পেয়েছে।

মিঃ ধর নিরুত্তর।

—আমাকে আপনি ভুলই বুঝেছেন মিঃ ধর। শৈশবে মা হারিয়েছি। স্নেহ, ভালবাসা কখনও পাই নি। প্রথম যৌবনে আগুনকে ভাল বেসেছিলাম। মনে পড়ে একদিন ইংরেজ অফিসারের টর্চার-চেম্বারে জ্ঞান হারানোর পর জেল হাসপাতালে প্রথম যখন জ্ঞান ফিরে পাই, তখন মীনাক্ষীর মত একটি বোনকেই আমি প্রথম দেখি। তার শুশ্রূষায় আমি বেঁচে উঠি। আপনার মীনাক্ষীকে আমার সেই রকমই মনে হয়েছে। বড় ভাইয়ের অধিকার ছাড়া আমি কিছুই চাইনি।

মিঃ ধর হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লেন,

—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার স্ত্রীকে বাঁচান। আমাকে শাস্তি দিন।

সুবিমল রায় ম্লান এক টুকরো হেসেছেন। ধীরে মন্তব্য করেন কয়েক মুহূর্ত পর,

—শাস্তিটুকু মীনাক্ষী একাই নিয়েছে। আমাকে হয়তো ভুল বুঝতে পারেন, কিন্তু মীনাক্ষীকে আপনি এতদিনেও চিনতে পারেন নি। আপনি কী মানুষ। এ সব কথা আপনি মনে আনলেন কেমন করে! এত নীচ আপনি।।

সময় আর সময়। সমস্ত কিছুই আজ বিস্মৃতি। ক্রমে সব সহজ হয়ে আসে। মেনে নিতে হয় সব কিছুই। বোঝেন সব, কিন্তু মিঃ ধর সম্পূর্ণ নিরুপায়। মীনাক্ষী ধর এই ধরনের পুরুষকেই খুঁজেছিলেন। প্রাণী-জগতে মিঃ ধরের মত বাধ্য জীব পাওয়া দুষ্কর। তাঁর দ্রুতলয়ের জীবন অব্যাহত রইলো। আসল রইলো হাতের মুঠোয়, ফাউ সংগ্রহ চললো নিরাপদেই। সব দিয়েছেন সুবিমল রায়। বাড়ির চাকর বেয়ারা পর্যন্ত সুবিমল রায়কে আসল মনিব বলে চেনে।

দাঙ্গার সময় সুবিমল রায় ঘুরেছেন নোয়াখালি। গেছেন পাঞ্জাব। নিজের কারখানায় সাময়িকভাবে বাস্তুহারাদের আশ্রয় শিবির স্থাপন করেছেন।

স্বাধীন হয়েছে দেশ। শোনা যায় দিল্লী থেকে ডাক আসে। কিন্তু খণ্ডিত বাংলায় পূর্বের দাপট আজ নিঃশেষিত। এদিকে নানা ব্যবসা আর কারবারে এমন জড়িয়ে পড়েছিলেন যে রাজনৈতিক সক্রিয় জীবনে গতি দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ক্রমে টাকার নেশার ফেণা থিতিয়ে আসে। সে পানীয় কেমন জোলো মনে হয়। ক্ষমতা ও নামটায় অনাদরে মরচেই পড়েছে শুধু।

দুর্মদ মানুষ আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। উচ্চস্তরের রাজনীতি সুরু করলেন। কাগজের প্রথম পাতা ছিল হাতের কাছেই। পুরানো বন্ধুরা বিরাট বিরাট ক্ষমতা অধিকার করেছেন এতদিনে। কিছুদিন

ছোটাছুটি করলেন। তাঁরাও চেয়ার সাগ্রহে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু ভেতরের ঘরে জায়গা হলো না।

চলে গেলেন বার্লিন। পশ্চিম জার্মানী থেকে ভারী কলকব্জা আমদানী করবার ব্যবস্থা পাকা করে আসেন। ফিরে এসে পূর্ব জার্মানী সম্পর্কে নিদারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে শিল্পপতিদের এক জমায়েতে ভাষণ দিলেন। কমিউনিস্টদের আখ্যা দিলেন সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কমিউনিস্টদের জবাব এলো—তুমি গাধার চেয়েও পাঁঠা।

পূর্ববঙ্গের শত সহস্র ছিন্নমূলের মধ্যে গিয়ে সুবিমল রায় বলেন, আমি হিন্দু কমিউনিস্ট। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

মীনাক্ষী ধর ভরসা দেন, তুমি ঘাবড়াও কেন? ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকে তোমাকে যেতে হবে না। তোমার নিজের শক্তি অনেক। টাকায় কি না হয়। সামনের নির্বাচনে তুমি দাঁড়াবে।

সুবিমল রায় বলেন, ঠিক বলেছো, স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে আমি সুড়ুত করে ঢুকে পড়বো। এই দেশের লোকগুলো এত নেমকহারাম—দেশের স্বাধীনতার জন্যে কি করেছি আর না-করেছি। আজ যেন চিনতেই পারে না। অসভ্য জাত।

সুবিমল রায় জুতসই একটা রাজনৈতিক গোলমালের সুযোগ খুঁজছিলেন। কিন্তু পছন্দ মত কোনো কিছুই পাওয়া গেল না। শেষ ভরসাস্থল বাস্তুহারা। তাদের জমিয়ে তুলে রাজনৈতিক আসরে ভেসে ওঠবার চেষ্টা করেন।

ঘটা করে অনশন সুরু করলেন। কাগজে কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হলো। অগ্নিযুগের নেতা, গঠনমূলক কর্মপ্রয়াসের অন্যতম স্রষ্টা, ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ও দীর্ঘদিনের সুপ্ত যোদ্ধা যেন আবার নতুন করে জ্বলে উঠলেন। সরকারের উচ্চ ক্ষমতা যুক্ত কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সতের দিন পর সুবিমল রায় অনশন ভঙ্গ করেন। বেলগাঁও-এর মহারাজা ও লেডী সীমা গাঙ্গুলী এক সঙ্গে লেবুর রসের গ্লাস মুখের সামনে তুলে ধরেন। সুবিমল রায় অনশন

ভঙ্গের অব্যবহিত পূর্বে এক বিবৃতিতে বললেন, বাঙালী উদ্বাস্তুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য আমি অনশন আরম্ভ করি। এই অভিযোগ পর্যালোচনা করে দেখার জন্যে অতি উচ্চ স্তরের ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে এক উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত কমিশন নিয়োগ করা হবে বলে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় আমি অনশন ভঙ্গ করলাম।

চিকিৎসকদের নির্দেশে হৃতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্যে মীনাক্ষী ধরকে সঙ্গে নিয়ে মালাবার হিল্‌স্-এ চলে গেলেন সুবিমল রায়।

মীনাক্ষী ধরের কৃতিত্ব অপরিসীম। সুবিমল রায়কে তৈরী করেছেন সুন্দর। বিপুল অর্থের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আগে তিনি ছিলেন ঢিলে-ঢালা, একটা আঁশটে অশিক্ষিত চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়তো হামেশাই। বাড়িটা ছিল নোংরা। টেলিফোনেও লেগে থাকতো ময়লার দাগ। ধুতিই পরতেন, তবু উরু বেরিয়ে পড়ত যখন তখন।

এখন কিন্তু সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। অতি আধুনিক আসবাব-পত্র আর বিলিতি কায়দায় ঘর সাজানো বড় কথা নয়, খোদ মানুষটিকেই সুন্দর সাজিয়েছেন মিসেস ধর।

সবটাই বোধ হয় ধরে-ধরে শিখিয়েছেন। সুবিমল রায়ের সেই অবিশ্রান্ত পা নাচানো নেই। নাকের চুল ছেঁড়ার অভ্যাসটাও গেছে। মিসেস ধরের তৈরী অদৃশ্য এক স্বরলিপি সামনে রেখে যেন সুরে কথা বলেন। উচ্ছ্বাস অবশ্য আছে, কিন্তু হাউমাউ করে কথা বলা গেছে। হো হো করে হেসে হাত-পা নেড়ে হৈ-চৈ আর করেন না।

কর্মবহুল জীবনের অস্পষ্ট নাটকীয় উঠতি-পড়তি হয়তো মিসেস ধরের পুরোপুরি জানা ছিল না। আড়বাঁশির মেঠো সুর ধরে চীৎপুরের পুতুলকণা আখ্যানের কণামাত্রও জানতেন না সত্যি। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিত সুবিমল রায়ের চতুর্থ মানের শেষ বেঞ্চ থেকে পদ্মা পেরিয়ে কলকাতায় আসা ও অপেরা পার্টিতে আড়বাঁশি বাজানোর কাজে এসে ঠেকবার বিস্তৃত আখ্যান শোনা ছিল।

সুবিমল রায় নিজেই এ-সব কথা বলেছেন। নিতান্ত অন্ধকার

দিনগুলো বাদ দিয়ে সমস্ত কিছুই প্রকাশ করে দিয়েছেন। মিসেস ধর এ সব শুনতে চান নি। বাধাই দিয়েছেন। উচ্ছ্বসিত হয়েছেন সুবিমল রায়। বলেছেন,

—আমার তো কেউ নেই। একজনকে তো বলতে হবে। আত্মস্মৃতি লেখার সময় নেই, কিন্তু জীবনী রচনার ভার হয়তো তোমাকেই নিতে হবে। আমার সম্পর্কে তোমার এ-সব কৌতূহল থাকা দরকার। আমি তো ম্যাট্রিকও পাস করিনি। যাত্রাদলে বাঁশী বাজাতাম।

এ সমস্ত কথা প্রকাশ করে দেবার পেছনে প্রচ্ছন্ন একটা দম্ভ ছিল। প্রকারান্তরে তিনি যে প্রচলিত গতানুগতিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন শৈশব থেকেই, সেই কথাই বলতে চেয়েছেন।

মিসেস ধর তাতে যেন খুশীই হয়েছেন। পৃথিবীর বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি ও মহাপুরুষ লেখাপড়ার প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে যে কী অসম্ভব পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবুদ্ধির স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার নজীর দেখালেন বহু। মনে হলো ম্যাট্রিক পাস না করে যেন ভালই করেছেন সুবিমল রায়। প্রতিভাবান মানুষের মজাই নাকি এই রকম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এণ্ট্রান্স পাস করেননি শুনে নিজের সম্পর্কে আশ্চর্যরকম শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন সুবিমল রায়।

আসে নির্বাচন। শুনলাম স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবে সুবিমল রায় দাঁড়াচ্ছেন। কদিন পর ডাক এলো।

বেশ খুশী খুশী ভাব। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন ইঙ্গিতে,

—এককালে কমিউনিস্ট পার্টি করেছো। তোমার তো অনেক কিছুই জানা আছে।

একটু হেসেছি

—সমন্বয়ের কাজকর্ম কিছুদিন বন্ধ রাখো। আমার সঙ্গে থাক। তোমাদের কমরেড বীরেন চৌধুরীর সঙ্গে দাঁড়াচ্ছি।

—ওখানে মহম্মদ আজিজও দাঁড়াচ্ছেন। অধ্যাপক নরেন্দ্র ঘটকও আছেন।

হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়েই দেন,

—ওসব কিছু নয়। আজিজ সাহেব মুসলিম ভোটগুলো টানবে। আর ঘটককে আমিই থাকতে বলেছি। শেষ মুহূর্তে আমার সমর্থনে ঘটক বসে যাবে। ভয় হচ্ছে কমরেড বীরেন চৌধুরী। তোমাকে কাল থেকেই আমার সঙ্গে থাকতে হবে। অনেক দায়িত্ব। বিশ্বাসী লোকও পাওয়া মুশকিল।

আমি ভরসা দিয়েছি। তা'ছাড়া ন্যাশনাল বুর্জোয়ার রোল একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আন্দোলনের এও এক অধ্যায়।

শুধু জিপ্ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি নয়। হাজার হাজার প্রচারপত্র ছড়ানোতেই নয় শুধু—ময়দানের বক্তৃতা লিখে দিয়েছিলাম আমি। এক সময় রাজনীতি করেছিলাম, তাই ঝলমলে সোজা পথ ও পলিটিক্সের দুর্গন্ধযুক্ত চোরারাস্তার নিশানাও আমার জানা ছিল। শহরের বুকে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া এক পলিটিক্যাল এ্যাজিটেশনের পুরোভাগে সুবিমল রায়কে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মধ্যবিত্ত ভাবপ্রবণ বুদ্ধিজীবিদের কাত করে ফেলবার পরিকল্পনা ছিল আমার।

সেদিন জনতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সুবিমল রায়ের "চলবে না—চলবে না" স্লোগান শুনে সাধারণ মানুষ বিস্মিত। পেশাদার রাজনৈতিক জুয়াড়ী চিন্তিত, আর পুলিশ হয়েছিল উদ্বিগ্ন।

ডেপুটি কমিশনার এগিয়ে এসে নাকি বলেছিলেন : স্যার আপনি ভিড়ের মধ্যে কষ্ট করবেন না। আমাদেরও অসুবিধে হচ্ছে।

সুবিমল রায় বললেন : সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে। জনসাধারণের সংগ্রামে আমি নিতান্তই নগণ্য এক সৈনিক।

এক-শ চুয়াল্লিশ ধারা লঙ্ঘন করা হলো। কুচোকাচা কিছু ধরা পড়লো, কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। পুলিশ সুবিমল রায়কে কিছুতেই গ্রেপ্তার করলো না।

নির্বাচনের আগের দিন রাত্রে শহরতলীর নির্বোধ অর্ধ-উলঙ্গ কয়েক সহস্র সজীব দেহ লরি করে বোঝাই করে এনে পরদিন সকালে মিথ্যা ভোটার বিপুল সংগ্রহ করা হয়। টাকা দিয়ে ব্যালট পেপার যে কী পরিমাণ সংগ্রহ হয়েছিল, টাকার খাতিরেও সে হিসাব রাখা সম্ভব হয় নি।

দেশের যৌবন হয়তো গেছে, কিন্তু যুবকেরা আছে অপর্যাপ্ত। সাঙ্গুভ্যালির ছাগলের হাড়ে রসনার যাদের নিবৃত্তি, অশ্লীল স্ত্রীলোকের উষ্ণ জানুতে যে যুবকের লাম্পট্যের সার্থকতা, ভাটিখানায় যে যৌবন সফল, এমন মর্মান্তিক তাজা তাজা সেই শ্রেণীর যুবকের বিপুল সংগ্রহ আমার নোটবুকে তখন ভরে ওঠে।

সুবিমল রায় সব জানেন। কারণ অনরেরিয়াম নামে এ্যাবস্ট্রাক্ট একটা সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে অহরহ তাঁকে চেকে সই করতে হতো। ঠোঁটে মিষ্টি মিষ্টি হাসি হাসতেন। কোনো মন্তব্য করতেন না। নিজের স্ত্রীর চরিত্রদোষ অনেকে যেমন দেখেও দেখতে চান না, অনেকটা সেই নির্লিপ্ততা নিয়ে নারকীয় রাজনীতির সাপ-খেলানো সুবিমল রায় মেনে নিয়েছিলেন।

নির্বাচনে আট-শ ভোট বেশী পেয়ে সুবিমল রায় নির্বাচিত হন। কমরেড বীরেন চৌধুরী পরাজিত।

সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমাদের প্রধান নির্বাচনী অফিসে সুবিমল রায়কে নিয়ে যখন হৈ-চৈ চলেছে, এমন সময় তিন ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। চাপা গুঞ্জন চারিদিকে। সুবিমল রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকদের মধ্যে একজনকে আমিই বোধ হয় প্রথম চিনলাম—তিনি বীরেন চৌধুরী।

পরাজয়ের তিলমাত্র ছাপ নেই চোখে মুখে। ব্যর্থতার গ্লানি বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। অশেষ ধন্যবাদ ও অফুরন্ত শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন কমরেড বীরেন চৌধুরী।

শুধু একবার আমাকে দেখে চোখে একটু হাসলেন। বললেন,

—বেশ বুঝিয়েছ। Qualitative to quantitative change!

আমার এক প্রাক্তন কমিউনিস্ট বন্ধু আমাকে একহাত দেখে নিয়ে ঘোষণা করলো, আমি নাকি কালীঘাটের কাউট্স্কী।

প্রগতিশীল এক মাসিকে আমি তার জবাবে প্রবন্ধ লিখলাম। 'সুবিধাবাদীদের হাতে মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা।' প্রবন্ধটির সমালোচনা শেষে পরের সংখ্যায় বেনামে সেই বন্ধুটি আমার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখলো, 'প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকযন্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্য বীজ বের করে পুতে দেখা গেছে তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েছে—তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃত স্তূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।' অরুণ সান্যালের রাজনৈতিক মিশ্রিত চরিত্র সেই সাক্ষ্যই দেয়। কালীঘাটের কাউট্স্কী শ্রেণী সংগ্রামের বদলে শ্রেণী সমন্বয়ে বিশ্বাসী। তিনি 'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার-এর কিছুই বোঝেন নি।

নির্বাচনের পর সুবিমল রায় আমাকে অসম্ভব পছন্দ করতে সুরু করলেন। মীনাক্ষী ধরের ডাকাডাকি ছিল নিত্য। শুধু বিশ্বাস করে প্রয়োজনীয় কাজ হাতে দেওয়া নয়—নিতান্তই নিঃস্বার্থ অনাবিল হাসি-ঠাট্টাতেও যোগ দিতে আহ্বান করতেন।

মীনাক্ষী ধর আদতে বড় ঘরের মেয়ে। শিক্ষা-দীক্ষাও নিচু মানের নয়। বাংলার বাইরেই মানুষ। তাই শুধু স্বাস্থ্য নয়, চারিত্রিক গড়ন-পেটন অনেকটা সেই নিয়মেই গড়া।

আমার সবচেয়ে ভাল লাগতো ভদ্রমহিলার ব্যবহার। কোনো সময়ই মনে করতে দিতেন না আমি কোনো দিক দিয়ে ছোট। ছোট কথা বা ক্ষুদ্র স্বার্থ তাঁর নজরেই পড়তো না।

স্বামী হিসাবে মিঃ ধর কতটা সার্থক হয়েছেন জানি না, বরং স্বামী-স্ত্রীর জোড় মেলানোর ব্যবহারিক প্রচলিত ধরন-ধারণ এঁদের জীবনে দেখতাম অনুপস্থিত। তুমি থাক তোমার মতন, আমি

থাকবো আমার মতন। মনে হয় এই রকমের অদৃশ্য এক অনুশাসন মেনে চলতেন দু'জনেই।

দৈনন্দিন জীবনের হাঁটা-চলা দু'জনেরই ছিল ভিন্নমুখী। ঠোকাঠুকির ভয় সেখানে কম। সুবিমল রায়ের আধা-রাজনৈতিক কাণামাছি খেলা আর ব্যবসার হাজারো ছলাকলার সঙ্গে মীনাক্ষী ধরের সম্পর্ক নিবিড়।

শীতে নাড়া খেয়ে বুনোপাখি আসে বিদেশ থেকে। হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। আসে ভলগা আর রাইন পেরিয়ে। তুষারের স্তূপ থেকে ডানা ঝেড়ে আসে আল্পস থেকে। গরমের দেশে এসে নামে। বাংলা দেশেও আসে। 'জু' গার্ডেনের সরোবর ভরে যায়। সুন্দর বনের বনাঞ্চলের জনমানবহীন প্রান্তরেও বেশ কিছু আশ্রয় নেয়। ঋতুর পরিবর্তনে এদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে করতে একদিন হঠাৎ এরা উড়তে সুরু করে আকাশে। হাজার হাজার মাইল পরিক্রমা সুরু হলো নতুন করে।

এই বিদেশী এক চরিষ্ণু বুনো তিতিরের সঙ্গেই যেন তুলনা মেলে মীনাক্ষী ধরের। শীতকাল এঁদের মরশুম। শীতেই এঁরা চঞ্চল। ফাইন-আর্টের গ্যালারীতে একটু বসা, তারপরই উড়ে চললেন পশু-ক্লেশ-নিরোধের আসরে ডানা নাড়তে। গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিরাট ডিনার টেবিলের এক প্রান্তে বসে, লাল ঠোঁটে এটা সেটা থেকে অল্প কিছু ঠুকরে খাওয়া। পরদিন সকালে দমদম। 'বিশ্ব মাতৃসঙ্ঘ'-এর সভানেত্রী আসছেন সদলবলে—সেখানে উপস্থিত থাকতেই হবে। মাঝে মাঝে উড়ে যাওয়াও আছে। বোম্বের তাজমহল হোটেলে 'সুন্দরী নারী—তুমি যেমন ইচ্ছে সাজো'র এক মাড়োয়াড়ী কাপড়ওয়ালার প্রদর্শনী দেখে সন্ধ্যেতেই সান্তাক্রুজ। সেখান থেকে পালাম। রামলীলা ময়দানের আকর্ষণ হয়তো নেই কিন্তু, অশোকা হোটেলের আকর্ষণীয় লীলা-খেলায় উপস্থিত তাঁকে

থাকতেই হবে। বিদেশী এক আলাপীকাকে পূর্ণিমার* তাজ দেখাতে নিয়ে চললেন। মথুরা রোডে লাক্সারি কার DLZ. সে এক মধু বৃন্দাবন।

সময় যায়। পৃথিবী ঘোরে। শীত যায়। মরশুম শেষ হয়ে আসে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জুয়াড়িদের আনাগোনা নেই। হোটেলের মহার্ঘ কামরা সম্পূর্ণ খালি। ইডেন উদ্যানে অস্ট্রেলিয়ান বোলারের পায়ের ছাপ মুছে গেছে বহুদিন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরের 'কানে-কুণ্ডলিয়া' কুয়াশার মতই অপসৃত হয়েছে এতদিনে। বিদেশী নটীদের ঠ্যাং ছোড়াছুড়ি থেমেছে। নিউ এম্পায়ার বিকেলেও ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সুন্দরী ললনাদের প্রদর্শনী শুধু নয়, সর্বভারতীয় কুকুর প্রদর্শনীও শেষ হয়েছে।

পাহাড়ে পাহাড়ে খবর পৌঁছে যায়। টিবেটিয়ন রিফুজি দার্জিলিং আর মুসৌরীর আবহাওয়া দূষিত করেছে। তা হোক—ল্যাণ্ডওয়ারের বাড়িটা রং করতে বলা হয়। ডাউহিলের নির্জনতা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। মীনাক্ষী ধরের দল চললো উড়তে উড়তে। দিল্লী থেকে সিমলা। কসৌলিতে থাকা; স্কাণ্ডেল পয়েণ্টে গত বছরের স্ক্যাণ্ডেল নিয়ে নালদেরার রেস্ট হাউসে বসে হাসাহাসি। কুলু-কাংড়ার নির্জন কোনো স্থানে ট্রউট্ শিকার করতে দেখে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ঠগ্ চীনা জুতোয়ালাকে গুপ্তচর সন্দেহে হোম ডিপার্টমেণ্টে কোন করে অস্থির কাণ্ড বাঁধিয়ে ইংরেজী কাগজে জোরালো চিঠি লেখেন।

বাথ রুমে মিঃ ধরের প্রথম স্ট্রোক হয়। মিসেস ধর তখন ইডেন উদ্যানে। সুবিমল রায় ও এক বিদেশী টুরিস্টকে নিয়ে তখন খেলা দেখছেন। কী ভাবে খবরটা প্রথম অমিয় পালিতের কানে আসে। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা তিনিই করেন। প্রাণে বেঁচে যান, তবে যমরাজ যাবার সময় মিঃ ধরকে মারাত্মক এক ধাক্কা মেরে যান। ডান অঙ্গটা কাজ করে না। দীর্ঘদিন ঐ একভাবেই আছেন।

মীনাক্ষী ধর আজ প্রৌঢ়া। সুবিমল রায় বৃদ্ধই বলা চলে।

মীনাক্ষী ঘর গুছিয়ে নিয়েছেন। সুবিমল রায় আজও অপ্রতিহত। স্বামীজী আজও আছেন। হঠাৎ কখনও উদয় হন। একমাত্র অমিয় পালিত সরে গেছেন। আর আমি সঙ্গে আছি।

দলত্যাগী, কালীঘাটের কাউটস্কী অপবাদ দেবার মত বন্ধুর অভাব নেই দেশে। অমিয় পালিতও আমাকে ভুল বুঝতে পারেন। বলতে পারেন, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, কিছু নেই শুধু বাসনা আছে। আমার স্ত্রীও হয়তো মনে করে আমি সুবিধাবাদী। কিন্তু আমি জানি আমি কী।

প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমি এখন শুধু স্রোতের সঙ্গে ভাসছি।

একটা মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে অধ্যাপক সুপ্রকাশ মৈত্রের ঘরে এলাম। আশঙ্কা দেখি অধ্যাপক মৈত্রেরই কম নয়। বললেন,

—নিমন্ত্রণ করেছে! না গেলে মুশকিল, গেলে আরও মুশকিল। ছাত্রদের ব্যাপার! এ ধরনের সেমিনার আমি যথাসম্ভব এড়াতে চেষ্টা করি। কিন্তু আজ থাকতেই হবে। আপনি পুরো খদ্দর চাপিয়েছেন দেখছি। রুমালটাও সবুজ বর্ডার দেওয়া খদ্দরেরই মনে হচ্ছে। আপনি তো আবার প্রধান অতিথি।

হেসে বলেছি,

—খদ্দরই তো আমি পরি। সাদা খদ্দর ছাড়া আমাকে কিছু পরতে দেখেছেন কোনদিন ?

—খদ্দর এত পাতলা যে দেখলেই বোঝা যায় না। আপনি কোথা থেকে কেনেন ?

—বাজারে অবশ্য পাওয়া যায় না। একজন আমাকে দেয়। আপনিও পেতে পারেন। তবে এত কথা থাকতে কেন খদ্দরের কথা বলছেন, ছাত্ররা চটে যাবে ?

—না, চটবে কেন।

অধ্যাপক মৈত্র একটু অর্থপূর্ণ হাসলেন।

ঘরে অধ্যাপক মৈত্র একা নন। কিছুটা তফাতে দু'জন বিদেশী তরুণ-তরুণী কালো পাথরের বুদ্ধদেবের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলাবলি করছিল। ঘরের অন্যান্য নানা সংগ্রহ ঘুরে ঘুরে দেখছিল।

অধ্যাপক মৈত্রের মুখেই শুনলাম। দু'জনেই ভাস্কর। আসছে পূর্ব জর্মনী থেকে। সেমিনারে এরা আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। হেসে বললেন,

—আসলে ব্যাপারটা তো এদেরই জিনিস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

ফ্যাসিজমের কবর না হলে তো আজকের Struggle against Imperialism হতো না। বলতেই খুব আগ্রহী। বললে, সেমিনারে থাকবে। নিয়ে এলাম। তবে ইংরেজী ভাল জানে না।

পরিচয় হলো। আমার মুখে ফ্রিৎস ক্রেমার, গুস্তাফ জাইৎস ও হ্বাল্ডেমার গ্রিৎসমেক-এর নাম শুনে খুশী। বিশেষ করে ফ্রিৎস ক্রেমার-এর তৈরী বার্ট্রোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌ ও কার্ল মার্কস-এর মূর্তির কথা তুলতে দু'জনে আনন্দে আমার হাতে ঝাঁকুনি দিতে সুরু করলো।

মেয়েটি ইংরেজী অপেক্ষাকৃত ভাল বলে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কথাবার্তায় ধরা পড়ে। সাম্প্রতিক জর্মণ ভাস্কর্য সম্পর্কে উৎসাহী। খুবই সপ্রতিভ। টানাটানা চোখ। দৃষ্টি গভীর। পেটা গড়ন। মাথার চুল সোনালী অগোছালো। সঙ্গের পুরুষ বন্ধুর চেহারায়, পোশাকে-আশাকে একটি বোহেমিয়ান ছাপ। একটা দাঁত সোনায় বাঁধানো। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বহুদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত নিকৃষ্ট ও অশালীন ও রীতি-প্রকরণে জটিল আর দুর্বোধ্য শিল্প ভেঙে পূর্ব জর্মনীর নয়া সমাজ-ব্যবস্থায় জর্মন ভাস্বররা যে মহান শিল্প সৃষ্টিতে অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছেন, মেয়েটি অল্প কথায় সুন্দর বলে গেল।

অধ্যাপক মৈত্র অবশ্য কতটা শিল্প রসিক আমি জানি না। কিন্তু তাঁর মাথায় দেখলাম সেমিনারই ঘুরছে। যেন খানিকটা মরাল সাপোর্ট পেতে চান,

—Imperialism-এর বিরুদ্ধে ও ভিয়েতনাম-এর স্বপক্ষে, মানে মোটামুটি একটা ডেমোক্রাটিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পলিটিক্সের ছাত্র ও অধ্যাপক হিসাবে যথেষ্ট কিছু বলার আছে। আমি বলবোও। কিন্তু কথা কী জানেন, আজকাল য়ুনিভারসিটির ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এমন একটি বিশ্রী পলিটিক্যাল টেম্পারেচার লক্ষ্য করছি যে, সিনসিয়ার সমস্ত প্রেসক্রিপশনই অচল। বলা যায় না, হয়তো মস্কো-পিকিং রিফ্‌ট এসে পড়বে। পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর অধ্যাপক জটু বক্সী সেদিন কফি

হাউসে এক রকম নাজেহাল হয়েছেন। জটু নাকি দালাল। আমাদের সময়ে য়ুনিভারসিটির হাল এমন ছিল না।

—এ্যাঙ্গরি ইয়ং ম্যানদের সঙ্গে পলিটিক্যাল তর্কে না যাওয়াই সমীচীন। আমি অন্তত সব সময়ই এড়িয়ে যাই।

অধ্যাপক মৈত্রের ইঙ্গিতে থামতে হলো। জনাপাঁচেক যুবক ঘরে প্রবেশ করে। ছাত্রই বুঝলাম। আজকের বিশেষ অনুষ্ঠানের উৎসাহী কর্মীবৃন্দ। একজনকে চিনলাম। 'সমন্বয়'-এ আমাকে নিমন্ত্রণ করতে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে এ ছেলেটিও ছিল।

—আপনি এসে গেছেন,—আমাকে দেখে একটু হেসে ছেলেটি এগিয়ে এলো।

সবাই দেখি আমাকে চেনে। লম্বাটে একহারা গড়নের ছেলেটিকেই মনে হলো দলের পাণ্ডা। পরণে ছাই রঙের ভারী খদ্দর। মুখে চে গুয়েভারা দাড়ি। চোখে সেলের চশমা। ঠোঁটে হাসির তিলমাত্র আভাস নেই।

'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল,' দাড়িওয়ালা তরুণ আমার অল্প পরিচিত ছাত্রটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবার হাসলো।

সিগারেট ধরাচ্ছিলাম। ধোঁয়া ছেড়ে চেষ্টাকৃত আগ্রহ প্রকাশ করি

—বল।

—আজকের সেমিনারের সঙ্গে অবশ্য কোনো যোগ নেই। তবে সুযোগ যখন পেলাম বলে রাখি। আপনার ছোট গল্প সংগ্রহে 'ধর্মগোলা' গল্পটা আমরা করবো ঠিক করেছি।

—'ধর্মগোলা'!

—কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে লিখেছিলেন।

—'ধর্মগোলা' গল্পটা তোমরা কী করবে?

—নাটক করবো।

—মুশকিল! নাট্যরূপ দেওয়া কঠিন।

—আমি একটা খাড়া করেছি। মোটামুটি সবার পছন্দ হয়েছে। তবে একবার আপনার শোনা দরকার।

—অনেক কাল আগে লিখেছিলাম। সে এক অন্য অবস্থা ছিল। নাট্যরূপ তুমি কী ভাবে দিয়েছো জানি না; কিন্তু আমার মনে হয় পারস্‌পেকটিভ্‌ আনা খুবই কঠিন। প্রফেশনাল স্টেজ ছাড়া করাও মুশকিল। গল্পটা নাটকে শেষ করছো কোথায়?

—মাঠে। ধান তোলার পুরোটাই দেখাচ্ছি। পুরন্দরের বউ মাঠে ভাত নিয়ে আসছে। পুরন্দর এদিকে খুন হয়ে পড়ে আছে। আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। পার্সপেকটিভের কথা বলছেন, এখানে আমি কিছু মণ্টাজ্‌ ব্যবহার করেছি, তাতে মনে হয় ভালই হবে।

কেন জানি না আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। 'ধর্মগোলা' গল্পটির নাট্যরূপ দেওয়ায় আমি খুশী হইনি। 'ধর্মগোলা' এরা অভিনয় করুক, আমি আদৌ চাই না। সস্তা বামপন্থী তারুণ্যের গাঁজিয়ে-ওঠা বিপ্লবের দৌড় আমার ভালভাবেই জানা আছে। হয়তো পুবন্দরকে তৈরী করেছে একজন জঙ্গী কৃষক নেতা। ঠোঁটে দিয়েছে আগুন-ছেটানো ভাষা। বলা যায় না, দরকার হলে পুরন্দরের ঠোঁটে ভিয়েৎনাম-টিয়েৎনাম দিয়ে দিতে পারে।

অধ্যাপক মৈত্রের মতই আমি নিরুপায়। সেমিনারে আসতে আমিও চাইনি। কিন্তু না এলে আরও ভুল হতো। আমি ছাত্রদের চটাতে চাই না। বরং আমি প্রমাণ করতে চাই, আমার মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আজও অম্লান আছে। আদর্শগত হেরফের থাকবেই। আমি সুবিধাবাদী নই। 'পরোপজীবী আঁচিল' শ্রেণীর ছেদন-যজ্ঞে আমি দরকার হলে জনগণের সঙ্গে থাকবো, এটুকু জানান দিতে চাই বিপ্লবী এই তরুণ-কে।

'ধর্মগালা'-র নাট্যরূপ দেওয়া সম্পর্কে আমার মতামত আমি জানিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি জটু বক্সী নই যে দুম করে কিছু বলে বসবো। প্রসঙ্গটি আমি অন্য কায়দায় এড়াতে চাই,

—অনেকদিন আগের লেখা। হঠাৎ 'ধর্মগোলা' কেন? ভাল মৌলিক নাটক আজকাল হচ্ছে। ব্রেখ্‌ট্‌-এর অনুবাদ হচ্ছে বেশ। আমার নিজের যা ধারণা 'ধর্মগোলা' করা কঠিন। আলোক সম্পাতে খুব পাকা লোক দরকার।

ছেলেটি একটু হাসলো। সে হাসির অর্থ যাই থাক, আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। তবু নিজেকে সংযত করি। নিজের মৌলিক গল্পটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করি,

—'ধর্মগোলা' সম্পর্কে আমি নিজে খুব খুশী নই। অনেক কাল আগের লেখা। খামতিও আছে যথেষ্ট।

—তা আছে। তাছাড়া বিজনবাবুর 'নবান্ন'-র সঙ্গে গল্পের কয়েকটা জায়গায় আশ্চর্য মিল।

সারা দেহে আমার একটা তড়িত প্রবাহ বয়ে গেল। তবু ধৈর্য রাখতে হয়,

—বিজনবাবুর নাটকই কর।

—অনেক লোক দরকার। কেন 'ধর্মগোলা' সম্পর্কে আপনার আপত্তি আছে?

—নাটক না দেখে আমি কিছুই বলতে পারি না।

—নিশ্চয়ই দেখবেন। তবে একটাই স্ক্রীপ্ট্‌। এখনও কপি করানো হয়নি। সেটা হাতছাড়া হ'লে রিহার্সল আটকে যাবে। কপি করানো চলছে। হলেই আপনাকে দিয়ে আসবো। হয়তো সামনের সপ্তাহে।

—যদি আমার নাটক ভাল না লাগে?

—দরকার হলে পাল্টাবো। তবে 'ধর্মগোলা' গল্পের পুরন্দরের বক্তব্যের সঙ্গে আজ যদি আপনার চিন্তাধারার পার্থক্য হয়ে থাকে, আপনি যদি আজ কৃষক আন্দোলনই বিপ্লবী শক্তির অন্যতম চালিকা শক্তি মনে না করেন, তবে অন্য কথা। নাটকটা দেখুন না। আর আলোক সম্পাত সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারনা অন্যরকম।

বক্তব্যই প্রধান। নাটক একটা মাধ্যম। দর্শকের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যায়। সেটা ভাল হওয়া চাই। তবে আলো আর এফেক্ট্, মিউজিক আমি নিতান্তই অপ্রধান মনে করি। দর্শকদের ভোলাবার তাগিদে, নাটকের খামতি ঢাকার প্রয়োজনে আলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু ও ধরনের প্রয়োগে আমি বিশ্বাসী নই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। 'ধর্মগোলা'-র পুরন্দর আমাকে হন্ট্ করে। মৃত পুরন্দরের সামনে শেষ পর্যন্ত সতীকে আপনি পাগল হিসাবে দেখিয়েছেন। আমি ওটা বাদ দিয়েছি।

—বাদ দিলে কেন? মেলোড্রামা মনে হয়েছে?

—সতী শুধু পুরন্দরের বউ নয়—কাকদ্বীপের কৃষক রমণীদেরও প্রতিনিধি। দরকার হলে মেলোড্রামাতেও আপত্তি নেই। লাউড্ একটু হোক না। তবে সতী তার মৃত স্বামীকে ভাত খাওয়াচ্ছে আর একটানা মনোলোগ্, চুল খোলা, পাগল পাগল সতীকে আমি অন্য রকম করেছি।

—খুব জঙ্গী?

—পড়লে আশা করি আপনার ভাল লাগবে।

আমি আর কথা বলবার সুযোগ পেলাম না। শুধু চেষ্টাকৃত হাসি ঠোঁটে টেনে বলি,

—দিও। পড়ে দেখি।

ছাত্রদের ছোট দলটি ঘর থেকে চলে যেতেই অধ্যাপক মৈত্র বললেন,

—চন্দন সেন আপনাকে কী বলছিলো?

—ঐ দাড়িওয়ালা ছেলেটা?

—ওই তো সব। ভাইস চান্সালারের পরই আজকাল য়ুনিভারসিটিতে চন্দন সেন। আপনি জানেন না, আমি চিনি। কী বলে কী?

—আমার ছোটগল্প নাটক করতে চায়।

—আবার নাটক-টাটক করে নাকি!

—সেই রকমই তো মনে হলো।

—ছেলেটা হাইলি কানেকটেড্! বাবা ফরেণ সার্ভিসে বড় কাজ করেন। ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস। অবস্থাও খুব ভাল। কিন্তু য়ুনিভারসিটির দরোয়ানের খাটিয়াতে শুয়ে থাকে। কদাচিৎ ক্লাসে থাকে। কফি হাউসে সর্বক্ষণ পাবেন। স্নান করে না। জামাকাপড় আজই দেখলাম ভদ্র। চব্বিশ ঘণ্টা বিপ্লব করছে। এদের কফি হাউসই ইয়েনান।

অনুষ্ঠান সুরু হলো কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। অনেকেই উপস্থিত। বিশাল হলঘরটি দর্শকে ঠাসা। আবহাওয়া বেশ গরম। জায়গায় জায়গায় জটলা। বাইরের করিডরে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট দল। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এ ধরনের অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের সংখ্যাও আজ অনেক বেশী। হাতে অনেকের বই। কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ কাগজপত্রে ঠাসা।

অধ্যাপক মৈত্রের সঙ্গেই পথ করে সামনে এগিয়ে যাই। সঙ্গে জর্মন ডুই ভাস্কর। বুঝতে পারি অনেকেই আমাকে চিনতে পেরেছে। টুকরো টুকরো বক্তব্য কানে আসে,

—জার্নালিস্ট অরুণ সান্যাল।

—এ্যালকোহলিক্ ফ্যাট।

—শালা রেনিগেড্।

—পারচেসড্! পারচেসড্!!

রাগ হয় না, হাসি পায়। কষ্ট হয় না, দুঃখ লাগে। এরা সুন্দর কিন্তু অবাধ্য। স্বপ্নে নয়, এরা মোহগ্রস্ত। সুন্দর ভবিষ্যৎ এদের সামনে ছিল কিন্তু অদৃশ্য রসাতলই এরা বেছে নিয়েছে।

প্রথম একজন ছাত্রনেতা বক্তৃতা দিল। ছেলেটি মন্দ বললো না। তারপর বিধান সভার একজন কট্টর এ্যাজিটেটর তাঁর বক্তব্য

রাখলেন। সাম্রাজ্যবাদকে বেশ চিনেছেন কিন্তু কলকাতার চলতি ভাষা একটুকু শিখতে পারেননি। অধ্যাপক মৈত্র বললেন তারপর। বক্তব্যে পুরোপুরি মাস্টারী মাস্টারী গন্ধ। ক্রমাগত, সন-তারিখ আর কোটেশন। তাঁর কোন বইতে তিনি কী বলেছেন, সে কথাও বাদ গেল না। তারপর আমার পালা।

বক্তৃতা আমার ভাল আসে না, তবে প্রথম থেকেই আমি খুব জোরালো বক্তব্য সামনে রাখতে চেষ্টা করি। আমার সম্পর্কে বাজারে অহেতুক দুর্ণাম আছে, আমি জানি। আমি প্রতিক্রিয়াশীল কোনো দলের গোপন প্রতিনিধি। লুকিয়ে লুকিয়ে এক বিশেষ জাতের 'সি-সি' মার্কা গাড়িতে চড়ি। প্রগতিশীল কোনো অনুষ্ঠানে আসতে আমার আপত্তি। য়্যারিস্টোক্র্যাট ইনটেলেকচুয়াল ছেনালদের মদের টেবিলের আকর্ষণ আমি পছন্দ করি। আমি দলত্যাগী। প্রাক্তন বন্ধুরা বলে, আমি কালীঘাটের কাউট্‌স্কী।

'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস'-এ আমি আজ ইচ্ছে করেই এসেছি। মিশ্রিত অনুভূতি একটা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে আমার নিজের বক্তব্য রাখবার এ এক সুন্দর জায়গা। তাছাড়া এত বিপুল ছাত্র সমাবেশে নিজেকে প্রকাশ করবার চূড়ান্ত সুযোগ পাওয়া যাবে। আমার সুবিধা হবে তাতে। আমি প্রকৃত মার্ক্সবাদী। বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার আমি ভ্রূক্ষেপ করি না, একথাই আমি জানাতে চাই।

আমি সাম্রাজ্যবাদকে প্রথম থেকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ সুরু করলাম। সাম্রাজ্যবাদ আজ বিশ্বের শান্তিকামী জনগণের একমাত্র শত্রু। বৃহত্তর এই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে নামতে গেলে দেশের সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর সঙ্গে একটা জায়গায় আমাদের একতার দরকার। যে নেতৃত্ব হো চি-মীন ভিয়েতনামে দিয়েছেন বিশ্বে তার তুলনা নেই। আমি বললাম, ফ্যাসিজম মরেছে, সাম্রাজ্যবাদও একদিন তার শক্তি হারাবে। জনগণ তার মহান ইতিহাস রচনা

করবে। তবে বিশ পঁচিশ বছর আগে ফ্যাসিজম-এর প্রস্তুতির সঙ্গে বর্তমান ধনবাদী দুনিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তুলনা করা ভুল হবে। নিউক্লিয়ার ওয়েপন্ এমন ভয়াবহ অপ্রতিহত শক্তি দিয়েছে, তাতে সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল মনে করা অন্যায় হবে। ক্রমাগত আদর্শগত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়াই করতে হবে। সংঘর্ষ যথাসম্ভব এড়াতেই হবে।

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন অল্পবয়সী তরুণ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করলো,

—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহাবস্থান কী সম্ভব ?

—আজ সম্ভব ! কারণ দু'দলই ভয়াবহ শক্তির অধিকারী। সাম্রাজ্যবাদকে আজ নাজী জর্মনীর মত শেষ করে দেওয়া সম্ভব নয়। ইতিহাস সেই কথাই বলে। তাই আদর্শগত লড়াই, গণতান্ত্রিক লড়াই, শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে কোণঠাসা করতে হবে।

শ্রোতাদের মধ্যে একটা জায়গায় হট্টগোল। কেউ কেউ বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করে। কানে আসে না। বিক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে গুঞ্জন সভায় ছড়িয়ে পড়ে। আমি গলার জোর চড়িয়ে দিলাম। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংহত করবার আহ্বান জানাই। প্রসঙ্গক্রমে মস্কো-পিকিং বিরোধ ও ভিয়েতনামে সোভিয়েট অস্ত্র সাহায্যে পিকিং বাধা দেওয়ায় নিদারুণ শঙ্কা প্রকাশ করে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

অধ্যাপক মৈত্রের পরিচিত সেই জর্মন ভাস্কর দু'জন বসেছেন দর্শকদের প্রথম সারিতে। অনেকের সঙ্গে তাঁরাও হাততালি দিচ্ছেন। বুঝলাম আমার আজকে এখানে আসা সার্থক হয়েছে।

আসন গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক মৈত্র বললেন,

—বেশ বলেছেন। শেষটুকু বিনা বাধায় বলতে পারবেন ভাবিনি ! এখানে বড্ড লেফ্‌ট।

অধ্যাপক মৈত্রকে নিঁচু গলায় বলি,

—সাংবাদিকের সততা আমাকে রাখতেই হবে। কারো কারো অপছন্দ হলে আমার কিছু করার নেই।

—বন্ধুগণ, আপনারা দরজা আটকাবেন না। দেওয়ালের দিকে সরে যান। অনেকে বাইরে অপেক্ষা করছেন। আপনারা সহযোগিতা করুন। অনুষ্ঠান ঠিকমত চলতে দিন। কেউ কথা বলবেন না। প্রশ্ন যদি থাকে দয়া করে স্লিপ্ পাঠাবেন। ছাত্রসভার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখুন।

এবার দেখলাম সভা চুপচাপ হলো। পরক্ষণেই আবার ঘোষণা,

—এবার আমাদের এক ছাত্রবন্ধু তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

একজন শ্রোতা চীৎকার করে ওঠে,

—বক্তার নাম জানতে চাই।

অপর একজন সমর্থন জানায়,

—নাম বলুন। নাম শুনতে চাই।

সামনে থেকে সঙ্গে সঙ্গে একজন লাফিয়ে ওঠে,

—বলবেন না। বলবেন না। এখানে বাইরের অনেকে ঢুকে পড়েছে। এদের মধ্যে দালাল আছে।

একটা সোরগোল ওঠে। বিক্ষিপ্ত হাসির ঝলকানী। বহু মানুষের কণ্ঠ পাকিয়ে পাকিয়ে হট্টগোল। শেষ পর্যন্ত নাম বলা হলো না। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে পরক্ষণেই ঘোষিত ছাত্রবন্ধুর আবির্ভাব হলো। প্রথমে আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। অদৃশ্য কঠিন কিছুর প্রচণ্ড আঘাতে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ি। এ যে আমার দাদার ছেলে। ভাইপো। এঞ্জিনীয়ারিং আমিই একে পড়াই। এখন থেকে বাইরে পাঠানোর জন্যে দু-একজনকে বলে-টলে রাখছি। সুতপা একেই জানে খুব ভাল ছেলে। এ যে অমিত।

অমিত কোথা থেকে যেন ধূমকেতুর মত এলো। এতক্ষণ আমার

নজরেই আসেনি। কিন্তু অমিত কী বলবে? Struggle against Imperialism-এর ও কী বোঝে? ও যে জন্ম-ভীরু, অতি কষ্টে গেজেটেড অফিসার ও স্ত্রী-বাধ্য দাদার ছেলে। বৌদির মত নোংরা স্বার্থপর যার মা, সে ভিয়েতনাম সম্পর্কে কী বক্তব্য রাখবে? রাজনীতির অমিত কী বোঝে?

আমি জ্বলছিলাম।

মাইকটা তুলতে হলো। বুঝলাম অমিত আমার চেয়ে লম্বা। বহু মানুষের সামনে দাঁড়ানোর কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নেই। বেশ নির্ভীক। দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাটা দেখে মনে হয় যেন অভ্যাস আছে।

—ত্রিশ বছর আগে হিটলারের জর্মন ঝটিকা-বাহিনী যেদিন ইয়োরোপ গ্রাস করতে চলেছিল, সেদিনের কথা আজ মনে পড়ছে। অনেকেই সেদিন নাজী জর্মনীর অপ্রতিহত শক্তি ও দুর্দমনীয় ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীর সুখ শান্তি সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ইয়োরোপের ছোট ছোট দেশের কথা বাদই দিলাম, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রও নাজী ফৌজের অপ্রতিহত শক্তির সামনে ভেঙে পড়েছে। ফ্যাসিজম কী সোসিয়ালিজমকে পরাজিত করবে? সোসিয়ালিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা কী সাম্রাজ্যবাদী ও ধনবাদী দুনিয়ার সঙ্গে পারবে? রাশিয়া কী জর্মনীর ফ্যাসিস্ট সেনাদের প্রতিহত করতে পারবে? এই প্রশ্ন, এই সন্দেহ তখন দুনিয়ার মেহনতী মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা কী দেখলাম। লেনিনের হাতে তৈরী সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি ও কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বে হিটলার শেষ পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হলো। জর্মন ফ্যাসিজম-এর এই পরাজয় কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা ইতিহাসের বিজয়। শান্তিকামী দুনিয়ার বিজয়। সমাজতন্ত্রবাদের বিজয়। এ বিজয় সোভিয়েট পার্টির, সোভিয়েট জনগণের। এ বিজয় মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিজয়। মহান স্তালিনের নেতৃত্বের বিজয়। এ বিজয় জর্মনীর

জনগণের। ইয়োরোপ ও এশিয়ার ও গোটা দুনিয়ার মুক্তিকামী জনগণের বিজয়। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আজকের এই সভায় সোভিয়েট জনগণের দুঃসাহসিক যুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম স্মরণীয়। লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে রক্তপতাকা উর্ধ্বে তুলে লালফৌজের এই সংগ্রাম আজ অমর। আমরা বীরাঙ্গণা জোয়া ও বীর মাত্রাসোভ-এর কথা ভুলতে পারি না।

অমিত হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে উঁচু পর্দায় সুরু করে,

—কিন্তু বন্ধুগণ, সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া ও বর্তমানে শোধনবাদীরা এই ঐতিহাসিক সত্যকে আজ অস্বীকার করে। ভুল ব্যাখ্যা করে। মহান স্তালিনের দুর্জয় প্রতিরোধ ও ফ্যাসিজম ধ্বংসের পবিত্র সংগ্রামকে তুচ্ছ করবার চেষ্টা করে। বন্ধুগণ, আপনারা বর্তমান শোধনবাদীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে দেখুন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ক্রুশ্চেভের মিতালীর মত যদি স্তালিন ফ্যাসিজম-এর সঙ্গে রফাতে আসতে চেষ্টা করতেন তবে তার পরিণতি কী হতো ?

—ইতিহাস তার নিজের নিয়মে চলে। ফ্যাসিস্ট হিটলার ও শোধনবাদীরা শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় পরাজিত ও হাস্যকর নিষ্ফল শক্তি হিসাবে প্রমাণিত হয়।

—বিশ বছর আজ অতিক্রান্ত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ ফ্যাসিস্ট হিটলারের স্থান দখল করেছে। সে আজ হিটলারের চেয়ে অনেক গুণ শক্তিশালী ও ভয়াবহ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ জর্মনী, জাপান ও ইতালীর ফ্যাসিজম-এর পরিবর্তিত রূপ। মহাদেশ জুড়ে ডলার নৃত্য। উপনিবেশ স্থাপনে অস্থির। মুক্তিকামী দুনিয়ার চোখে দুরন্ত বিভীষিকা। মহাযুদ্ধের পর বিশ বছর ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুধু মারণাস্ত্র বানিয়েছে। নতুন করে বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর তারা চেষ্টা করছে ক্রমাগত। আগে ছিল ফ্যাসিজম মানে যুদ্ধ। আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থ ই হলো যুদ্ধ।

অমিত এবার নজির টানতে সুরু করে,

—The historical experience of the Anti-Fascist War teaches us that, so long as imperialism exists, the socialist countries and all revolutionary people must maintain the highest revolutionary vigilance and make effective preparations against the eventuality that imperialism may suddenly impose a war on us.

—সাম্রাজ্যবাদ যতদিন থাকবে যুদ্ধের ভয় থাকবেই। যতদিন না সমাজতন্ত্রবাদের হাতে সাম্রাজ্যবাদ নির্মূল হয়, ততদিন যুদ্ধের আশঙ্কা চলবেই। সমাজতন্ত্রী কোনো রাষ্ট্র যদি মনে করে, নতুন সমাজ ব্যবস্থায় তারা মুক্ত, সুখী, ভবিষ্যৎ ভয়ের আর আশঙ্কা নেই, তবে সে নিতান্তই ভুল ক'রবে। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সব সময়ই বিপ্লবী কোনো সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সর্বরকম ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে যাবে। সেই বিপ্লবী রাষ্ট্র দুর্বলই হোক আর শক্তিশালীই হোক।

—The principle of the reactionary forces in dealing with the democratic forces of the people is definitely to destroy all they can and to prepare to destroy later whatever they cannot destroy now.

—রাশিয়া ও চীন সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা এই। দেশে দেশে মুক্তিকামী জনগণের বিরুদ্ধে তাঁরা এই নিয়মেই চলে। এই হয়। এই সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র। সাম্রাজ্যবাদ সর্বসময়ই সাম্রাজ্যবাদ। রাতারাতি সে হাত থেকে ছুরি ফেলে দিয়ে গৌতম বুদ্ধ হয়ে যেতে পারে না। শোধনবাদীরা মনে করেন সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমপ্রসারে ও ক্রমবর্ধমান শক্তিতে সাম্রাজ্যবাদ ভীত, সঙ্কুচিত। কিন্তু এ সম্পূর্ণ ভুল। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কমরেড লেনিনের বক্তব্যের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা।

অমিতের কথায় এবার একজন প্রতিবাদ করলো। 'চুপ করুন' 'চুপ করুন' পাল্টা প্রতিবাদে পরক্ষণেই তার কণ্ঠ ডুবে গেল। আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। মনে হচ্ছিল উঠে গিয়ে অমিতের গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে টানতে টানতে হলঘরের বাইরে নিয়ে যাই। অমিত কিন্তু থামছে না,

—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দু'মুখো নীতি চালাচ্ছে। একদিকে যুদ্ধ, অন্যদিকে শান্তি প্রস্তাব। একদিকে আলোচনা চলেছে বিশ্বশান্তির, অপরদিকে ষড়যন্ত্র চলেছে নতুন রণাঙ্গনের স্থান নির্বাচনের।

অমিত এবার কোটেশন দিতে সুরু করে,

—The historical experience of the Anti-Fascist War also teaches us that imperialism is perfidious. Under given conditions, it is permissible for Socialist countries to enter into negotiations and reach certain agreements with imperialist countries. But in no case should they pin their hopes for the defence of world peace on such negotiations and agreements. They must firmly oppose any Munich policy like that of Chamberlain and Daladier.

—এই সাম্রাজ্যবাদের শ্রেণী চরিত্র। সাম্রাজ্যবাদ যখন উপলব্ধি করে আক্রমণে গুরুতর ঝুঁকি আছে, নিঃশ্বাস নেবার সময় দরকার, নইলে বিপর্যয় রোধ করা যাবে না, তখন সে আলোচনায় বসে। শান্তি প্রস্তাব করে। বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বশান্তির জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে। বন্ধুত্ব করতে চায়, ভদ্রলোকের চুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ দেখায়। কিন্তু যখনই সে শক্তি সংহত করে, অবস্থা যখন তার অনুকূলে, সে তখন সব ভুলে যায়। শান্তির সমস্ত রকম চুক্তিপত্র পদদলিত ক'রে শাণিত ছুরিকা নিয়ে সে নতুন উদ্যমে রক্তস্নানের আনন্দে ঝাঁপিয়ে

পড়ে। কথাপ্রসঙ্গে কবিগুরুর কথা আমার মনে এলো। প্রবলের শান্তি-প্রস্তাব সম্পর্কে কবিগুরু বলেছেন—'শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে? ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটি লেজের মতো কিল্‌বিল্‌ করছে তারা শান্তি চায় বটে, কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীর-সর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।' বন্ধুগণ, অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর দু-বছরও যায়নি হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করে।

হিটলার এই করেছিলেন। কিন্তু আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কি এই নিয়মে চলতে পারে? আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শক্তি আজ হিটলারের চেয়ে বহুগুণ তীব্র ও ভয়াবহ। দুর্বলকে ভয় দেখানো, প্রবলকে ভয় পাওয়া সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অন্যতম চরিত্র। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের স্তালিনের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রস্তাব না মেনে 'মিউনিক প্লট'-এর আশ্রয় নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের সর্বনাশ সঁপে দিয়ে ভেবেছিলেন হিটলার শুধু রাশিয়াই আক্রমণ করবে। কিন্তু সেই হিটলার অতর্কিতে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ত্রিশ লক্ষ ফরাসী সেনা দেড় মাসে ছিন্নভিন্ন হলো, গ্রেট ব্রিটেন তার অর্ধেক খোয়ালো। ইংলিস চ্যানেল তাঁকে ফ্রান্স-এর মত দুর্গতি থেকে অবশ্য বাঁচিয়েছে। আজ যাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে-এর মত আর একটা নতুন 'মিউনিক প্লট' তৈরী করে আত্মসান্ত্বনা পান—যে তারা মুক্ত, সাম্রাজ্যবাদের ধারালো নখ থেকে রেহাই পাবেন তাঁরা ভুল করবেন। শুধু ভুল নয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের তাঁরা শত্রু। দুনিয়ার মেহনতী জনগণের, মুক্তিকামী জনগণের তাঁরা দুষমন।

—আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুধু সোসিয়ালিজম ধ্বংস করতে চায় না। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা গ্রাস করাই তার শুধু

কাম্য নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ পশ্চিম ইয়োরোপের ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুনিয়াকে পায়ের তলায় রাখার পাশবিক এই ক্ষুধার বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ একটা জায়গায় একমত। U. S. plans for aggression and war can be frustrated and defeated, provided that we are gocd at uniting the socialist camp and the people's anti-imperialist forces in all countries as well as at making use cf the contradictions within the capitalist camp and forming the broadest possible united front against U. S imperialism.

—যুদ্ধে অস্ত্রই শুধু বড় কথা নয়। বন্ধুগণ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুর্ধর্ষ শক্তি সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। কিন্তু সামরিক শক্তিই বড় কথা নয়। জর্মন আর্মির অপ্রতিহত শক্তি সম্পর্কে গোয়েবেলস-এর myth আমরা জানি। ভয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইয়োরোপের কোনো কোনো ধনবাদী রাষ্ট্র আক্রান্ত হবার আগেই আত্মসমর্পণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করবার পর আমরা কী অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম? রাশিয়ার সামরিক প্রস্তুতি কী নাজী জর্মনীর চেয়ে উচ্চমানের ছিল? মোটেই নয়। জনগণই শক্তির উৎস। স্তালিনের মত নেতৃত্ব সে সাফল্যের অন্যতম কারণ।

—Weapons are an important factor in war but not the decisive factor, and that people and not things are the fundamental factor determining the outcome of war.

—শোধনবাদী খ্রুশ্চেভ বলেন, হিটলার যদি যুদ্ধ পরিণতির কথা আন্দাজ করতে পারতো, তবে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ

সে করতো না। এ এক আশ্চর্য যুক্তি! শ্রেণী স্বার্থ ই সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে বাধ্য করে। মুনাফার জন্যে উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদ। তার অস্থির চিত্ত। বাস্তব অবস্থা কোনো সময়ই উপলব্ধি করতে পারে না। সে অন্ধ দানব। জনগণের শক্তিকে মূল্যায়ণে অক্ষম। সাম্রাজ্যবাদ তাই ভুল সময়ে, ভুল জায়গায়, ভুল যুদ্ধ করে। ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। নেপোলিয়ন ইয়োরোপ ও সমগ্র দুনিয়া জয় করতে চেয়েছিলেন—পারেন নি। কাইজার উইলহেম তাই চেয়েছিলেন—পারেন নি। হিটলার পৃথিবী গ্রাস করতে চেয়েছেন—ব্যর্থ হয়েছেন। আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হিটলারের সেই শূন্য স্থান দখল করেছে। ইতিহাস থেকে এরা কিছুই শেখে না। শুধু এক উত্তরসূরী তার পূর্বসূরীর কবর থেকে যাত্রা করে নিজের সমাধি রচনা করে।

অমিত আবেগের সঙ্গে তার বক্তব্য রাখছিল। এমন সময় শ্রোতাদের মধ্যে গোলমাল দেখা দিল। একজন চীৎকার করে উঠে দাঁড়ালো,

—ভিয়েতনাম সম্পর্কে বলুন।

অপর একজন মন্তব্য করে,

—আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাই না। জ্ঞান দেবেন না।

প্রথম সারি থেকে একজন উঠে দাঁড়ায়,

—ভিয়েতনামে সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছোতে চীন বাধা দিচ্ছে। সে সম্পর্কে বলুন।

অমিত এবার দেখলাম একটু মুশকিলে পড়েছে। একটু থামলো। তারপর আবার সুরু করলো,

—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রাম ধ্বংস করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। হারে, মার খায় কিন্তু নতুন করে রণাঙ্গন সে সৃষ্টি করবে। কঙ্গো, লাওস, কোরিয়া, ইন্দোনেশীয়া, কম্বোডিয়া, জাপান, কিউবা, ভেনেজুয়ালা, ও ল্যাতিন আমেরিকার আরও অন্যান্য দেশে সে মুক্তিকামী জনগণের বিরুদ্ধে পৈশাচিক অত্যাচারে লিপ্ত।

আজকের ভিয়েতনামের লড়াই দুনিয়ার মুক্তিকামী জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক। মহান জনগণের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্ফল যুদ্ধের অন্যতম নিদর্শন। জনগণই শক্তির উৎস—অস্ত্র-শস্ত্র নয়। বিপ্লবী শক্তিই আসল শক্তি—মারণাস্ত্র নয়। ভিয়েতনামে আজ সেই ঐতিহাসিক সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। কমরেড মাও ৎসে-তুং বলেন,

—U. S. imperialism is only a paper tiger. The strength of the United States of America is only superficial and transient. Irreconcilable domestic and international contradictions, like a volcano, menace U. S. imperialism every day. U. S. imperialism is sitting on this volcano.

এবার গণ্ডগোল সুরু হলো। পূর্বের সেই শ্রোতা আবার দাবী করলো,

—ভিয়েতনামে সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছোতে চীন বাধা দিচ্ছে কেন?

অমিত এবার আরও জোরে চীৎকার করে ওঠে,

—বন্ধুগণ, আমাকে আমার বক্তব্য রাখতে দিন।

—ভিয়েতনামে সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছোতে চীন বাধা দিচ্ছে কেন? চেপে যাচ্ছেন কেন? বলুন।

অনেকে এবার একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠে, 'বলুন,' 'বলুন' 'আমরা শুনতে চাই।'

মনে হলো অমিত এবার বেশ গোলমালে পড়ে গেছে। দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নিয়ে খুব স্বাভাবিক দৃঢ় ও স্থির কণ্ঠে বলে,

—এ অভিযোগ আজকাল শোনা যাচ্ছে। প্রচারের যুগ। বিজ্ঞাপনের দেশ সব। অভিযোগ আমি শুনেছি। সোভিয়েট রাশিয়া

ভিয়েতনামকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যের চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভিয়েতনামে সেই সামরিক রসদ পৌঁছোতে চীন তার 'কমন-বাউণ্ডারী' ব্যবহার করতে দেয়নি। এ অভিযোগ আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি না। তবে তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এ অভিযোগ সত্যি। চীন 'কমন-বাউণ্ডারী' ব্যবহার করতে দেয়নি। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্ব যদি সত্যিই এই সাহায্য পাঠাতে চায়, তবে বাধাটা কোথায় বুঝি না। কিউবাতে খ্রুশ্চেভ যখন ক্ষেপণাস্ত্র বসিয়েছিলেন তখন তারা কী 'কমন বাউণ্ডারী' পেয়েছিলেন? এশিয়ার কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রে সোভিয়েট রাশিয়ার অস্ত্রসম্ভার পৌঁছোতে কী 'কমন-বাউণ্ডারী' পাওয়া যাচ্ছে? আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে কী সোভিয়েট রাশিয়ার 'কমন-বাউণ্ডারী' আছে? বিমান ও স্থল পথ যদি ব্যবহারে বাধা থাকে—নদী পথ সর্বসময়ই মুক্ত। সুতরাং এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ও কাউট্‌স্কীর জারজ সন্তানদের কষ্টকল্পিত অপব্যাখ্যা।

—বাংলা দেশে মাও ৎসে-তুং চলবে না।

হঠাৎ প্রচণ্ড গোলমাল সুরু হলো। লোকে আসন ছেড়ে উঠছে। একদল আর একদলের সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দেয়।

এবার শ্লোগান সুরু হলো,

—বাংলা দেশে মাও ৎসে-তুং চলবে না! চলবে না!

—বাংলা দেশে মাও ৎসে-তুং চলবে না! চলবে না!

এবার ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হয়। সবাই ছাত্র। অমিত একটানা চীৎকার করে চলে,

—বন্ধুগণ, আপনারা শান্ত হোন। বন্ধুগণ!

কিন্তু কে কার কথা শোনে। গোলমাল বাড়তে থাকে। অধ্যাপক মৈত্র হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বলেন,

—এই ভয়ই করেছিলাম। চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি। পরে গোলমালে পড়ে যাব।

অধ্যাপক মৈত্রের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে একটা বিস্ফোরণ হলো। আমি লাফিয়ে উঠি। পটকা বা ছোট জাতের বোমাই হবে। ফাটলো ডায়াসের সামনে। ঠাসা মানুষে পূর্ণ হলঘর। সে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। ধোঁয়ার কুণ্ডলী সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ধ্বস্তাধ্বস্তি এখন মারামারিতে পৌঁচেছে। চীৎকার, চেঁচামেচি আর হলঘর ছেড়ে বেরুনোর প্রাণপণ চেষ্টা।

অধ্যাপক মৈত্র বেশ ভয় পেয়েছেন। ভয় আমারও হচ্ছিল। নিমন্ত্রিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তাদের অনেকেই দেখি কেটে পড়েছেন। পরিচিত দুই জর্মন ভাস্কর অসহায়ের মত আমাদের কাছে এসে হাজির।

বুঝলাম অবস্থা ক্রমে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ গোলমাল থামবে না। রাস্তায় নামবে। কফি হাউসে ছড়াবে। অধ্যাপক মৈত্র আমার হাত চেপে ধরে বলেন,

—আমি এই জন্যে এদের এখানে আসতে চাইনি।

প্রচণ্ড গোলমাল চলতে থাকে। ধারেকাছে আবার একটা পটকা পড়লো। এবার চেয়ার ছোড়াছুড়ি সুরু হয়েছে। মেয়েরা একদিকে সরে গেছে। সবাই যেন ক্ষেপে গেছে। জুতো, বইপত্র বিক্ষিপ্ত।

হঠাৎ পেছন থেকে সেই ছেলেটা এলো। 'ধর্মগোলা' গল্পের নাট্যরূপ যার দেওয়া। ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস। য়ুনিভার্সিটির দরোয়ানের খাটিয়াকে যে করেছে শয্যা। চব্বিশ ঘণ্টা যে বিপ্লব করে। কফি হাউস যার কাছে ইয়েনানের গুহা। সেই চে গুয়েভারা দাড়িওয়ালা চন্দন সেন। সোজা অমিতের কাছে চলে গেল। কী যেন বলাবলি করে। তারপর অমিতকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এলো।

চন্দন সেন বলে,

—কোনো ভয় নেই। একটা দালাল গ্রুপ ঢুকে পড়েছে। তাছাড়া ছাত্রদের মধ্যে একটা দল আমাদের বিরোধী। আপনাদের পেছনের দরজা দিয়ে বার করে দিচ্ছি। আসুন।

অমিত আজ আমাকে দেখে এতটুক ভয় পেল না। একটু হাসলো,

—ছোটকা তোমরা চন্দনের সঙ্গে যাও। তোমাদের কোনো ভয় নেই।

কেন যেন মুহূর্তের জন্যে অমিতের জন্যে আমি ব্যস্ত হলাম,

—তুমি! তুমিও এস।

—পরে আসছি।

চন্দন সেন পেছনের একটা চোরা রাস্তা দিয়ে আমাদের বার করে দিল। আমরা নিমন্ত্রিত পাঁচজন। সেই সঙ্গে জর্মন তুই ভাস্কর।

হলঘর থেকে বেরিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু বিক্ষিপ্ত দৌড়াদৌড়ি, চীৎকার আর চেঁচামেচি ভেসে আসছে।

রাস্তায় নেমে সে এক দৃশ্য। অগণিত ছাত্র। ওপরের গোলমাল যেন আমাদের সঙ্গে রাস্তায় নেমেছে। ট্রাম-বাস বন্ধ। বই-এর দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে। ইট আর কাঁচ ভাঙ্গা। মনে হলো এখানেও একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে।

—এখানে একটা বড় রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

চন্দন সেন একটুকরো হাসলো,

—অনেক চেষ্টা করেও সংঘর্ষ এড়ানো যায়নি। তবে ওপরের গোলমাল অনেক পরে সুরু হয়েছে।

আমি আমার গাড়ির জন্যে ব্যস্ত ছিলাম। একটু তফাতেই রেখেছিলাম। দেখলাম ঠিকই আছে। কেউ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়নি। অধ্যাপক মৈত্রকে বলি, ঠাসাঠাসি করে হয়ে যাবে। অন্তত ছাত্রদের এই রণাঙ্গণ থেকে এখনই আমাদের সরে পড়া দরকার।

—'কালকের কাগজে বেশ জোরালো কিছু লিখুন তো,' গাড়িতে জুত হয়ে বসে অধ্যাপক মৈত্র সোয়াস্তির নিঃশ্বাস নিলেন।

বেশ একটা থমথমে ভাব। অনেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট জনশূন্য। হ্যারিসন রোডের যানবাহন অবশ্য আছে।

বাঁক নেবার সময় নজরে পড়লো। সোডার পেটি বাঁচিয়ে একটা হিন্দুস্থানী ক্ষিপ্র গতিতে ছুটছে।

পত্রিকা অফিসে যাওয়াই স্থির করলাম। 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস' বাম-ছাত্ররা যে কী ভাবে বানচাল করে দিল, তার ওপর জোরালো কিছু আজ লিখতেই হবে।

পর পর দু'বার বেল বাজলো। আমি ঘরে একা। দাড়ি কামাচ্ছিলাম। ব্রাসটা হাতে নিয়েই এগিয়ে গেলাম। দরজার একমুখো পাল্লা খুলে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো সুবেশা এক তরুণী। চিনলাম না। মনে হলো সুতপার কাছে এসেছে। দু'পা পিছিয়ে ভেতরে আহ্বান করলাম।

—কাকে চাইছেন ?

—বাড়িতে মেয়েরা আছেন ?

—এখন তো কেউ নেই। অবশ্য আমার স্ত্রী এখনই এসে পড়বে। আপনি কোথা থেকে আসছেন ? সে রকম হলে আমাকেও বলতে পারেন।

মেয়েটির প্রথমটায় একটু সঙ্কোচ লক্ষ্য করি। কিন্তু পরক্ষণেই সেটুকু কাটিয়ে উঠে বলে,

—ব্যবহারের জন্যে নিশ্চয়ই আপনারা সাবান কেনেন। সাবান আমাদের নানা কাজেই লেগে থাকে। আমাদের সাবান—আমাদের কোম্পানীর সাবানের বিশেষ গুণ তাই হাতে কলমে দেখিয়ে দেব। ভাল সাবানের বড় গুণ হলো....

পুরোপুরি সেলস্-টক। একটু গুটিয়ে গেলাম। আমারই ভুল হয়েছে। একদম আন্দাজ করতে পারিনি। হাতে ব্রাস, গালে সাবান শুকচ্ছে। তরুণী মিষ্টি হেসে হাতের বড় ব্যাগ থেকে কয়েকটি রঙিন কাগজ টেনে বার করে। আমি বিব্রত বোধ করি,

—আপনি একটু বসুন। আমার স্ত্রী পাশের কোনো ফ্ল্যাটে গেছে। এখনই এসে পড়বে। আপনি আমার স্ত্রীর সঙ্গেই কথা বলুন।

তরুণী কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মন্তব্য করে,

—আপনি অরুণ সান্যাল, আচ্ছা অরুণদা না? আপনি তো বিনয় সেনকে চেনেন?

আমি হতবাক হয়ে পড়ি! বিস্ময়োক্তি ঝরে পড়ে ঠোঁট থেকে,

—কিন্তু তোমাকে তো আমি····!

—আমি গৌরী! আপনি আমাকে অনেক ছোট দেখেছেন।

—তুমি বিনয় সেনের····

কথা কেড়ে নিয়ে গৌরী বলে,

—বিনয় সেন আমার দাদা। এক সময় আপনি আমাদের বাড়ি খুব আসতেন। রমেশ মিত্তির রোডের বাড়িতে। আপনার মনে নেই?

—তুমি বিনয়ের বোন।

খুশীর হাসি গৌরীর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। শুকনো, চওড়া বেণীটার ডগার রবারের গিঁটটা ঠিক করতে করতে বলে,

—তা অনেক দিন হলো। দশ-বার বছর হবে। সন্দেহ আমার প্রথমেই হয়েছে। কিন্তু দাড়ি কামানোর সাবানের জন্যে নিশ্চিত হতে পারিনি।

—কি কাণ্ড গৌরী, তুমি এত বড় হয়ে গেছ। তোমাকে কতটুকু দেখেছি। এখন একদম দস্তুরমত লেডী।

—আপনারও তো কানের পাশে চুল পাকছে।

—তাই তো, তোমাকে দস্তুর মত ভদ্রমহিলা হিসাবে দেখে নিজের বয়েস সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ছি। তোমরা যদি এ রেটে বেড়ে ওঠো, আমরা দাঁড়াই কোথায়? এস ভেতরে এস। বিনয় কেমন আছে?

করিডোর অতিক্রম করে গৌরী ঘরে এলো। কার্পেটের ওপর জুতো তুলবে কি না ভাবছিল। সোফা দেখিয়ে বসতে বললাম। গৌরীকে বেশ লাগছিল। দেহশ্রীতে একটা ঝাঁজ আছে। যৌবনের একটা উত্তাপ আছে।

—বস। বিনয় কেমন আছে?

—দাদা ভাল নেই। শরীরটাই খুব খারাপ। মাঝে খুব ভুগলেন এখন একটু ভাল।

—আজকাল এই কাজ করছো ?

—অগত্যা। কিছু তো একটা করতে হবে। তা আমার মন্দ লাগছে না।

—কতদিন এ কাজ করছো ?

—মাস পাঁচেক।

—খুব ঘুরতে হয় ?

—তা হয়।

—তোমার ওপরে যে ভাই ছিল, কি নাম যেন ?

—বাদল। আপনি ছোড়দার কথা বলছেন ?

—মনে পড়েছে, বাদল। বাদল কি করছে আজকাল। কাজ-কর্ম করছে নিশ্চয়ই।

গৌরীর সহজ সাবলীল কণ্ঠ যেন বাধা পায়,

—ছোড়দা ভাল কাজই করছে। দুর্গাপুরে আছে। তবে চিরদিনই ছোড়দা একটু অন্যরকম। ছোড়দা যদি একটু দেখতো-শুনতো।....

—টাকা-পয়সা দেয় না সংসারে ? বিয়ে করেছে ?

—বিয়ে করেছে। বৌদি দুর্গাপুরে।

—বাদল যখন সেখানে থাকে তার বৌকে তো থাকতেই হবে।

—কলকাতা থাকতেই ছোড়দা অন্যত্র থাকতেন। ছোড়দা যদি একটু....

—বৌ দজ্জাল বুঝি ?

—বৌয়ের দোষ দেন কেন ? সে পরের মেয়ে। আমাদের তার ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু ছোড়দাই বেশী স্বার্থপর। দাদা ছোড়দার জন্যে কি না করেছেন। দিদি ওকে পড়িয়েছে। কিন্তু দিদিকেই গ্রাহ্য করে না। জর্মনী থেকে ফিরে ভয়ঙ্কর সাহেব হয়ে গেল। যাক, কি সব বাজে কথা বলছি।

—বিনয়ের অসুখ বলছিলে। কি হয়েছে কি?

—এতদিন তো পালিয়ে পালিয়ে থেকেছেন। জেল থেকে কিছুদিন ছাড়া পেয়েছেন। কিছুদিন এখন বাড়ি আছেন। পেটে কিছু সহ্য হয় না। ডাক্তার নিয়মে থাকতে বলেছেন। প্রোটিন ফুড ডাক্তার খেতে বলেন। তবে দাদার নিয়মে থাকা বুঝতেই পারেন। অবশ্য দিদির ভয়ে আজকাল খুব একটা গোলমাল করতে পারেন না।

—কাজকর্ম কিছু করছে বিনয়?

—জেল থেকে বেরিয়ে হালতুতে মাস্টারী নিয়েছিলেন। কিন্তু শরীরে কুলিয়ে উঠতে পারেন নি। অন্য আর কি কাজ এ বয়সে করবেন?

—কেন, বিনয় যদি কিছু না ক'রে শুধু রুশ ভাষার ক্লাস নেয়, তাহলেও অনেক রোজগার।

আমার কথায় গৌরী শুধু একটুকরো হাসলো। তারপর এক-লহমা তাকিয়ে নিয়ে বলে,

—দাদাকে তো আপনি ভালই চেনেন। মাঝে ল্যাঙগোয়েজ ক্লাস সুরু করেছিলেন। ছাত্রও হয়েছিল। কিন্তু সবাই চেনাশোনা। পার্টির ছেলে-মেয়ে। ক্লাস করেছিলেন, কিন্তু টাকা নিতে পারেন নি। তারপর হঠাৎ যুদ্ধ সুরু হলো। দাদা পালালেন। রুগ্ন স্বাস্থ্য চিরদিনই। জেলে শরীরটা আরও ভেঙে গেছে।

—সত্যিই বিনয়ের জন্য দুঃখ হয়। আজকাল একদম যোগাযোগ নেই। অনেক দিন দেখা হয়নি। চীনা আক্রমণের আগে একবার কলেজ স্ট্রীটে দেখা হয়েছিল। বিনয় একটা প্রতিভা। নিজেকে নষ্ট করলো। দিল্লীতে কত বড় একটা চাকরির অফার পেয়েছিল —নিল না।

দিদির হয়েছে মুশকিল।

—উমা আজকাল কি করছে?

—স্কুলের কাজ। বুড়ো বয়সে দিদি আবার ইকনমিক্স-এ

এম এ দিচ্ছে। অতগুলো এম-এ পাস করে যে কি হবে বুঝি না বাবা।

উমার কথা আমার আরও জানতে ইচ্ছে হলো। বললাম,

—আবার পরীক্ষা দিচ্ছে বুঝি?

—বেচারা কি আর করবে। আচ্ছা অরুণদা, বাড়িতে বসা কাজ দাদাকে দিতে পারেন না? আপনি তো এখন খুব নামকরা লোক। আজকাল রুশ সাহিত্য বাংলায় খুব অনুবাদ হচ্ছে। কত কি বেরুচ্ছে। তাও যদি না হয়, বাংলা থেকে রুশ ভাষায় দাদা নিশ্চয়ই অনুবাদ করতে পারেন।

—বিনয় কি তা করবে?

—আজ নিশ্চয়ই করবেন। আপনি একটু চেষ্টা করবেন তো। বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিদির ঘাড়ে—মানসিক এই দুশ্চিন্তা থেকে অন্তত দাদাকে আংশিক মুক্ত করতে পারলেও মনে হয় দাদার শরীর কিছুটা ভাল হতো।

—চেষ্টা করতে পারি। বিনয়ের পক্ষে অনুবাদের কাজ পাওয়া খুব একটা বড় কথাও নয়। বিনয়ের মত রুশ জানা লোক কলকাতায় হাতে গোণা যায়। আজকাল হাজারো ডেলিগেশন, ইনটারপ্রেটার-এর কাজ করতে চাইলে বিনয়কে তো লুফে নেবে। কিন্তু বিনয়কে ত আমি জানি। কাজ নেবে কি?

—নিশ্চয়ই নেবেন। বাড়ি বসে কাজ করতে নিশ্চয়ই রাজী হবেন। পারবেনও। ঘোরাঘুরি, নিয়মিত অফিস অবশ্য অসম্ভব। আপনি একটু দেখুন না। আপনার তো সবার সঙ্গেই খাতির।

—বিনয়ের জন্যে যদি কিছু করতে পারি আমি খুব খুশী হব। নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।

—আসুন না একদিন। কতদিন গেছেন। এখন কি একদম সময় পান না?

—যাব। নিশ্চয়ই যাব। সেই পূর্ণ থিয়েটারের পাশ দিয়ে যেতে হয়। সামনে একটা খোলা জায়গা।

গৌরী হাত নেড়ে হেসে বললো,

—খোলা মাঠ আর এখন নেই। ওখানে একটা বিরাট বাড়ি উঠেছে। ঐ বাড়িটার জন্যে আমাদের বাড়িটায় আজকাল একদম রদ্দুর আসে না। বড়ি দিতে পারেন না, তাই মায়ের খুব রাগ।

—মাসিমা কেমন আছেন ?

—ভালই ছিলেন, তবে ছোড়দার ব্যাপার স্যাপারে খুব মর্মাহত। ছোড়দাকে জর্মনী পাঠানোর সময় প্যাসেঞ্জ-মানি-র জন্যে মা গহনা ভেঙেছিলেন। সেই ছোড়দা মত্ত অবস্থায় রাত্রে চেঁচাতে থাকে 'সংসার আমার জন্যে কিস্স্যু করেনি। আমার কাছে শুধু টাকা চায়'। মা কষ্ট পেয়েছেন। মা'র আর একটা ধারণা, ঐ গহনাগুলো থাকলে দিদির এতদিন বিয়ে হতো। আমি আর দিদি খুব হাসি।

গৌরী অল্প সময়ে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। খুব সপ্রতিভ। কথাবার্তায় এতটুকু সঙ্কোচ নেই। দুরন্ত ভাঙ্গচোরের পর শরীরের সুন্দর পূর্ণতা এসেছে, কিন্তু কিশোরীর চাপলটুকু আমার ভাল লাগলো বেশী।

—দিদির সঙ্গে মারামারি কর না ?

—তাই করেছি বুঝি ?

—আমি ঠেকিয়েছি। দিদির শাড়ী ছিঁড়ে এনেছিলে একদিন।

গৌরী একটু ম্লান হাসলো। ধীর কণ্ঠে বলে,

—দিদি আজকাল রঙিন শাড়ি পরেই না। আসুন না একদিন। দাদার অনুবাদের কাজ কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন।

—নিশ্চয়ই করবো।

—আমি যোগাযোগ রাখবো।

—বেশ তো।

—আপনার গালের সাবান সমস্ত শুকিয়ে গেল। আচ্ছা অরুণদা, সুবিধে যখন পেলাম, আপনার এখান থেকে একটি ফোন করবো ?

—কর না। পাশেই যেন কোথায় গেল, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতাম। সুতপার এসে পড়া উচিত। তুমি ফোন কর। চা খাবে ?

—চা খাই না।

—কিছু একটা খাও।

—দরকার নেই।

—রদ্দুরে রদ্দুরে ঘুরবে, তুমি বরং একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস্ খাও !

গৌরী হেসে মাথা নাড়লো।

বাড়িতে কেউ নেই। গোপাল বাজারে গেছে। ফ্রিজ থেকে একটা কোকাকোলা গ্লাসে ঢেলে আনি। গৌরী দেখলাম টেলিফোনের ডাইরেক্টরী হাতড়াচ্ছে। হেসে ফেললাম,

—গৌরী তুমি ভুল করেছো। ওটা দিল্লীর !

গ্লাসটা গৌরীর হাতে তুলে দিয়ে অপর টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা টেনে আনলাম। বিস্মিত গৌরীর ঠোঁটে মজার হাসি ভেঙে পড়ে,

—আমি তো বোকার মত ওটাই হাতড়াচ্ছি। আপনাকে দিল্লীর সঙ্গে খুব কথা বলতে হয় বুঝি।

—তা হয়। তা হয়। পত্রিকার নানা দরকারে লাগে।

গৌরী লাইন পেয়েছে। দরজায় বেল বাজলো। সুতপা হয় তো এলো।

সুতপাই। রৌদ্রে তেতে মুখটা লাল হয়েছে। ঘাম জমেছে কপালে।

—এই দেখো কে এসেছে !

ফোন করা হয়তো শেষ হয়েছিল গৌরীর। উঠে দাঁড়িয়েছে। সুতপার কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম,

—আমার বন্ধু বিনয় সেনের বোন গৌরী। আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি। কতটুকু দেখেছি। এখন দস্তুর মত লেডী।

কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে গৌরী,

—আপনি আমাকে এতটুকু দেখেন নি অরুণদা। তখন আমি বেশ বড় ছিলাম।

—ফ্রক পরা এতটুকু মেয়ে। ছাতে তেঁতুলের আচার লুকিয়ে খেতে। আমার সব মনে আছে।

'বৌদিকে সব বলে দিচ্ছেন', কপট বিস্ময়ের সঙ্গে গৌরীর প্রাণোচ্ছল হাসি।

গৌরীর আবির্ভাবের কথা সুতপাকে জানালাম।

—উঠলে কেন? ব'স।

—আজ আর ব'সবো না বৌদি। অনেকক্ষণ এসেছি। আপনাদের পাশের ফ্ল্যাটে বুঝি সাহেব থাকেন। বাইরে কিন্তু নেমপ্লেট দেখলাম—গাঙ্গুলী। মেমসাহেব দেখে তো আমার হয়ে গেছে। নাকি সুরে ইংরেজীতে কি যেন বললেন, বুঝলামই না! দে ছুট। বাব্বা কোথায় থাকেন আপনারা। একতলায় কুকুর, দোতলায় ইংরেজীর ভয়।

সুতপার দেখলাম গৌরীকে ভাল লাগছে। হেসে বললো,

—বুঝেছি, কেষ্ট গাঙ্গুলীর বৌয়ের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে। কেষ্টবাবুর ফরাসী স্ত্রী। ইংরেজী হয়তো তোমার চেয়েও তিনি কম জানেন।

গৌরী আর বসলো না।

—বৌদি আর একদিন আসবো। অনেকক্ষণ এখানে গেল। আমার মাদ্রাজী বস্ আবার জীপ নিয়ে মাঝে মাঝে টহল দেন। দেখেন আমরা কাজ করছি কি না। এই জোনে এখন বেশ কিছুদিন থাকছি।

—আর একদিন এস। আমার সঙ্গে তো কথাই হলো না।

—নিশ্চয়ই আসবো।

গৌরী চলে গেল। সুতপা গৌরীকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ঘড়ির চেহারা দেখে বিনা বাক্যব্যয়ে দাড়ি কামাতে চলে গেলাম।

—বেশ মেয়েটি। খুব সরল। এখন দাড়ি কামাচ্ছো, বেরুকে নাকি?

—এয়ার পোর্টে যেতে হবে। আজ আমি সারাদিন ব্যস্ত থাকবো। একটা ডেলিগেশনের সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে। রাত্রে খাব না। গাড়ি রেখে যাচ্ছি। আমাকে অন্য গাড়ি নিতে আসবে।

—কিসের ডেলিগেশন?

—ইউ. এন. ও.-র একটা মিশন। জাকার্তা যাবে। এখানে থাকবে একদিন। জাকার্তার এক ব্রিগেডিয়ার দলের সঙ্গে আছেন শুনলাম। আমার ঐ লোকটাকেই বেশী দরকার। আয়দিত সম্পর্কে যা উল্টোপাল্টা শুনছি। ইন্দোনেশীয়া সম্পর্কে কাগজে তুমি তো কিছু পাবে না।

—আয়দিত তো চীনে পালিয়ে গেছেন শুনেছিলাম।

—বাজে কথা। কিন্তু জাভাতে আয়দিতকে খুন করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। জাকার্তার ঐ ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে একটু ভাব জমাতে হবে।

গোপাল বাজার থেকে এলো। সুতপা অপ্রচুর গ্যাস সরবরাহের কথা জানিয়ে রসুইখানায় চলে গেল।

আমি কিন্তু বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। গৌরীর কথা আমার বারবার মনে পড়ছিল। গৌরীর প্রসঙ্গ ধরে অপর একটি মুখ যেন প্রতিফলিত আমার চেহারার ওপর বারবার এসে পড়ছিল। সে উমা। বিনয়ের ছোট বোন, গৌরীর দিদি—উমা।

অনেক কথাই আজ মনে পড়ে। অনেক দিন আগেকার কথা। সবে 'সমন্বয়'-এ ঢুকেছি। নিখিল রায়ের বাড়িতে আমি তখন পেইং গেস্ট্। বিনয়রা নিখিলেরই আত্মীয়। আমাদের কমন ফ্রেণ্ড। বকুল

বাগানের আস্তানা ছিল ওর তখন। উমা নিখিলের বাড়ি থেকে কয়েক মাস বি টি. পড়তো।

বেশ বুঝতাম নিখিলের স্ত্রী উমাকে পছন্দ করে না। অতিশয় কৃপণ মহিলা। ভদ্রমহিলা টাকা রোজগার করতেন না, কিন্তু টাকার ওপর অদ্ভুত মোহ। নিখিল আমার বন্ধু। প্রথমটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে নি। তবে অল্প দিনেই বুঝলাম, অনেকগুলো টাকা দিয়ে থাকি, তাই যেটুকু খাতির। কোনো কোনো দিন বাড়িতে না খেলে খুব খুশী হতে দেখতাম। 'সমন্বয়' থেকে যে সিনেমারই পাস আনি, ভদ্রমহিলা সবগুলো দেখতেন। শুধু তাই নয়, নিখিলের অনুপস্থিতিতে অনেক সময় হঠাৎ হঠাৎ ভদ্রমহিলার দু'দশ টাকার দরকার পড়তো। কোন দিনই ফেরত দেন নি।

উমার প্রতি আমার প্রচ্ছন্ন একটু সহানুভূতি নিখিলের চতুর স্ত্রী আন্দাজ করে সস্তা হাসি-ঠাট্টা করতেন। আমার একদম ভাল লাগতো না। নিখিলের জন্যে খারাপ লাগতো। নিখিল শিক্ষিত, এক সঙ্গে পার্টি করেছি। শরীর সর্বস্ব একটি স্ত্রী দিয়ে নিখিল কী করবে!

উমা একটু অপরাধীর মত থাকতো। চেয়ে খেতে তাকে কুণ্ঠিত হতে দেখেছি। বি. টি. ক্লাস করতো। বাড়িতে পড়াশোনা নিয়ে থাকে। অসম্ভব চুপচাপ। বিনয় দৈবাৎ কখনও এলে সেদিনই শুধু উমাকে সহজভাবে কথা বলতে দেখেছি। আর দেখেছি নিখিলের স্ত্রীর আশ্চর্য অভিনয়,

—বলে যান তো। এত কম খাবে। আমি তো বলে বলে আর পারি না। কী জানি আজকালকার মেয়েরা কম খেয়ে হয়তো ফিগার ঠিক রাখে।

হেসেছি। উমা মিষ্টি হেসেছে,

—বৌদির কথা দাদা বিশ্বাস কোরো না। আমি খুব খাই।

উমার প্রতি নিখিলের স্ত্রীর ব্যবহার আমার অসহ্য লাগতো। একদিন উমাকে একা পেয়ে বললাম,

—বিনয় আমারও বন্ধু। লজ্জা পেয়ো না, দরকার হলে, আমার কাছে টাকা নিতে সঙ্কোচ করবে না। বাইরে থেকে খেয়ে নিও।

উমা একটু হাসলো। বললো,

—আমরা বাড়ি নিচ্ছি ভবানীপুরে। আমরা কলকাতায় বাসা নিচ্ছি। এখানে আর বেশী দিন নেই। নিখিলদার জন্যে কষ্ট হয়। বৌদি নিখিলদাকে এমন অপমান করেন।

কয়েকদিন পরের কথা। আমি চলেছি বর্ধমান। গণ-সাহিত্য সম্পর্কে জোরালো কিছু বলতে চলেছি সাহিত্য বাসরে। মনে মনে বক্তৃতা ঠিক করছিলাম। প্রথমত লিখি কেন? অর্থ, যশ আর মেয়েদের ভালবাসা—ফ্রয়েডের কথা মনে পড়ছিল। প্লেখানভের সাহিত্য সমালোচনা, এঙ্গেলস্-এর বইতে কী পড়েছি সেই কথাই ভাবছিলাম।

—এটা কী বর্ধমান লোকাল। চন্দননগর যাবে?

হাওড়া স্টেশনে উমা। আমাকে দেখে সুন্দর হেসে উঠে এলো। এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছে। বই দেওয়া-নেওয়া করতে চলেছে।

নিখিলের বাড়িতে উমাকে অন্য রকম দেখেছি। আড়ষ্ট, লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে। আজ অল্পক্ষণেই বেশ স্বাভাবিক, সহজ হয়ে এলো। সাহিত্যের বেশ খবর রাখে।

আমার লেখাও পড়েছে। প্রকাশভঙ্গীটা আমার আরও ভাল লাগলো। উমা যে এত কিছু জানে আমি ভাবতেই পারিনি।

—আপনি বড় লোকদের নিয়ে লেখেন, কিন্তু তাতে শুধু কেচ্ছা আর গালাগাল থাকে। মানুষগুলো টাইপ। বড় লোকদের ওপর আপনার খুব রাগ।

আমি অবাক হয়েছি। রোজ দেখি উমাকে, আজ যেন নতুন নতুন লাগছিল। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল উমাকে। প্রচণ্ড বদলাবদলির পর উমার শরীরের একটা স্থিরতা এসেছে। সাদা তাঁতের শাড়ি পরনে। হলদে পাড়। অতি সাধারণ একটি ব্যাগ। প্রচুর ব্যবহারে মলিন।

প্রসাধনের কিছুমাত্র বাহুল্য নেই। ব্লাউজের সঙ্গে আটকানো কলমটাও অল্প দামের।

—আপনার সব লেখাই আমি প্রায় পড়েছি। আপনার লেখার আমি একজন ভক্ত। সেই অধিকারেই এ কথাগুলো বললাম। এত চাদর-চড়িয়ে বর্ধমান যাচ্ছেন, বিবাহ-বাসর না হলেও সাহিত্য বাসর আছে বলে মনে হচ্ছে।

—বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি।

—রাত্রে ফিরবেন তো ?

—নিশ্চয়ই।

—বৌদিকে আবার বলবেন না আমি চন্দননগর যাচ্ছি।

—আচ্ছা। তুমি কিন্তু দেরী করো না। সন্ধ্যের আগেই ফিরবে।

উমা ছোট্ট করে মাথা নাড়লো। চন্দননগর স্টেশনে উমা নেমে গেল।

নিখিলের বাড়ি আমিই আগে ছাড়লাম। একডালিয়ার এক কামরার এক ফ্ল্যাট হঠাৎ পেয়ে গেলাম। স্ত্রীর ব্যয় সংকোচ পরিকল্পনা, শেষের দিকে খাবার টেবিলের যা হাল করেছিল, বেচারা নিখিলকেই তাতে অপ্রস্তুতের একশেষ হতে দেখতাম। জায়গা পরিবর্তনের কথা তুলতে নিখিল খুব খুশী হলো।

নিখিলের স্ত্রীর আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি,

—বইপত্তর বাড়ছে। লোকজন যে রকম আসে আপনার কাছে তাতে নিজস্ব ফ্ল্যাট ছাড়া সত্যিই খুব অসুবিধে।

বকুলবাগানের বাড়িতে উমারা কিছুদিন পর গেল। আমি তখন নিত্য যেতাম। পার্টি লাইন দেখে বিনয়ও কিছুটা বিভ্রান্ত। তবে সক্রিয় কর্মী সে তখনও। কোনো এক সওদাগরী প্রচার দপ্তরে ভালো কাজই করতো।

উমাকে আমার ভাল লাগলো। মেয়েদের সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না আগে। পার্টি ছেড়ে দেওয়ার পর ও 'সমন্বয়'-এর নতুন

জীবনে প্রবেশ করে দুনিয়াটাই আমার কাছে তখন নতুন ভাবে প্রতিভাত হয়েছে। নিজের সম্পর্কে ভাবতে সময় পাই নি। চার দিকে এত সুখ, এত আনন্দ। বঞ্চনা করেছি নিজেকে। নিজেকেই আমি যেন প্রতারণা করেছি এতদিন।

উমা আমাকে পছন্দ করছিলো। উমাকে আমারও অসম্ভব ভাল লাগছিল। বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতাম কিন্তু উমাকে কাছে পেলেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগতো। পার্টি ছেড়ে দেওয়ায় বিনয় আমার প্রতি খুশী ছিল না। তবু অতিশয় ভদ্র ও চাপা লোক। বিনয় মনে মনে আমাকে শ্রদ্ধাও করতো।

বৃষ্টির দিন ছিল সেদিন। উমা হঠাৎ আমার একডালিয়ার বাড়িতে এলো। আমি অবাক হইনি এতটুকু। কোমরে কাপড় জড়িয়ে ছড়ানো বইপত্তর গোছ করলো। নোঙরা ঘর পরিষ্কার করলো। চা করে খাওয়ালো। আমি কিছুটা আত্মহারা। পল্ এল্যুয়ার-এর 'লামুরেস্' কবিতাটি সহজ করে বোঝালাম। স্যুরেয়ালিজমের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কবি নাৎসীজমের বিরুদ্ধে যে কবিতা রচনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে উমাকে বললাম। আরও কথা, হাজারো আলোচনা। দ্রাক্ষা থেকে মদ, কয়লা থেকে আগুন, আর চুম্বন থেকে হয় মানুষ— এ্যলুয়ার-এর 'বন্‌জ্যিস্‌তিস' কবিতা বোঝাতে আমিই কেমন উষ্ণ হয়ে পড়ছিলাম।

অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে, সম্ভব হয়নি। সাহসও পাইনি। উমাকে সম্পূর্ণ একা পাবার সুযোগও পেয়েছি সামান্যই। আজ উমাকে দেখে আমার শরীরটাই কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো। কাগজে ছাপা পল্ এল্যুয়ার-এর 'লামুরেস' কেমন জোলো মনে হয়। উমা-ই তো আমার লামুরেস। রক্ত মাংসের প্রেমিকা। কাছে টেনেছি। উমার শরীরটা আশ্চর্য রকম নরম-নরম, শক্ত শক্ত। আমাকে কেমন পাগল করে তোলে। ফুলের মত সুন্দর নগ্ন বুকটা দেখবার জন্যে বেয়াড়া সেপ্টিপিন লাগানো ব্লাউসটাই ছিঁড়ে ফেলেছিলাম অনেকটা।

উমার ঠোঁটে, খাড়ে কপালে চুম্বন এঁকে দিয়েছি বার বার। উমার সারা শরীরে নোনা স্বাদ খুঁজেছি পাতি পাতি করে।

উমা বাধা দেয় নি। প্রতিবাদ করে নি। মুখের কোনো অভিব্যক্তি ছিল না। নিষ্পলক নেত্রে শুধু তাকিয়েছিল। উমার হাত দুটোতে চেতনা নেই। নির্লিপ্ত শরীরটায় মরা মানুষের নির্জীবতা। নরম নরম, শক্ত শক্ত শরীরটায় তাপ আছে—যৌবনের উত্তাপ নেই। দেহ আছে—দাহ নেই। সুন্দর ফুল—গন্ধ নেই।

অপমান বোধ করেছি। উমার ভাবসাব দেখে মনে হলো আমি যেন অন্যায় কিছু করছি। আমি যেন উমার শরীরে কিছু চুরি করতে চেয়েছি। দেহ বিযুক্ত করে চেয়ারে ফিরে এসে গুম হয়ে বসলাম। উমা তখনও স্থির। এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে থ হয়ে তাকিয়ে আছে।

অসহ্য লাগছিল। তবু সহজ, স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করি,

—শাড়িটা ঠিক করে নাও।

উমা চোখ বন্ধ করলো।

দুদিন পর উমার এক পত্র পেলাম। অনেক কথাই লিখেছে। চিঠি আশ্রয়ী প্রেম খুবই সচেতন। কিন্তু আমার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শরীর-মন, উমার সব কথাই কেমন অচেতন মনে হয়। এক জায়গায় উমা লিখেছে, আমাকে তার ভয় করে। আমার অপর্যাপ্ত পৌরুষ তার অপ্রচুর রমণীয়তায় কতটা সার্থক হবে, সেই কথা ভেবে ভয় পায়।

সময়াভাব থাকলেও সুযোগ করতে পারতাম। কিন্তু চুপচাপ রইলাম। শুধু বুঝতে পেরেছি, উমা আজ প্রস্তুত। আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়।

আরও কয়েকটা দিন গেল। 'সমন্বয়'-এ অমিয় পালিতকে তাড়ানোর পর বেশ গোলমাল চলছিলো তখন। সারাদিনই ব্যস্ত থাকতাম। ফিরেছিলাম সেদিন রাত করেই। তালা খুলে দরজার সামনে ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ পেলাম। হাতের লেখা

উমার। এক লাইনের লেখা। নিচে কোনো স্বাক্ষর নেই—'এসেছিলাম। দেখা হলো না। তুমি এসো। ভাল থেকো।'

অভিযোগ কিছু ছিল না। তবে পূর্বের সাড়া আর পাইনি। বারবার শুধু মনে হয়েছে, এত হৈ-চৈ করার কী আছে। আমার তরফ থেকে প্রস্তুতিই বা কতটা।

কিছুদিন পর নিখিল এলো একদিন। স্ত্রীর কৃপণ স্বভাব ও হীনতার জন্যে নিখিলকে দোষ দেওয়া যায় না। বড় গোবেচারা লোক। দুজনেই আমরা দলত্যাগী, তাই চিন্তাধারায়, আত্মপক্ষ সমর্থনে, পরস্পরের মধ্যে কোথাও যেন একটা অদৃশ্য মিতালী ছিল। অনেক কথাই হয়। ইন্দোচীনের কথা, নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে এঙ্গেলস্ কী বলেছেন, তিব্বতের দালাইলামার কথা ও নানান প্রসঙ্গ আলোচনা হয়। মাও ৎসে-তুং-এর মতিগতি সম্পর্কে আমার সন্দেহে নিখিল দেখলাম আমার সঙ্গে একমত। স্বীকার করলো, কেমন যেন কথাবার্তায় 'এক্সপ্যানশ্যানিজম'-এর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

কথা চলছিল। বহু প্রসঙ্গই উঠেছে। তবু মনে হচ্ছিল নিখিল কী যেন একটা বলতে চায়। অল্পক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিখিল হঠাৎ বললো,

—বিনয়ের চাকরি গেছে।

—কেন ?

—বিনয় বড় বাড়াবাড়ি সুরু করেছিল।

—কাণ্ডজ্ঞান নেই। এ শালা 'মা বাবা'-দের দেশে কিছু দুম করে হবার নয়। কোথায় ধরবে ? সব পচা। সমস্ত কিছু চুরমার না করে ফেললে কিছুই সম্ভব নয়।

'উমা সম্পর্কে তুমি সত্যিই কী ঠিক করেছো। বেচারা কষ্ট পাচ্ছে।' কথার গুরুত্ব ছিল। সপ্রসন্ন হেসে নিখিল হঠাৎ প্রশ্ন করলো।

আমি নিরুত্তর।

—উমা সম্পর্কে তুমি কী ভেবেছো ?

হেসেছি ছোট্ট করে। তবে নিখিলের প্রশ্নে আমি অসম্ভব চটে গিয়েছিলাম প্রথমটায়,

—উমাকে আমার ভাল লাগে।

—সে তো জানি। তবে ঠিক করেছো কী ?

—দুম করে কী বলবো নিখিল। উমাকে আমার ভাল লাগে দিস্ মাচ্।

—দায়িত্বহীনের মত অযথা প্রশ্রয় ও প্রাধান্য দিয়ে উমার মনটা তুমি এমন করে দিয়েছো—বেসিক্যালি উমা অসম্ভব অনেস্ট্ আর ডিগনিফায়েড। বাচ্চা মেয়ে, ব্যাপাবটা সে সিরিয়াসলি নিয়েছে।

—আমি দায়িত্বহীন নই। প্রশ্রয় উমাকে আমি কিছু দেইনি। সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী।

—উমা তো আমার ওখানেও ছিল। আমার স্ত্রী তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি আমি জানি। কিন্তু উমা একদিনের জন্যেও—মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হ'ত। চিরদিনই অসম্ভব আত্মসম্মানী। ঠিক বিনয়ের ধাত। কষ্ট হবে, তবু বলবে না।

—কেন উমার কী হয়েছে কী ?

—আমি ঠিক ধরেছি। অরুণ, উমাকে তোমার বিয়ে করা দরকার। উমাকে স্ত্রী হিসাবে পেলে তুমি অনেক জিতবে। উমার মধ্যে এমন একটা মা মা ভাব আছে। আমার ওখানে কী সে কম কষ্ট পেয়েছে। এত নরম মন। এ রকম মেয়ে হয় না।

—হঠাৎ তুমি আজ একথা বলছো কেন ?

—দেখলাম কাল উমাকে। সে কষ্ট পাচ্ছে।

—কিছু বলেছে ?

—উমা কোনোদিন কিছু বলে। এমনিতেই চুপচাপ, দেখে মোটেই ভাল লাগলো না। চাকরি চায়, এম. এ পড়তে চায় না।

—সবই বুঝলাম নিখিল, কিন্তু উমা হঠাৎ এত অরক্ষণীয়া হয়ে উঠলো কেন?

—তুমি কী ঠিক করেছো সেটা জানা দরকার।

নিখিলকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি,

—দেখ নিখিল, উমাকে আমার ভাল লাগে। তবে বিয়ে করবার দিকটা আমি একদম ভেবে দেখিনি। উমাকে সার্থক হতে দেখলে নিশ্চয়ই আমার তোমার মতই ভাল লাগবে। কিন্তু আমার মতন বোহেমিয়ান, ছন্নছাড়া কোন্ স্পর্ধায় এতবড় দায়িত্ব নেবে বল? উমার ওপর সে অবিচারই হবে। উমা বিনয়ের বোন, কিন্তু রাজনৈতিক চেতনার অসম্ভব অভাব। আজ আমি 'সমন্বয়'-এ আছি। কিন্তু এই নিরুত্তাপ সরল জীবন তো আমার নয়। ব্যক্তিগত জীবনের ছককাটা এ্যাম্বিশন আগেও ছিল না, এখনও নেই। আন্দোলন-টান্দোলনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যাব কে জানে! উমার মত সুন্দর মেয়ে শুধু কষ্ট পাবে। জানি না তোমাকে আমি বোঝাতে পাচ্ছি কি না, কিন্তু নিখিল তুমি ভেবে দেখো উমা অসম্ভব ভাল মেয়ে কিন্তু সাধারণ মেয়ে। স্বাভাবিক নিয়মে মেয়েরা যাতে খুশী হয়, সুখী হতে দেখি, সে সবের ঊর্ধ্বে সে নয়। আমি ভেবে দেখেছি। তুমি জান, রাজনীতি ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন আমি আজও ভাবতে পারি না। আর 'সমন্বয়'-এ আমি টিকতে পারবো ভেবেছো! অমিয় পালিতের মতো হয়তো আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। তাছাড়া আমি স্বাভাবিক যুক্তিতেই বা টিকতে পারি সেখানে কীভাবে? সুবিমল রায় একটা শাসক শ্রেণীর দালাল। বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ষোল আনা। তাঁর সঙ্গে আমি থাকবো কী ভাবে? আর যাই চাই সফল হতে চাই না। সফল বলতে আমি প্রিভিলেজড্ ক্লাসের অনুগ্রহের কথা বলছি! জীবনে সাক্সেসফুল ম্যান হতে আমি চাই না। ফুটপাতে না খেয়ে মরবো কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট হবো না। আমাকে অনেকে সুবিধাবাদী বলছে। দলত্যাগী

বলে নিন্দে করে। পার্টির কাগজে আমাকে বলেছে, কালীঘাটের কাউট্স্কী। আমার তাতে দুঃখ নেই। কমিউনিস্ট পার্টি ভুল করেছে। আন্দোলন ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে। সবই বুঝলাম। সো হোয়াট? মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ তো মিথ্যে হয়ে যায়নি। ভুল হয়তো করেছে, কিন্তু আগামী দিনে শোধরাবে। বিনয় খুব বাজে কথাও বলে না। তবে তার মত আশাবাদী, স্বপ্নবিলাসী আমি নই। কিন্তু নিখিল, একথা তো অস্বীকার করতে পার না, এই কমিউনিস্ট পার্টিই সব। পার্টিই একমাত্র ভরসা। পার্টির আন্দোলন একমাত্র সম্বল। ভারতের মুক্তি। সর্বহারার মুক্তি। তুমি আমি সবাই যেখানে সার্থক। দোষ আমার নিশ্চয়ই আছে, রেনিগেড অবশ্য নই, কিন্তু কোথাও আমি দুর্বল আমার সন্দেহ হয়। আমার এখনই উচিত 'সমন্বয়' ছেড়ে দেওয়া। পার্টির মধ্যে ফিরে গিয়ে আবার আন্দোলনে নেমে পড়া। এক এক সময় আমার মনে হয় নিখিল, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গাঁয়ে চলে যাই। শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন করে লাফালে শুধু চলবে না। আমাদের দেশের শ্রমিকদের পুরোপুরি কোনো শ্রেণী চরিত্র নেই। প্রলেটারিয়েট্ বলতে যা বোঝায়, সে খুব সামান্য। এদের হারানোর অনেক কিছুই আছে। এদের প্রপার্টি সেন্স আছে। দেশে এরা রেগুলার মনি-অর্ডার করে। কৃষক আন্দোলনই আমাদের একমাত্র পথ। বিপ্লব সুরু হবে আমাদের গ্রাম থেকে। বালাবুশিভিচ বল—এই কথাই। এশিয়ার অনুন্নত দেশ সম্পর্কে মাও ৎসে-তুং কী বলেছেন পড়ে দেখো। তুমি জান না নিখিল, সে মুক্ত এলাকা আমি দেখেছি। তেলেঙ্গানা আমাকে আজও হণ্ট্ করে।

নিখিলের সঙ্গে কথাবার্তা ক্রমে রাজনৈতিক আলোচনায় ভেসে গেল। উমা ও আমার ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশ প্রথমটা আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, প্রয়োজন ছিল। উমার সামনে এত কথার সুযোগ ছিল না। সম্ভবও হতো

না। বরং নিখিলের মাধ্যমে কথাগুলো জানিয়ে হালকা হওয়া গেল অনেকখানি।

তবু ভেবেছিলাম উমা হয়তো আসবে। কিন্তু উমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। সময় অতিবাহিত হয়েছে। অনেক কিছুর অদল-বদল হয়েছে। অভিযোগ একটা খাড়া করা যায়, কিন্তু উমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিনি। ভাল হয়তো লেগেছিল কিন্তু পুরোপুরি ভরসা কখনও দেইনি। নির্ভরতার প্রশ্নই ওঠে না।

হঠাৎ আজ গৌরী এঁলো। অনেক কথাই শুনলাম। উমা পূর্বের মতই আছে। অনেকগুলো এম এ. পরীক্ষা দিয়ে হয়তো ভালই আছে। বিনয়ের জন্যে যদি কিছু করা যায় তাতে আমি খুশী হবো। কিছু করবার আগ্রহই অনুভব করি। উমা জানুক সেকথা আমি চাই। ভীরু স্বভাবের সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর অপবাদ লাঞ্ছিত অরুণ সান্যালের প্রকৃত চরিত্র যে কী বিনয়ও জানুক।

আশ্চর্য যোগাযোগ। বিদেশী একটা পলিটিকাল টিমের সঙ্গে পরদিনই আমাকে দিল্লী যেতে হলো। খাদি গ্রামোদ্যোগে শুভ্রাংশুর সঙ্গে দেখা। কমিউনিস্ট—কিন্তু নিরাপদ। পূর্ব জর্মনীর কূটনৈতিক দপ্তরে জর্মন স্ত্রী কাজ করেন, সুতরাং শুভ্রাংশুর মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কী নিয়মে চলা উচিত বুঝতে পারি।

জোর করে ধরে নিয়ে গেল। বাড়িতে নয়, প্রবীণ এক অধ্যাপকের বাড়ি। লোকসভার সদস্য। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কয়েকটি য়ুনিভারসিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া নীতি সম্পর্কে জোরালো বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ থেকে চীনের বিচ্যুতি ও পিকিং-এর বর্তমান নেতৃত্বের সম্প্রসারণ নীতির

বিরুদ্ধে তাঁর 'বাঁশের ড্রাগন' প্রবন্ধটি আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহলের প্রশংসা ও বেশ কিছু পরিমাণ দুর্লভ ডলার সঞ্চয়ে সমর্থ হয়েছে।

অধ্যাপক ঘরে নেই। তবে বাইরের ঘর বহু মানুষে ঠাসা। নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলছে। দু-একজন আমাকে চিনলেন। শুভ্রাংশু একজনকে কী একটা কথা জিগ্যেস করতেই তিনি উত্তেজিত,

—সেই কথাই তো হচ্ছে। দিল্লীতে গো-মাতার মিছিল ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়। আপনি মশাই এতকালের ছাত্রনেতা, কোথায় আপনার দিল্লীর যুব সমাজ।

একজন ক্ষীণ প্রতিবাদ করে,

এত রদ্দুর! চাণক্যপুরী পর্যন্ত অনেকেই হাঁটতে চায় না।

—আশ্চর্য, মার্কিন দূতাবাসের সামনে একটা বড় রকমের প্রতিবাদ মিছিল আমরা নিয়ে যেতে পারি না? রদ্দুর! দূর করে দিতে হয়। সুখের পায়রা সব। আন্দোলন করবেন, কিন্তু গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগবে না। বেশ যুক্তি। চাণক্যপুরী পর্যন্ত অনেকেই হাঁটতে চায় না—একথা বলতে লজ্জা করে না। এ সব কথা আমি শুক্রবারের মিটিং-এ তুলছি।

আলোচনা চলতে লাগলো। মার্কিন দূতাবাসে প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বললেন। কিন্তু কোনটারই বিশেষ সমর্থন পাওয়া গেল না। দু-একজন সভ্য অপ্রচুর নবীন ক্যাডারস্ ও সাংগঠনিক গুরুতর ত্রুটীর কথা তুলতেই অনেকেই অপ্রাসঙ্গিক বলে থামিয়ে দিলেন।

লোকসভার সদস্য প্রবীণ অধ্যাপক শিকদার আসার সঙ্গে সঙ্গে সব সমাধান হয়ে গেল,

—দুপুর রদ্দুরের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ নেই। নিয়ো-কলোনিয়ালিজম-এর সঙ্গে তার কোনো মিতালী নেই। বেলা পড়লে যাব। চাণক্যপুরী পর্যন্ত হাঁটতে আপত্তি থাকলে শ-দুই স্কুটার রিক্সা ভাড়া কর। ড্রাইভারদের নিয়ে শ' দুই লোক তো ছাঁকা ওখানেই

বাড়তি পাওয়া যাবে। আমেরিকান দূতাবাস ঘিরে শ' দুই স্কুটার রিক্সা—সে এক দেখার ব্যাপারও হবে। পঞ্চশীল মার্গ-এ সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! পাশের চীনা দূতাবাস পর্যন্ত চমকে চমকে উঠবে। স্কুটার রিক্সার কথা শুনলে মিছিলে লোক জোগাড় করতে অসুবিধে হবে না।

পথে শুভ্রাংশুকে বিনয় সেনের কথা বলেছিলাম। সে রাজি। কথাটা সোজাসুজি অধ্যাপক শিকদারের সামনেই সে তুলতে বলে। অধ্যাপক শিকদারের খুব হাত। আমার পূর্ব পরিচিত। স্নেহ করেন।

ভীড় সরে গেলে কথাটা পাড়লাম। গুণী লোক, উপযুক্ত মানুষের মর্যাদা দিতে জানেন। হেসে বললেন,

—বাইরে থেকে যত শোনো ততটা সত্যি নয়। অনুবাদের কাজ খুব বেশী হচ্ছে বলে মনে হয় না। পাওয়া কঠিন।

—আপনি একটু চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হয়।

—আমার আপত্তি নেই। বলছো, নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।

—বিনয় সেন যোগ্য লোক। আপনি যথেষ্ট চেনেন নিশ্চয়ই।

—খুব চিনি। নিঃসন্দেহে গুণী লোক। চমৎকার রুশ জানেন।

—খুবই অর্থাভাবে আছে। শরীরও খুব খারাপ।

—বুঝলাম। দেখি কী করতে পারি।

হঠাৎ অধ্যাপক শিকদার মুখ তুলে পুরো দৃষ্টি আমার চোখের ওপর মেলে ধরে বললেন,

—হবে না। অন্য কারো জন্যে হলে হয়তো একটা সুরাহা করা যেত। কিন্তু বিনয় সেনের হবে না।

—কেন? বাধাটা কোথায়?

—ভদ্রলোকের মাথা খারাপ। মাস দুই আগে হঠাৎ একদিন কলকাতায় আমার বাড়িতে এলেন। এক অদ্ভুত অনুরোধ!

—লোকসভার জন্যে বুঝি কিছু প্রশ্ন এনেছিল সঙ্গে করে ?

—সে সব কিছু নয়। বললে আশ্চর্য হবে, সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব। বিনয় সেনের প্রস্তাবে আমি সেদিন ধৈর্য হারাতে বসেছিলাম। কী চাইছিলেন আজ আমার আর মনে নেই, তবে লেনিনের কী একটা যেন দেখতে চাইলেন। বললাম, সিলেক্টেড্-ওয়ার্কস্ সামনের আলমারীতেই রাখা আছে—নিয়ে যান। বিনয় সেন বইপত্তর নাড়াচাড়া করে বললেন, এ যে সব হাল আমলের ছাপা। ফিফ্‌টি থ্রি-র আগের মস্কোর ছাপা লেনিনের বই দেখতে চাই। আমি পুরোনো খুঁজছি। স্তালিনের আমলে ছাপা বইপত্তর আপনার এখানে থাকার কথা।

—বিনয় এই কথা বললো ?

—বলছি কি !

আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে শুভ্রাংশু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে,

—পাগল।

অধ্যাপক শিকদার একটু উত্তেজিত,

—শুধু তাই নয়। উৎসাহী, আগ্রহী পাঠক হিসাবে আজ এই বিশ্রী পরিস্থিতিতে কারো এমন ইচ্ছে হতে পারে। কিন্তু বিনয় সেনের ইদানীং লেখা কয়েকটা পড়লাম। শুভ্রাংশু বলছো পাগল, কিন্তু আমার তো মনে হয় শয়তানী। কেময় ও মাৎস্যু-র ব্যাপারে মস্কোকে যে ভাবে গাল দিয়েছে তাতে যে কোনো মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে বিনয় সেনের জন্যে অনুবাদের কাজের আমি কি চেষ্টা করবো হে ! তাছাড়া বিনয় সেন এই কাজ করবেন বলে মনেও হয় না। ভালো রুশ জানেন, তোমার বন্ধু, তোমার কথায় অবশ্য যুক্তি আছে।

আমি একদম নিভে গেছি। বিনয় যে এতবেশী উগ্রপন্থী জানতামই না।

শুভ্রাংশু আমাকে ছাড়লো না। নতুন ছোট গাড়িতে চাপিয়ে

বাড়ি নিয়ে গেল। রাজনীতিই এখনও নেশা। তবে পেশা হিসাবে বিদেশী এক ট্রেড এজেন্সীর সঙ্গে কি একটা যেন করে। চেহারা পূর্বের মত সুন্দর আছে। সারা পথ দিল্লীর গল্প করলো। বললো, বাসস্থান একটা কোনো রকম হলেই হলো, কিন্তু এত ছড়ানো শহর, গাড়ি ছাড়া দিল্লীতে টেকা মুশকিল।

শুভ্রাংশুর স্ত্রী কিন্তু আমাকে হতাশ করলেন। রাজনীতির মধ্যেই থাকেন। রাজনীতি করতে করতেই শুভ্রাংশুর সঙ্গে বুখারেস্ট-এ প্রেমে পড়েছেন। কিন্তু সারাক্ষণ দেখলাম ঘর গোছাতেই ব্যস্ত। কর্নফ্লেক দিল্লীতে হঠাৎ উধাও হওয়ায় ভদ্রমহিলাকে অসম্ভব চিন্তিত দেখলাম। একটা ছেলে আছে। বছর সাত-আট হবে। মায়ের সঙ্গে জর্মন বলে। শুভ্রাংশুও স্ত্রীর সঙ্গে ঐ ভাষায় কথা বলে। আমার সঙ্গে ইংরেজী চলছিল। ছেলেটি অসম্ভব জর্মন ভক্ত। ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাঙ্গালীদের দেখলে ছেলেটার অসম্ভব মজা লাগে। বয়সোচিত চাপল্য অবশ্য যথেষ্ট, কিন্তু সুন্দরবনের বাঘের কথা তুলতেই সে জানান দিল জর্মনীর জন্তু জানোয়ারকে হেয় করবার কোনো কারণ নেই! কথা প্রসঙ্গে অতটুকু ছেলে জানালো, হিটলার একটা বোকা। আজেবাজে ফ্রণ্ট খুলে আর বড় রকমের কয়েকটা ভুল করায় যুদ্ধে হেরে গেছে। জিতলে যেন খুবই ভাল হতো।

শুভ্রাংশু একটু অপ্রস্তুত হয়। বলে,

—দিল্লীতে ভাল একটা স্কুল নেই। এমন সব পয়সা খাওয়া জায়গা। লেখাপড়া কিস্যু হয় না।

শুভ্রাংশু-র স্ত্রী বলেন,

—সামনের বছর মায়ের কাছে রেখে আসবো। এখানে থাকলে মানুষ হবে না।

শুভ্রাংশুর স্ত্রীর ধারণা আমাকে অবাক করলো,

—জানেন, কলকাতা যেতে আমার ভয় করে। রোজই ওখানে গোলমাল। বোমা আর গুলি চলে। ট্রাম বাস বন্ধ।

—রোজ নয়, প্রায়ই হয়। কলকাতা খুবই জাগ্রত শহর। রাজনৈতিক উত্তাপ সবচেয়ে বেশী।

বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম। শুভ্রাংশুর সঙ্গে রাজনীতির কথা হয়। তার রাজনৈতিক শ্বশুরবাড়ি মস্কো। স্ত্রীর বাপের বাড়ি পূর্ব জর্মনী। শুভ্রাংশুর দৃঢ় ধারণা চীন সম্পূর্ণ একঘরে হয়ে গেছে। সংসদীয় গণতন্ত্র ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই।

শুভ্রাংশু দিল্লী থাকলেও অনেকের খবর রাখে। নিরোদবাবুর স্ত্রী পালিয়েছে। অধ্যাপক হরমোহন রায় দিল্লীতে চাকরি নিয়ে এসেছেন। সেই বিয়েই করলেন কিন্তু পঞ্চান্নো বছর বয়সে করলেন। হরমোহনবাবু নাকি জুতো পরে ঘরে ঢুকতে পারেন না। আমিষ কিছু খাওয়া বারণ। লুকিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাছভাঁজা কিনে খান হরমোহন বাবু। মস্কোতে বক্তৃতা দিয়ে টেপ-রেকর্ডার, লোভনীয় কুকিং-রেঞ্জ ও নিত্য প্রয়োজনীয় হরেক রকম গ্যাজেটস্ নিয়ে এসেছেন। চুটিয়ে সংসার করছেন অধ্যাপক হরমোহন রায়।

আমি নিরোদবাবু সম্পর্কে জানতে চাইলাম। শুভ্রাংশু এক রাশ হেসে বলে,

—নিরোদবাবুর স্ত্রী যে এরকম করবেন ভাবতে পারিনি।

—আদর্শগত কোনো বিরোধ?

—বলা শক্ত। তবে নিরোদবাবুর বিস্তর টাকা চোট দিয়েছেন ভদ্রমহিলা।

—বাড়িটা?

—বাড়িটা তো বৌ-এর নামে। নিরোদবাবু এখন লাজপতনগরে থাকেন। লাইন দিয়ে বাসে ওঠেন। সেদিন দেখলাম কনট প্লেসে জুতো পালিশ করাচ্ছেন। সমস্ত চুল পেকে গেছে। তুমি চিনতে পারবে না।

শুভ্রাংশু স্ত্রীকে বীয়ার দিতে বলে। কিন্তু স্ত্রী সুদৃশ্য দুটি গ্লাসে

বেশ খানিকটা সোনালী স্কচ আনলেন। বুদ্ধিমতী। জাত জার্মান মেয়ে। বাথরুমটা নিশ্চয়ই ভেতরে। আমাকে বীয়ার খাইয়ে শোবার ঘরের প্রাইভেসি নষ্ট করতে চান না।

ঘড়ি দেখে উঠে পড়লাম। পথে অগণিত গাড়ির মিছিল। এ সময়ে রিং রোডে এত গাড়ি চলবার কথা নয়। জিজ্ঞাসা করতে শুভ্রাংশু হেসে বলে,

—এ ভীড় এখন চলবে। কী কারণে দিল্লীতে আজ হঠাৎ ড্রাই-ডে। সবাই তাই চলেছে পাঞ্জাব।

আমার বাড়িতে গৌরী আর আসেনি। রাস্তায় দেখা একদিন। ভাবসাব দেখে মনে হলো, আমাকে যেন এড়াতে চায়। চেষ্টা করে একটুকরো হাসলো। একদিন বাড়িতে আসতে বললাম। ছোট্ট করে মাথা নাড়লো। বেশ বুঝলাম গৌরী আসবে না। কোনো দিনই আর আসবে না। হয়তো উমা বারণ করেছে। বিনয়ের হয়তো পছন্দ নয়। গৌরী হয়তো আজ চিনতে পেরেছে আমাকে। আমি দালাল হয়ে গেছি। উচ্ছ্বাসের মাথায় অনেক কিছুই সেদিন বলে গেছে বলে হয়তো অনুতপ্ত। ফ্রিজের ঠাণ্ডা ড্রিঙ্কস্ খাইয়ে গৌরীকে আমি যেন শুধু ঠকিয়েছি।

সুতপাই দেখালো ক'দিন পর। দু'জন পার্শ্বচর সহ বিনয় পশ্চিম-দিনাজপুরের কোথায় যেন ধরা পড়েছে।

—তুমি যে বললে শরীর খুব খারাপ। ঘর থেকে বড় বেরুতে পারে না। তাই বাড়িতে বসে লেখা-পড়ার কাজ চান। কিন্তু দিনাজপুরে কি কাজে গিয়েছিলেন?

—জানি না।

—এ যে এলাহি কাণ্ড। গাড়ি রাখবার যে জায়গা-ই নেই।

—এ রকম অভিজ্ঞতা তোমার কখনও হয়নি। স্বামীজীকে আমিই মাত্র দু-তিনবার দেখেছি। তবে এবার অনেক দিন পরে আসছেন।

—কোথায় থাকেন স্বামীজী ?

—ঘুরে বেড়ান। দেখার মতো একটা চেহারা বটে। কাল এয়ার পোর্টে সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। আমি নিজেই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। লোকও হয়েছিল তেমন।

—স্বামীজী এখন আসছেন কোথা থেকে ?

—ব্যাংকক্। ভগবান-টগবান বাদ দাও। সন্ন্যাসীদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে কিন্তু স্বামীজী একটা দুর্ধর্ষ পুরুষ। দেখলেই বুঝতে পারবে।

অনেক কষ্টে একটু জায়গা পেলাম। গাড়ি পার্ক করে সুতপাকে নিয়ে নেমে এলাম। সুবিমল রায়ের বাড়িটা আজ যেন ঝলমল করছে। 'সমন্বয়'-এর পুরো স্টাফের আজ এখানে ডিউটি। মাইক্রোফোনে গাড়ি পরিচালনা হচ্ছে। বহু জাতের মানুষের ভীড়। মেয়েদের দেখে মনে হয় যেন ফ্যাশন প্যারেডের টেবিলে নির্বাচন মণ্ডলীর সামনে হেঁট হয়ে দাঁড়াতে এসেছেন। কলকাতার শ্রেষ্ঠ হোটেলের উর্দি-পরা বয় ছোটাছুটিতে নিযুক্ত।

—কাউকেই আমি চিনি না।

—তাতে কী হয়েছে। আমার সঙ্গে থাকলে সবাই আন্দাজ করতে পারবে। একদম চেন না তা নয়। অনেককেই জান। মিসেস ধরকে দেখবে।

—আমার কেমন ভয় ভয় করে।

—ভয় ?

—হ্যাঁ, অপ্রস্তুত হবার আশঙ্কা করি।

—'স্বামীজীকে কিন্তু প্রণাম ক'রবে সুতপা,' কথাটা আমি একরকম ছুম করে গুঁজে দিলাম।

—পায়ে হাত দিয়ে ?

—আরে বাবা সবটাই অভিনয়। করতে হয়। নিয়ম রক্ষা আর কী!

—তুমি এসবে বিশ্বাস কর ?

—বুঝতেই তো পার। কিন্তু এসে যখন পড়েছো উপায় নেই।

—আমি আসতে চাইনি।

—তাই কী কখনও হয়। সুবিমল রায় খুব দুঃখিত হতেন। তাছাড়া এখানে তোমার নতুন অভিজ্ঞতা হবে। কলকাতার ঝাঁজালো মানুষগুলো স্বামীজীর সামনে কেমন হয়ে যান দেখলে তোমার অবাক লাগবে।

'অরুণ এত দেরী,' পাশে ফিরে দেখি হেমেন ভাদুড়ী। ধুতি-পাঞ্জাবি ও চুরুট হীন ঠোঁট দেখে প্রথমটা চিনতেই পারিনি। পরিচয় নেই, তবে সুতপাকে আন্দাজ করতে পারেন। নত হয়ে করজোড়ে নমস্কার জানান। পাথরের নুড়ি ফেলা চওড়া পথ। পাশাপাশি দু'খানা গাড়ি স্বচ্ছন্দে রাখা যায়। যথেষ্ট জায়গা ছিল। তবু হেমেন ভাদুড়ী সুতপার পথ করে দিতে সরে দাঁড়ালেন।

হেমেন ভাদুড়ী আজও আমার কাছে এক রহস্যজনক ব্যক্তিত্ব। স্বয়ং সুবিমল রায় এই মানুষটিকে 'দাদা'-'দাদা' করেন। মাত্রাতিরিক্ত তারুণ্যের দাপটে প্রকৃত বয়স বোঝা মুশকিল। পঞ্চাশও হতে পারে, সত্তর হলেও অবাক হবার কিছু নেই। লম্বায় পাঁচ-তিন বা পাঁচ-চার। বিপুল স্বাস্থ্য। যতদূর জানি, কিছুই করেন না। শুধু খরচা করেন অপর্যাপ্ত।

সুতপার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। সুতপা ছোট একটা নমস্কার জানালো।

—তোমাকেই আমি খুঁজছি। প্রফেসর উইলমোর এসেছেন। তোমার 'লাস্ট স্ট্রংহোল্ড' পড়ে খুব খুশী।

—তাই নাকি?

—বললেন, এ ধরনের লেখা যত বেশী হয় ততই ভাল। পালিয়ে যেও না, দেখা করবে।

হেমেন ভাদুড়ী শুধু আমার কাছে নয়, আজও অনেকের কাছে বিস্ময়। দস্তুরমত অসম্ভব ব্যক্তি। মানুষটির বিস্তৃত জীবন অস্পষ্ট। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এই মানুষটিকে প্রথম যেদিন আমি স্বামী কামদানন্দের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখি সেদিন হতবাক হয়েছিলাম।

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁদের সবাই হাতে রাখতে চান। হেমেন ভাদুড়ী সেই শ্রেণীর মানুষ। অতি বড় ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী লোকও এই মানুষটিকে চটাতে সাহস করেন না। বরং খুশী করবার সর্বদাই চেষ্টা করেন।

রাজনীতির সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না কোনদিন। তবু বহু পলিটিক্যাল সাপুড়ে সর্বদাই ঘুর ঘুর করেন। ক্যামাক স্ট্রীটে বাড়ি, তবু পুরো স্যুট্ গ্রেট ইস্টার্ণে ভাড়া করা থাকে সারা বছর। সি. সি. মার্কা গাড়ি কেন যে এই মানুষটির দোরগোড়ায় হামেশাই যাতায়াত করে বুঝতে পারি না। কোনো কোনো সান্ধ্যমজলিসে তাঁর বাড়িতে যে পরিমাণ স্কচ হুইস্কীর স্রোত বয়ে যায়—কলকাতার শ্রেষ্ঠ কোনো বারেও তা কল্পনাতীত। ভদ্রলোক বাংলা বলেন না কিন্তু শান্তিনিকেতনে কটেজ রেখেছেন লোভনীয়।

দেশ স্বাধীন যখন হয়নি, নিখিল ভারতীয় নেতারা কলকাতায় এলে হেমেন ভাদুড়ীর ঝলমলে গাড়িতে নিয়মিত ঘুরেছেন। অনেকটা চার্লস্ লটন্-এর মত চেহারা। বেচাল হন না কখনই কিন্তু সব সময়ই দুর্মূল্য পানীয়ের আমেজে থাকেন। স্ত্রীকে নাকি আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেন। আবার শোনা যায় কলকাতার নামকরা

লম্পট নামে প্রসিদ্ধ হেমেন ভাদুড়ীর জেষ্ঠ্যপুত্র প্রেমেন ভাদুড়ী মায়ের লাম্পট্যে ভছনছ হতে হতে হ্যামলেটের মতো রুখে দাঁড়িয়েছিল একদিন। পর্দার আড়ালে কোনো পলোনিয়াস না থাকায় দৃশ্যপট বড় বেরসিক ভাবে শেষ হল। কলিযুগের পরশুরাম কুঠার ব্যবহার করেন নি। বন্দুকের গুলিতে কামস্পৃহ রেণুকা প্রাণ হারান। হেমেন ভাদুড়ীর জমদগ্নির মতো তপঃপ্রভাব ছিল না, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা আরও বিপুল, আরও গভীর। পুরো কেসটাই ধামাচাপা পড়ে গেল। 'সমন্বয়' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়—'মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়া বিপত্তি।' এই ভাবেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। বহুদিন আগেকার কথা। এ সমস্তই শোনা কথা। হেমেন ভাদুড়ী আজও অপ্রতিহত। অনেকের উপকার করেন। রাজনীতি করেন না, কিন্তু সুবিমল রায়ের রাজনৈতিক পুনর্বাসনে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। অতিবড় সাধুও তাঁর পরশ্রীকাতরতার কথা সরবে অস্বীকার করবেন। কিন্তু হেমেন ভাদুড়ীর পরশ্রীকাতরতায় তাঁর অতি বড় মিত্ররাও নিয়মিত শঙ্কা প্রকাশ করেন। সুবিমল রায়ও নাকি হেমেন ভাদুড়ীর কাছে ছেলেমানুষ।

—প্রফেসর উইলমেয়ার হঠাৎ কলকাতায়। বছর চারেক আগে একবার আলাপ হয়েছিল। তবে আমাকে চেনেন।

—স্বামীজীর সঙ্গে ব্যাংকক থেকে এসেছেন। সুবিমলের এখানেই আছে। দুবার গেছি, দরজা বন্ধ। সন্ধ্যেতে উপবাস ভঙ্গ করবেন। এ রকম জেনুইন একটা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। বাড়িয়ে বলবো না, প্রফেসার উইলমেয়ার তোমার কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছেন।

—পাকাপাকি কী ব্যাংকক থাকাই ঠিক করেছেন? প্রফেসার উইলমেয়ার কী কালিফোর্নিয়ায় আর ফিরবেন না?

—নিজের পরিকল্পনার কথা বলছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এই মানুষটির পাণ্ডিত্য সত্যিই অতুলনীয়। ব্যাংকক ছাড়বেন কী

বলছো অরুণ, থাইল্যাণ্ডকে সত্যিই মানুষটি ভালবেসেছেন। পরন্ত বোধহয় গয়া যাচ্ছেন। আমি বাবা অতশত বুঝি না, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম নিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের এমন চমৎকার সোসিও-পলিটিক্যাল এ্যানালিসিস সত্যিই আমি দেখিনি। প্রথমে ভেবেছিলাম আমাদের স্বামীজী হয়তো সাহেব গেরুয়াধারী দেখে ভুলেছেন। এখন বুঝতে পারি স্বামীজী অসম্ভব মানুষ চেনেন।

কথায় কথায় সামনের করিডোরে এসে ঢুকি। প্রশস্ত অঙ্গনে ভক্তবৃন্দ অপেক্ষারত। হেমেন ভাদুড়ী সুতপাকে বলে,

—চলুন ওপরে যাই। স্বামীজীকে সেখানে কাছাকাছি পাবেন। স্বামীজীকে পূর্বে কখনও দর্শন করেছেন ?

সুতপা সুন্দর মনরাখা কথা বলে,

—না। তা ছাড়া স্বামীজী তো কলকাতায় খুবই কম থাকেন।

—তা ঠিক। এত ব্যস্ত থাকেন। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হয়তো ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছেন। কী আশ্চর্য চোখ, সবই দেখতে পান। আমাকে দেখেই বললেন, তুমি অসুস্থ শরীরে দমদমে না এলেই পারতে। হাতটা মাথায় রাখলেন। সে যে কী অনুভূতি অরুণ! আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না।

করিডোরের মুখে সুবিমল রায়। একটা জায়গায় এই মানুষটি সত্যিই অতুলনীয়। আমি তাঁর বেতনভুক কর্মচারী। সুতপাকে দেখে যেন ধন্য হলেন। সস্নেহে বলেন,

—বেশ কিছুদিন পরে দেখছি। ভাল আছো তো ?

পর মুহূর্তেই আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—তোমাকে আমি আরও কিছুক্ষণ আগে আশা করেছিলাম। আমাকে তো দু'জনকে সামলাতে হচ্ছে। দাদা আপনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন ?

শেষের কথাগুলো সুবিমল রায় হেমেন ভাদুড়ীকে বললেন।

—নিচে ছিলাম। এই তো অরুণকে নিয়ে এলাম।

—অরুণকে আপনার দেখতে হবে না। আপনি বাবার কাছাকাছি থাকুন। ওদিকে প্রফেসর উইলমেয়ার কিন্তু এখনও দরজা খুলছেন না।

হেমেন ভাদুড়ী ঘড়ি দেখে বলেন,

—ব্যস্ত হবার কারণ নেই। সাতটার সময় প্রফেসর উইলমেয়ার উপবাস ভঙ্গ করবেন। দরজা খুলবেন তখনই। দরজা কী ভেতর থেকে বন্ধ ?

—না। ভেজানো। খুলতে সাহস হচ্ছে না।

—খুলবেন না। নিজেই খুলবেন।

—স্বামীজীর ঘরে কে ?

—বিশাখা দেবী ও মীনাক্ষী আছে।

—ঘুম হয়নি।

—বোধ হয় না।

—রাণীক্ষেতে আশ্রম করবার প্ল্যান সম্পর্কে কিছু বললেন ?

—আপনাকে একবার বোধ হয় খুঁজছিলেন। আশ্রমের ডিজাইনটা পছন্দ হয়েছে। 'হাই-ডোম'টা দেখে খুশী। বাবা বলছিলেন, আশ্রমের বাড়িটা হবে মন্দির, মসজিদ, গির্জা আর বৌদ্ধ প্যাগোডার এক মিশ্রিত রূপ। আইডিয়াটা কিন্তু চমৎকার। অবশ্য তাতে খরচা অনেক।

—খরচের দিকটা আমি ভাবছিই না। স্বামীজী এখন রাজি হলে হয়।

স্বামী কামদানন্দ প্রসঙ্গে আমি আগে বলেছি। তবে সে সমস্তই শোনা কথা। সুবিমল রায়ের জীবনের উঠতি-পড়তি আখ্যানে বিশাখা-ঘটিত ভক্তি ও আদি রস মিশ্রনের মুখরোচক চোলাই আমি পরিবেশন করেছি অনেক আগেই। স্বামীজীর নির্দেশনায় একটার পর একটা রাজনৈতিক কানামাছি খেলায় সুবিমল রায়ের অত্যাশ্চর্য ক্রীড়া-কৌশলের ভয়ানক রস কিছু কিছু আমি তুলে ধরেছি।

স্বামীজীকে যেন নতুন করে দেখলাম। ঠিক দেখলাম না—দর্শন করলাম।

নিখুঁত চেহারা। প্রায় ছয় দুই বা ছয় তিন। বয়েস হয়েছে বিস্তর কিন্তু চোখে মুখে তার ছাপ পড়েছে সামান্যই। এতটুকু ঝুলে পড়া নয়, কোঁচকানো নয় কণামাত্র। প্রশস্ত ললাটে বলিরেখার ক্ষীণ আভাসও অনুপস্থিত। শালপ্রাংশু দীর্ঘ মেদবিবর্জিত গঠন। সিল্কের গেরুয়ার তলায় সুন্দর গৌরকান্তির অস্পষ্ট আভাস।

সুবিমল রায়কে আমি বহু জম-জমাট অবস্থার মধ্যে দেখেছি। পালাম এয়ার পোর্টের লবিতে, রাজভবনের চা-চক্রে আমি দেখেছি। অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পপতি, শ্রেষ্ঠ জননেতা ও বহু দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গেও তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু স্বামী কামদানন্দের সামনে সুবিমল রায়ের আশ্চর্য এই প্রাকৃতরূপ আর কোথাও আমার নজরে আসেনি।

স্বামীজীর পায়ের ওপর সটান চুপচাপ পড়ে থাকা দেখে আমার কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কথা মনে হয়নি। চাকরির উমেদারীতে ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবার সঙ্গেও মিল খুঁজে পাইনি। মনে হয়েছে, গরুর গাড়িতে বিস্তর পথ পেরিয়ে সদরে এসে, এক বিত্তবান মূর্খ খোঁজ নিয়ে ক্ষমতাবান উকিলের যেন পা জড়িয়ে ধরেছে কোনো ফৌজদারী মামলা জিতবার তাগিদে।

ঘরটি সাজানো নিখুঁত। সাধু-সন্ন্যাসীর অতি পরিচিত রঙচঙ একেবারেই অনুপস্থিত। বাসী ফুল-বেলপাতা নেই। সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল নেই। চন্দন চর্চিত শিবলিঙ্গের চিহ্ন ছিল না ধারে কাছে। একটা নরম গন্ধ ছিল—তবে তাকে চন্দন বা ধুনো বলে ভুল করা মুশকিল। স্বামীজীর ললাটে রক্তটিকা নেই, বাঘছালের চিহ্ন নেই কোথাও। আকর্ষণীয় কণ্ঠে তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের কথা বা কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়ে তোলবার সহজ ব্যাখ্যা নেই। মূলাধার পদ্মে শিবশক্তি-আলোচনায় ভৈরবীচক্রের কথাও অনুপস্থিত।

একটু কাত হয়ে বসেছিলেন স্বামীজী। সামনে ভক্তবৃন্দ। নিতান্তই ঘরোয়া বৈঠক।

ভক্তরা বেশ ঝাঁজালো। গরীব লোকের বালাই নেই কোথাও। ভক্তবৃন্দের মধ্যে আমার চেনামুখও আছেন। সস্ত্রীক এই প্রথম দেখলাম অনিলকান্ত বোস-কে। আই. সি এস.—পি. এন. রয় তারপর। হেমাঙ্গ সুর আর অলক সেনকে প্রথম আমি ধুতি-পাঞ্জাবী পরা অবস্থায় দেখলাম। মুখে চুরুট না থাকায় হেমেন ভাদুড়ীকে সত্যিই চেনা মুশকিল। ব্রীজলাল থাপার, হনুমানদাস লালা আর দশরথ কোলে একটু আলাদা বসেছেন। পা ভেঙে বসতে অমর চাটুয্যে নিতান্তই অনভ্যস্থ। কষ্ট হচ্ছে।

স্বামীজীর আসা ব্যাংকক্ থেকে সোজা কলকাতা। থাইল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে এই প্রথম সবার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

এয়ারপোর্টে বহু ভক্তজনের কাকুতি-মিনতি ব্যর্থ হয়েছে। ঝলমলে অনেক গাড়িই ফিরে গেছে। রাণওয়ের ওপর গলার টাই লুটতে আরম্ভ করেছিল শিবাজী নন্দার পায়ের ওপর শুয়ে পড়ে এই দুর্ধর্ষ শিল্প-পতিকে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখে পাঞ্জাবী সোফারও ভড়কে গিয়েছিল। আমি নির্বাক। এই লোকটিকে আমি ধর্মঘটী শ্রমিক-নিধনযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত হিসাবে ভীতিপ্রদ তাণ্ডবলীলার সৃষ্টি করতে দেখেছি মেটেবুরুজে। কুলি শেডে গুর্খা নামিয়ে দিয়ে শত শত মেহনতি মজুরের সামান্য ময়লা সংসার রাস্তায় এনে আছড়ে আছড়ে ভাঙতে দেখেছি।

অবারিত অশ্রুধারা বিফলে গেল। দুর্মূল্য গলার টাই মলিনই হলো শুধু। স্বামীজীর সঙ্গে অদৃশ্য এক গাঁটছড়া বাঁধা সুবিমল রায়ের। মীনাক্ষী ধরের কাঁধে ভর দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন স্বামীজী। সুবিমল রায় তারপর।

হেমেন ভাদুড়ীর সঙ্গে অন্য একটা গাড়িতে উঠলেন প্রফেসর উইলমেয়ার। বিশাখা দেবী তাঁর সঙ্গ নিলেন। খুব কমই দেখেছি,

তাই গগল্‌স্‌ পরা বিশাখা দেবীকে প্রথমটা আমি চিনতে পারি নি। সিল্কের সাদা শাড়ির আঁচল হাতে ছিল। কানে এতবড় হিরে আমি আগে কখনও দেখিনি। ভদ্রমহিলা সত্যিই সুন্দরী। এত বয়স হয়েছে মনেই হয় না। বহু মানুষের ভীড়। কিন্তু একমাত্র শিবাজী নন্দার সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলতে দেখলাম।

প্রফেসর উইলমেয়ার হঠাৎ স্বামী কামদানন্দের সঙ্গে ব্যাংকক্‌ থেকে যে কেন এসেছেন বুঝলাম না। কেউই জানতেন না। শুধু হেমেন ভাদুড়ী খবর পেয়েছিলেন।

প্রফেসর উইলমেয়ার একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি। ক্যালিফর্নিয়া য়ুনিভারসিটির পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর অধ্যাপক চমৎকার চীনা ভাষা জানেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। দালাই লামা ভারতে এলে কিছুদিন মুসৌরী ছিলেন। কেনেথ গলব্রেথের মত না হলেও খুব লম্বা। এখন ব্যাংকক্‌ থাকেন পাকাপাকি। সব কিছুই ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের জন্ম, প্রসার ও ক্রমবিবর্তনের ওপর নাকি গবেষণা করছেন। দেখা হয়েছে কয়েকবার। পরিচয় আছে সামান্যই। হেমেন ভাদুড়ীর কথা শুনে মনে হয়, আমাকে ভুলে যান নি।

স্বামীজীর বক্তব্য বিষয় কিন্তু আমাকে অবাক করলো। বেদ-বেদান্ত, উপনিষদের কথা নেই। এ্যাবস্ট্রাক্ট একটা 'তিনি'কে নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা হলো না। ওপরওয়ালার ওপরেও যে ওপরওয়ালা আছেন, সে প্রসঙ্গের অবতারণা করে ফিরিওয়ালার মত হাসি নেই। স্বামী কামদানন্দের বাণী শুনে আমার মনে হলো যেন মাথা কামানো এক আমেরিকান কূটনৈতিক প্রতিনিধি দূরপ্রাচ্যে ডলার নৃত্য-নাট্যের প্রযোজনায় এসেছেন।

কণ্ঠে এতটুকু জড়তা নেই। নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণে গদ গদ জড়িমা।

—Thailand, one of the most affluent countries

in all of Southeast Asia. A nation which is justifiably proud of its record as the only country in Southeast Asia never colonized by the West. Today, Thailand is riding the crest of an unprecedented economic boom. But Thailand is also a country geared for war. This country is already playing a crucial role in the battle for control of Asia. All U. S. air strike against Communist forces in Laos originate in Thailand. American planes based in Thailand accounted for at least 80 per cent of the bombing raids over North Vietnam···if Peking is allowed to topple any country in Southeast Asia, the remaining nations, one after another, will succumb to Red China. Today the Thais are convinced that Communist China is on the march in Asia. Thais are aware that, after South Vietnam, their country is next on Mao's list of candidates for 'wars of national liberation.' Peking-backed guerrilla bands—

হঠাৎ নরম একটু স্পর্শ। ফিরে দেখি মীনাক্ষী ধর। অনুসরণ করবার ইঙ্গিত করলেন। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

—দাদা তোমাকে প্রফেসার উইলমেয়ারের ওখানে যেতে বললেন। সবাই এখানে থাকলে চলবে না। হেমেনবাবুও তোমাকে ডাকছেন।

করিডোরের অপর প্রান্তে বিশাখা দেবী। হাতে আঁচল, চোখে ঢুলুঢুলু চাউনী। ব্যস্ত পদক্ষেপ। কাকে যেন খুঁজছেন—পাচ্ছেন না।

'তুমি কী ব'ল মীনা', বিশাখা দেবী সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—কী ব্যাপারে দিদি?

—সুবিমলবাবুকে তুমি রাজি করাও। শিবাজী নন্দা যদি একদিন তাঁর বাড়িতে স্বামীজীকে নিয়ে যেতে চান তাতে যেন বাধা না দেন।

—আমার কথা কী শুনবেন। আপনি বললেই হবে।

—এমন অবুঝ।

বিশাখা দেবী আমার দিকে ছোট্ট করে মুখ তুলে তাকাতেই মিসেস খর বললেন,

—অরুণকে চেনেন নিশ্চয়ই।

'জার্নালিস্ট',—সপ্রসন্ন হেসে বিশাখা দেবী হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'শুনেছি, হেমেনবাবু বলছিলেন'।

—বোম্বেতে আপনার বাড়িতে আমি তো একবার গিয়েছিলাম।

—মনে আছে।

বেশ বুঝলাম বিশাখা দেবীর একদম মনে নেই। পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এসে বিশাখা দেবী আবাব বললেন,

—তুমি একটু বলো।

—স্বামীজী কী বলেন ?

—এ সম্পর্কে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই। সুবিমলবাবু যা বলবেন তাই করবেন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না মীনাক্ষী, শিবাজী নন্দা রাণীক্ষেতের আশ্রমের পেছনে কী পবিমাণ খরচা করবেন বলে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া শিবাজী নন্দা মনে কষ্ট পাবেন।

—আমার বলার বলবো। কিন্তু আপনার কথা দাদা কখনই ফেলতে পারবেন না

—কই শুনছেন। সুবিমলবাবু উল্টে বলেন, কলকাতায় যতদিন আছি, আমাকে নাকি তাঁর এখানেই থাকতে হবে। এদিকে স্বামীজীর যা শরীরের অবস্থা কিছুদিন বিশ্রাম না নিলেই নয়। অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। এবার বেশ কিছুদিন আমি নিজের কাছে রাখবো। ভাবছি মানালীতে নিয়ে যাব।

—আপনাকে কিন্তু অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

একটুকরো হেসে বিশাখা দেবী বলেন,

—দেখছো তো কী ভাবে দিন যাচ্ছে। তাছাড়া প্রফেসর উইল-মেয়ারকে নিয়ে আমার আরও চিন্তা। এদিকে স্বামীজীর অবস্থা তো জান। সব সময়ই কাছে কাছে চান। এ সপ্তাহটা এ রকম চলবে।

বিশাখা দেবী চলে গেলেন। অপস্রিয়মান বিশাখা দেবীকে দেখছিলাম।

এই সেই বিশাখা দেবী। আদৌ ইনি শাখাহীন নন। তাঁর বিস্তৃত জীবনের বহু শাখা প্রশাখার খবর আমার জানা। হুড়মুড় করে এসে যাওয়া প্রথম যৌবনের শাখায় শাখায় ফুল এসেছিল অনেক করে। শীর্ষশাখায় অত্যাশ্চর্য এক ফলের সন্ধানও আমার অজানা নয়। সেনাপতির যোগ্যতা ও সততা নিয়ে সুবিমল রায় সেই চোরাই প্রেমের সঞ্চয় রক্ষা করেছেন। লালন করেছেন নির্লোভ চিত্তে। আপাতদৃশ্য এই সুন্দরী ললনার চেয়ে থাকার মত রূপটুকুই সব নয়। বিশাখাকে গড়তে গিয়ে রসিক বিশ্বকর্মার প্রয়োজন হয়তো হয়নি, কিন্তু বুঝতে পারি এই কঠিন শহরের বুকে কলিকালের অজস্র সুন্দ-উপসুন্দ নিকেশ করতে হলে এই রকম মহিলাই দরকার।

রাসেল স্ট্রীটের ফুল ও ফলের ফলন শেষ করে বিশাখা বিত্তে ফলাতে আসেন জীনিভাতে। বিশ্ব শ্রম দপ্তরে কনসিলিয়েশন চর্চা। নিউইয়র্কে বছরখানেক রিকন্‌সিলিয়েশন। স্বামীজীর কন্‌সোলেশন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নিয়মিত এসে পৌঁচেছে। 'সোস্যাল স্টাডি'-র অজুহাতে ইয়োরোপের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দৌড়োনো। আসে যুদ্ধ। নাজিরা ক্যালেতে 'মুলো' বাড়ানোর আগেই তিনি 'ডুভর' ছেড়ে লণ্ডনে আসেন। শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। একটা অবাধ্য ও অস্থির চরিত্র কিন্তু শাসনে আসে না। বহুবিধ চর্চাতে ও বহুজনের সাহচর্যে সে বিক্ষিপ্ত মন আরও বিক্ষিপ্ত হলো শুধু। স্বামীজীর বাণী আসতো। তাতে বিভ্রান্ত হতো চিত্তই। সতীর দেহত্যাগ ও তার খণ্ড খণ্ড দেহাবশেষে অজস্র পীঠস্থানের কথা আমরা পুরাণে পাই।

কিন্তু বিশাখার ইয়োরোপ ভ্রমণ, প্যারী, কাপ্রি আর হ্যানোভারের হোটেল কাফে আর রেজির দৃশ্যকাব্যের কোনো হদিশ তাঁর নিত্য পুরাণের ডায়েরীতে অনুপস্থিত।

ভারতে রওনা হন ঘটা করে। বিলেতের এক নিয়োগপত্র নিয়ে এলেন বোম্বেতে। জাহাজে ডাঃ ত্রিগুণা বসুর সঙ্গে আলাপ। দন্ত-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বসু। মানুষের দাঁত নিয়েই তাঁর করে খাওয়া। ডাঃ বসুর কেবিনে দাঁত দেখাতে এসেছিলেন বিশাখা।

জাহাজে দাঁতের চিকিৎসা চললো। কিন্তু সঙ্কট দেখা দিল অন্য জায়গায়। বেয়াড়া দাঁত সাঁড়াশী চালিয়ে উৎপাটন ,করা সম্ভব। কিন্তু শরীর ও মনের সমস্ত জায়গায় ডেন্টিস্ট-এর বড় কিছু করবার নেই। অদৃশ্য এক সাঁড়াশী অভিযানের ফেরে পড়ে স্বয়ং ডেন্টিস্ট ধরাশায়ী হলেন। রোগী তিনি নিজে। বিশাখা দেবীর বইয়ের সংগ্রহ থেকে নিজের কেবিনে নিয়ে গেলেন। সে কেতাবে আর যাই থাকুক দাঁতের যন্ত্রণার উপশমের আলোচনা নিশ্চয়ই ছিল না।

বোম্বেতে কাজে যোগ দিলেন বিশাখা দেবী। স্বামী কামদানন্দ হাসতে হাসতে মেরিন ড্রাইভের ফ্ল্যাটে এসে দেখা দিলেন। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বিশাখা বললেন—শোয়া চার লাখ টাকা আমার মোট খরচ হয়েছে। প্রশ্ন করলে মোটামুটি হিসেব দেখাতে পারি।

স্বামী কামদানন্দ হিসেব-নিকেশে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। শুধু দাঁতের প্রসঙ্গ তুলে ডেন্টিস্ট ডাঃ বসুকে চেপে ধরলেন। প্রশ্নগুলো ছোট ছোট কিন্তু বিভ্রান্তিকর। সর্বনেশে লুজ বলের মতো। বিশাখা টুকটুক করে ঠেকিয়েই যান শুধু। ব্রেক, সুইং আর বাউন্স-এর ওপর নজর রাখেন।

স্বামীজী ক্রিকেট খেলায় পারদর্শী হয়তো নন কিন্তু বিশাখার ব্যাটিং-এ কৌতুক প্রকাশ করেন। হঠাৎ বেমওকা ঝোঁকে বসলেন অব্যর্থ এক ফুলটস। স্ট্যাম্প ছিটকে পড়লো অনেক দূর। নতমস্তকে প্যাভিলিয়নের দিকে বিশাখা গেলেন না। পপিং ক্রিজের ওপর ভেঙে

পড়লেন। স্বামীজীর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন।

সহাস্যে স্বামীজী অভয় দেন,

—Bring your mind under perfect control. Overcome irritabilities and impulses. Abstain from gratification of desires.

ডাঃ বসুকে কিন্তু পছন্দই করলেন স্বামী কামদানন্দ। বোম্বেতে দাঁতের দোকানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র ও হস্তরেখা বিচারে আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও ডান হাতের তালু নিরীক্ষণে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকলেন ডাঃ বসু।

ভরসা পেলেন স্বামী কামদানন্দ। দেখলেন নিজের অধিকার অব্যাহত থাকবে। বিশাখার একটা অবলম্বনও বড় দরকার। আশীর্বাদ রেখে মাদুরায় চলে গেলেন স্বামীজী।

বোম্বেতে অনেক কিছুই দেখার আছে। কিন্তু ট্যুরিস্ট অফিসের খাতায় ডাঃ বসুর দাঁতের দোকানের নামটাও থাকা উচিত ছিল। বিপুল অর্থব্যয়ে তৈরী। স্বামী কামদানন্দ সমস্ত ব্যয় বহন করেছেন।

ডাঃ বসু দাঁতের ব্যবসায় অর্থ করেছেন প্রচুর। পশার জমিয়েছেন বিস্তর। স্বামী কামদানন্দের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে একটা বেদনা অনুভব করেন। বিশাখা যেন থেকেও নেই। মন তার দুশ্চিকিৎস্য। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে মাথা কামানো দুর্বিসহ এই স্বামী কামদানন্দ আজও দুর্ভেদ্য।

যোগ্য শিষ্য সুবিমল রায়। কিছু কিছু জায়গায় শুধু মিল নয়, যেন পুরোপুরি কার্বন কপি। বিশাখা দেবী ও মীনাক্ষী ধরের মধ্যেও ফারাক খুব বেশী নয়। বিশাখা দেবী একটু বেশী মেম সাহেব। মীনাক্ষী ধর কিছুটা স্বাভাবিক।

বার বার আমার ভয় হচ্ছিলো সিমলার কটেজ নিয়ে সুলেখা বক্সীর

প্রসঙ্গ আবার আমাকে একা পেয়ে হয়তো তুলে বসবেন মীনাক্ষী ধর। ছাড়া পেতে চেষ্টা করি,

—সুতপাকে স্বামীজীর ওখানে বসিয়ে রেখে এলাম। বেচারা একা পড়ে গেছে।

—কেন, তোমাদের মৃগেন দত্তের সঙ্গে এই মাত্র দেখলাম। লনে ওরা অর্কিড দেখছে। স্বামীজী ব্যাংকক্ থেকে প্রায় চল্লিশ রকমের অর্কিড এনেছেন। বলছিলেন কাল, প্রায় ত্রিশ রকমের কলা আর সাতশো পঞ্চাশ রকমের অর্কিড থাইল্যাণ্ডের এক আশ্চর্য সম্পদ।

—বলেন কী। সাতশো পঞ্চাশ রকম।।

—'আন্টি তুমি এদিকে', বাঁক ঘুরতেই মুখোমুখি দেখা। পুরো সাহেবী পোশাকে পবিত্র তালুকদার। সঙ্গে এক তরুণী। তালুকদারকে যথেষ্ট চিনি। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন। সঙ্গের তরুণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

—আর্টিস্ট অহল্যা মিত্র।

মিসেস ধর আমার কানে কানে বললেন,

—স্যার যশোদাদুলাল মিত্তিরের নাতবৌ।

মাত্রাধিক আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখি। সহাস্যে ছোট্ট নমস্কারের সঙ্গে স্ফুরিত ওষ্ঠাধর থেকে সুরেলা কণ্ঠে বলেন,

—ভালু আছেন!

পবিত্র তালুকদার একটু মুটিয়েছেন। ইদানিং কালে বুদ্ধিজীবী মহলের একটি বিশেষ বিচ্ছিন্ন চরিত্র। আরও শতখানেক বছর লালন পালন না করে দেশটাকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ায় সব চেয়ে মর্মাহত হয়েছেন পবিত্র তালুকদার। গুরুবাদের দেশ, তাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা নাকি বড় বেশী বাড়াবাড়ি করেছি। বাঙালীরা এখনও 'বাবু কালচার'-এ আচ্ছন্ন। মাকু টানার ঐতিহ্য, সুপারসনিক্ জেট্ দিয়ে আমরা কী করবো? এ দেশের ইংরেজী এডিটোরিয়াল জুনিয়ার ছাত্রদের ব্যাকরণের ক্লাশে

ভ্রম সংশোধনের প্যাসেজ হিসাবে ব্যবহার ক'রে বিলেতের মাস্টাররা নাকি মৌলিক প্রশ্নপত্র তৈরীর পরিশ্রম থেকে রেহাই পান। এ সবই তালুকদার সাহেবের মৌলিকতা।

—ভাববেন না দেখিনি! 'লাস্ট-স্ট্রংহোল্ড' ইদানীং কালে হয়তো সবচেয়ে ভাল লেখা। আমি মিঃ ভাদুড়ীকে বলেছি।

—অক্সফোডের আড়ং ধোলাই ছাড়া আপনার তো সব কিছুই মনযোগ মিটারের জিরো পয়েন্টের তলায় থাকে।

—আপনি কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। পরিচিত অনেককেই লেখাটা আমি পড়তে বলেছি। একজনের কথা আমার লেখাটা পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েছে। চার্চিল তখন পঁচিশ বছরের যুবা। বুয়র যুদ্ধ থেকে ঘরে ফিরেছেন। চার্চিল বলছেন—I think we shall have to take the Chinese in hand and regulate them. I belive in the ultimate partition of China. The Aryan stock is bound to triumph. ভাবতে পারেন মিঃ সান্যাল। অনেক আগেই উচিত ছিল। এই লোকটাকে পৃথিবী ঠিক মর্যাদা দিতে পারেনি।

মিসেস ধরের সঙ্গে অহল্যা মিত্রের নিচু পর্দায় কী যেন কথা চলছিল। চোখাচোখি হতেই হেসে বলেন,

—দেখা হয়ে গেল তাই বলে রাখি। আসছেন কিন্তু আর্টিস্ট হাউসে।

আন্দাজে বুঝতে হলো,

—প্রদর্শনী আপনার সুরু হচ্ছে কবে।

—সতেরই খোলা হবে। আঁদ্রে উৎরেশিয়ো-কে দিয়ে ওপন্ করাচ্ছি। সতেরই শুধু আপনারাই। আঠারো থেকে খোলা হবে।

—বেশ তো নিশ্চয়ই যাব।

—নিমন্ত্রণ অবশ্য করতে যাব।

অহল্যা মিত্র বেশ খানিকটা লম্বা। প্রায় পাঁচ-আট বা পাঁচ

নয়। একমাথা ধূসর চুল কাঁধে আর গলা পর্যন্ত এসে গোল পাকিয়ে গেছে। তেলতেলা মুখ। অনেকটা বড় লাল সিঁদুরের টিপ। লম্বাটে দেহটিতে এতটুকু ব্লাউজ। শাড়িটা আলগাভাবে দেহের সঙ্গে লেপটানো। স্খলিত চলন। কোমরের মাঝখানের অবতল ও সমুখের নতোদর প্রকাশিত হয়ে পড়েছে অনেকটা। সবটা মিলিয়ে অহল্যা মিত্রকে ফ্যাসানের কাগজের টান-টোনের ফিগারের বিজ্ঞাপনের মত দেখতে।

—আমার ছবি আপনার কেমন লাগে?

—আপনার হাত খুব মিষ্টি।

—আমার ছবি দেখতে আসবেন কিন্তু। 'সমন্বয়'-এ আসবো।

—না এলেও সতের তারিখের কথা মনে থাকবে।

'বলছেন', আঁকা ভ্রূলতায় কৌতুক খেলে যায় অহল্যা মিত্রের।

ইমপ্রেশনিস্ট অহল্যা মিত্রকে আমি বুঝতে পারি। ছবির প্রদর্শনী যাই হোক কিন্তু আমার লেখায় রঙ-রেখা গোলমাল হলে চলবে না। কুমারিল ভট্টের পৌরাণিক অহল্যা-ইন্দ্রের রূপক উপাখ্যানের নজীর টেনে আজ লাভ নেই। নতুন বেদের ভাষ্যকারকে একটু সতর্ক হতেই হবে। কলিযুগের এই অহল্যা মিত্রদের গৌতম ঋষির অভিশাপে জড়, বায়ুভুক ও অনুতপ্ত জীবনযাপনের আশঙ্কা নেই। তবে স্যার যশোদাদুলাল মিত্তিরের অদৃশ্য অভিশাপে আমার মত ইতরজনেব নপুংসক হবার ভয় সর্বসময়ই উপস্থিত। ইন্দ্রের কপালে উৎপাটিত মেষাণ্ডের বরাদ্দ ছিল কিন্তু আমার ভরসা কোথায়? আমার চতুষ্পার্শে এফ. আর. সি. এস. পিতৃদেবরা ভ্যাসেকটোমি-র ছুরি উঁচিয়েই আছেন।

প্রফেসার উইলমেয়ার উপবাস ভঙ্গ করেছেন। সাদা পাথরের থালায় অনেকটা পাকা পেঁপে। সন্দেশ আর কলা। মুখে কাঠি গোঁজা মাথা-কাটা কচি দুটি ডাব সামনে রাখা। একটু কাত হয়ে

বসেছেন প্রফেসর উইলমেয়ার। দু-এক টুকরো পেঁপে কাঁটায় তুলে নিচ্ছেন। ঘরে প্রশান্ত রায় চৌধুরী ও হেমেন ভাদুড়ী ছাড়া কেউ নেই।

সামান্য একটু ঠোঁটে হাসলেন। বসতে বললেন ইঙ্গিতে সুন্দর মুখশ্রীতে উপবাসের ক্লান্তির ছাপ। দৃষ্টি গভীর-প্রশান্ত।

হেমেন ভাদুড়ী হঠাৎ আবিষ্কার করলেন,

—তোমার স্ত্রী কোথায় অরুণ ?

—অর্কিড দেখছে।

—নিয়ে এসো। এখন লোকজন নেই, আলাপেব এইতো সুযোগ। যাক আমিই যাচ্ছি। ধরে আনছি।

হেমেন ভাদুড়ী ঘর থেকে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন।

প্রশান্ত রায় চৌধুবীর সঙ্গেই অধ্যাপকেব কথা চলছিল। ভদ্রলোকের পাণ্ডিত্য অসীম। বিপুল এশিয়ার হাজারো দেশের কী অপূর্ব সব ইতিহাস এই মানুষটির নখদর্পণে। নিজে আমেবিকান কিন্তু চেহারা ও আকৃতিগত গঠন ছাড়া কথাবার্তা ও জেশ্চাবে একটা প্রাচ্যের ঢঙ আশ্চর্যরকম উপস্থিত।

কনফুসিয়াস মতবাদ সম্পর্কে এই মানুষটির মৌলিক গবেষণায় মুগ্ধ হতে হয়। সহজ করে বোঝানোর ক্ষমতাও অপূর্ব। কনফুসিয়াস-এর অনুগামী মেঙ্-ৎসে ও শুন্-ৎসে-র আমলে মানব কেন্দ্রিক কনফুসিয়াসের ধর্মচিন্তা কী ভাবে দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল, নজীর দেখিয়ে সুন্দর বলে যান। চীনের স্বৈরতন্ত্র শাসনে কনফুসিয়াস মতাবলম্বীদের ওপর কী ভয়াবহ অত্যাচাব হান বংশের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সে সম্পর্কে আমার নিজের তার একটা ধারণাই ছিল না। তুঙ্ চুং-শূ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় চীনে রাজধর্ম হিসেবে এই মতবাদের স্বীকৃতি ও পরবর্তীকালে তাও ও বৌদ্ধ মতবাদের বিস্তার ও উৎপীড়িত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, নির্জীব কনফুসিয়াস মতবাদ হান-য়্যূ-র দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হবার সরল ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হতে হয়।

অধ্যাপক উইলমেয়ার-এর 'লামাইজম' পুস্তকটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ য়ুনিভার্সিটিতে উচ্চ প্রশংসিত। তিব্বতকে চীন গ্রাস করলে, দালাই লামা পালানোর আগেই, তিব্বত যে চীনের অংশ নয় সে সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইমস্-এ যে একাধিক প্রামাণ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের এক বীর পুরুষ তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যাপক উইলমেয়ার-এর 'লামাইজম'-এর সাহায্য নিয়েছেন বহু জায়গায়। বইটি আমি পড়েছি। আশ্চর্য গবেষণা। দুর্লভ সংগ্রহ। পুস্তকটি আমি দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলেছি। বণ্ ধর্মের প্রবর্তক সাধক সেন্ রাব-মি-ভো-র অলৌকিক ক্ষমতা থেকে সুরু করে, তাঁর অসাধারণ দক্ষতায় চীন মহারাজা কনগংসি-কে বণ্ ধর্মে দীক্ষিত করার কাহিনী, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে স্রংসান্ গাম্পোর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম স্থাপনের আখ্যান, বণ্ ধর্মাবলম্বী কৃষ্ণবর্ণের টুপীধারী সম্প্রদায় ও মহাযানী বৌদ্ধদের লালবর্ণের টুপীধারী সম্প্রদায়ের বিরোধ, আচার্য বোধিসত্ত্ব শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভবের লোহিত বর্ণের টুপীধারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও সন্-কা-পা-র প্রবর্তিত ক-দম্ পা সম্প্রদায়ের সঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের মিলনে শক্তিশালী গেলুক-পা সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের সে অতুলনীয় ইতিহাস ও ক্রম-বিবর্তনের তত্ত্ব ও তথ্য বহুল আলোচনা যে কোনো উৎসাহী পাঠককে মুগ্ধ করবে।

পেঁপেটা পছন্দ করছেন অধ্যাপক। একটা ডাব খেলেন। প্রশান্ত রায় চৌধুরী উঁচু করে তুলে ধরলেন।

—তারপর মিঃ সান্যাল, আপনার খবর আশা করি শুভ।

আমি মুগ্ধ। আমি হতবাক। আমার নামটি প্রফেসার উইলমেয়ার এখনও মনে রেখেছেন! বললাম,

—আমার স্মরণশক্তি মোটামুটি পাস নম্বর পায়, কিন্তু আপনি যে এতদিন পরেও আমার নামটা মনে রেখেছেন ভাবলে অবাক লাগে।

—আমার একটা নোটবুক আছে, তাতে যাঁদের আমি পছন্দ

করি তাঁদের নাম লিখে রাখি। তা'ছাড়া আপনাকে আমার যথেষ্ট মনে আছে। মিঃ ভাদুড়ীর কাছে অনেক কথা শুনেছি। আপনার 'লাস্ট স্ট্রং হোল্ড' আমি পড়েছি।

হেমেন ভাদুড়ী আমাকে পছন্দ করেন জানি। আমার নাকি আরও অনেক মর্যাদা পাওয়া উচিত তিনি বলেন। প্রতিভা নাকি নষ্ট হচ্ছে। 'সমন্বয়'-এ থেকে আমার কিছুই হবে না এ কথা হেসে হেসে স্থবিমল রায়ের সামনেই কবুল করতে দেখেছি।

প্রফেসার উইলমেয়ার স্মিত হেসে প্রশ্ন করলেন,

—লেখাটির মৌলিকতা অনস্বীকার্য, কিন্তু এত তথ্য আপনি জোগাড় করলেন কেমন করে ?

বিদ্বান, পণ্ডিত ব্যক্তি প্রফেসার উইলমেয়ার। আমার প্রভূত পরিশ্রম তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কুণ্ঠা নিয়ে বলেছি,

—মৌলিক চিন্তা কিছু আছে কিন্তু প্রকাশিত তথ্যের সাহায্য আমি অনেক নিয়েছি।

মাথা নাড়লেন প্রফেসার উইলমেয়ার। একটা সন্দেশ মুখে তুললেন। তারপর সহাস্যে ধীর কণ্ঠে বলেন,

—হয়তো আমি নিজে ব্যাংকক্-এ আছি তাই লেখাটা আরও বেশী আমার ভাল লেগেছে। সত্যিই বৌদ্ধ প্যাগোডা আজ রাজনৈতিক আবহাওয়ায় দূষিত হচ্ছে। ভারত মহাসাগরের বুক থেকে জাপান, রেঙ্গুন থেকে টনকিং আমি ঘুরেছি। লুয়াংপ্রবাং, ফরমোজা, হংকং বা ব্যাংকক্-এ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মোটামুটি একই নিয়মে চলতে দেখেছি। পোশাক অনেক জায়গায় ধূসর, কারো হলদে বা কারো কালো। কিন্তু প্রায় আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য ধরে এতদিন স্তূপ, চৈত্য, মঠ আর প্যাগোডায় লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর আলোচনা, স্তব আর উপাসনা করতে দেখা গেছে। পুঁথি অধ্যয়নে দেখেছি, অধ্যাপনায় দেখেছি। ভিক্ষা করতে দেখেছি। কিন্তু কোন্ দল ক্ষমতা পাবে, কোন শাসককে ক্ষমতা

থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, এ নিয়ে কোনো রাজনৈতিক জমায়েত করতে দেখা যায়নি। গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে আত্মহত্যা—সত্যিই আজ Buddha on the Barricades.

—বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এই রাজনৈতিক পটভূমিতে অংশ গ্রহণ করা কিন্তু ইন্দোচীনে বহুদিন চলে আসছে।

—ঠিক! ভিয়েতনামে 'বিণ-খুয়েণ' আর 'হোয়া-হোয়া' সম্প্রদায় এক সময় সরকারের পতন ঘটাতে চলেছিল। সেইদিক দিয়ে বিচার করে 'লাস্ট স্ট্রং হোল্ড' লেখাটির 'Buddha on the Barricades' অংশটি এক কথায় অপূর্ব।

অধ্যাপক উইলমেয়ারের কথায় আমি অভিভূত হয়ে পড়ি।

—সিংহলেও এই চলেছে। সোকা গাক্কাই-এর নেতৃত্বে পুরোপুরি একটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সংস্থা আজ জাপানে অতিশয় সক্রিয়। বর্মাতেও এদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

অধ্যাপক উইলমেয়ার আমার চোখের ওপর চোখ রেখে একটুকরো সন্দেশ চামচে তুলে নিলেন। এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন মনে হলো তিনি আমার কথা শুনতে চান। রুমালে মুখটি পরিষ্কার করে 'লাস্ট স্ট্রং হোল্ড'-এর মূল বক্তব্যে আমি আসতে চাই। গ্লোবাল্ ট্রাবল্ মেকার রেড চায়না সম্পর্কে আমি সতর্ক করেছি,

—কতটুকু আমরা জানি! শত্রুর শক্তিকে খাটো করে দেখার মত হঠকারিতা বোধহয় কিছু নেই। মেন-ল্যাণ্ড থেকে অগণিত বৌদ্ধভিক্ষু এসেছে আজ বিশ বছর ধরে। এশিয়ায় তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। 'Buddha on the Barricades' সৃষ্টি করেছে তারাই। আজ মাছি, ভিখারী আর আমেরিকানদের চীনে প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু দেড় যুগ ধরে এই পীত বর্ণের জীব বিভিন্ন পরিচয়ে গোটা এশিয়ায় আজ ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকা মনে করে চীন সম্পর্কে তারা সবচেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল। একথা অর্ধসত্য। তাকলামাকানের লপ-নর-এ আণবিক বোমার পরীক্ষাকেন্দ্র,

পাও-তো-তে প্লুটোনিয়াম রিঅ্যাক্টর-এর কথা তারা জানতে পেরেছে। ইউ-টু আর স্যাটেলাইট ক্যামেরায় দেশের শিল্পসমৃদ্ধির চিহ্ন হিসাবে চিমনীর ধোঁয়ার ফটোগ্রাফ তুলে এনে গবেষণায় তারা সফল হয়েছে। কিন্তু রেড চায়না সম্পর্কে এটুকু জানাই যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয় চীনের সামরিক শক্তির পুরোপুরি হিসেবও যদি পাওয়া যায়, তাতেও খুব একটা সুবিধে হচ্ছে না। চীন কবে আই সি. বি. এম-এর অধিকারী হবে, এ নিয়ে গুরুত্ব দেবার চেয়ে আরও কতগুলো বড় বড় বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার।

—আজ আমাদের সবচেয়ে বড় দরকার সেখানে হচ্ছে কী? দেশের মানুষের চরিত্র কী? অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কী? নেতৃত্ব কী? 'গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড'—পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে সেখানে, কিন্তু একথা তারাও স্বীকার করেছে। তাই চীন আরও কয়েক যুগ পিছিয়ে গেল—এটা আত্মসান্ত্বনা হতে পারে কিন্তু শত্রুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন হলো না। জাপানের চেয়ে চীন অটোমোবাইল-এ অনেক পিছিয়ে আছে। কিন্তু তার আগে জানা দরকার সেখানে শ্রমিকদের বেতন কী? এক পাউণ্ড রুটীর দাম কত? বাচ্চা বিয়োনোর দেশ, মেয়ের সবেতন ছুটির ব্যাপারটা কতটুকু সত্যি? লং-মার্চ আর ইয়েনান কমপ্লেক্স-এ ভোগা বর্তমান বৃদ্ধ ও প্রবীণ নেতৃত্ব কিছুতেই নবীনদের সহ্য করবে না, বা পলিটব্যুরোর যে কোনো সভ্যের বয়স যখন এ্যাভারেজে ছেষট্টি, সেন্ট্রাল কমিটির ষাট—তখন অতি অল্প সময়েই বড় রকমের অনিবার্য পরিবর্তন কেউ ঠেকাতে পারবে না—এ ধরনের ভবিষ্যৎ বাণীর প্রকৃত কোনো মূল্যই নেই।

অধ্যাপক উইলমেয়ার এবার দ্বিতীয় ডাবটি হাতে তুলে নেন। প্রশান্ত রায়চৌধুরী আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। হেমেন ভাদুড়ী ঘরে ঢুকলেন পরক্ষণেই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই বললেন,

—মিসেস সান্যাল ব্যস্ত আছেন। স্বামীজীর সামনে গিয়ে বসেছেন। তাই আর ডাকলাম না।

—সুবিমলবাবু কী আমাকে খুঁজছেন ?

—তুমি এখানে আছো জানেন।

'আমাদের একবার ওদিকে যেতে হয়। চলুন স্বামীজীর ওখানে যাই', প্রফেসার উইলমেয়ার ডাব শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘদেহী প্রফেসারকে হলদে ঢিলে বৌদ্ধ পোশাকে অপূর্ব দেখায়। মাথা কামানো প্রফেসার উইলমেয়ারকে য়ুউল ব্রাইনর-এর চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য মেলে।

ক্ষমতা রাখেন হেমেন ভাদুড়ী। প্রফেসারও দস্তুর মত খাতির করেন। প্রশান্ত রায় চৌধুরী চুপচাপ।

—আপনার দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বলিষ্ঠ। আপনার লেখার অনেক প্রচার হওয়া উচিত। কালিফোর্নিয়া থাকতে এসব কথা আমি বহুবার বলতে চেয়েছি। আপনি লিখুন।

করিডোরের অপর প্রান্তে দেখি সস্ত্রীক অনিলকান্ত ঘোষ। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ মনে করবার কারণ নেই কিন্তু 'সমন্বয়'-এর মৃগেন দত্তকে দেখলাম কোথা থেকে যেন দৌড়ে এলেন পথ দেখাতে।

শোনা যায় পুলিশ হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তালাশ করে অনিলকান্ত ঘোষকে উদ্ধার ক'রে বাইশ লাখ টাকার সম্পত্তি যখন হাতে গুঁজে দেয় তখন হাওড়া স্টেশনের কোথাও বসে তিনি মুড়ি খাচ্ছিলেন। বয়স তখন তেইশ। জনশ্রুতি, সিঙ্গাপুর থেকে সোনার 'বার'-এর গোপন চালানি পয়সা। হাইকোর্টের নির্দেশে উত্তরাধিকারী অনিলকান্ত ঘোষকে পুলিশ খুঁজে বার করে। অন্য দাবীদার অনিলকান্ত ঘোষকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্ত্রী জানবাজারের—জমিদার বাড়ির মেয়ে। স্ত্রী-ভাগ্যেও ধন। হাতিবাগান থেকে বারাসত পর্যন্ত অসংখ্য জমি-বাড়ির মালিকানা হাতে আসে। হাওড়ায় মার্টিন কোম্পানী রেল লাইন বসাতে গিয়ে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেও বিস্তর টাকার।

ঘরে ঢুকে দেখি ব্রীজলাল থাপ্পর সুযোগ পেয়েছেন এতক্ষণে।

-পায়ের কাছে অতি সন্তর্পণে একটা রৌপ্যাধার রাখলেন। সবুজ মিনে করা সোনার বেলপাতা তাতে সাজানো। পাশে প্রণামী। ইদানীং কালে হাজার টাকার নোট বোধ হয় প্রথম আমার নজরে এলো।

খগেন সুর আর অলক সেনের সঙ্গে আই. সি. এস. বকু গুপ্তের চক্র দেখলাম আলাদা বসেছে। খগেন সুর এম. পি—জজিয়তির মাস মাইনে ছেড়ে আবার আইন ব্যবসা করছেন। তবে অলক সেনের পশার আজও বহু ব্যবহারজীবীর মর্মবেদনার কারণ। খাপখোলা তলোয়ারের মত ঝলমল করেন ভদ্রলোক। আই. সি. এস. বকু গুপ্তকে একটু নরম নরম দেখলাম। পে-স্কেলের ম্যাক্সিমামে বসে আছেন দীর্ঘদিন। ক্যাবিনেটের সুনজরে নেই, তাই হয়তো সেক্রেটারীয়েটে ঢুকতে পারলেন না আজও।

শুনেছিলাম, এক ডাক বাংলোর দখল নিয়ে জনৈক ভি আই পি.-র সঙ্গে ওঁর নাকি একবার লেগে যায়। বকু গুপ্ত বলেছিলেন,

—আমরা সরকারী কর্মচারী ট্যুরে এলে সরকারী ডাক বাংলো ছাড়া আমাদের জায়গা নেই। আপনি নেতা, আপনি সামান্য ইচ্ছা দেখালে এ মহকুমায় অন্তত বিশজন ধনী সম্পূর্ণ বাড়িটাই আপনার ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন।

ভি. আই. পি. বাংলো ছেড়ে চলে যান। তিনি নাকি দিল্লী ফিরে যাবার পথে এই হতভাগা মানুষটিকে নিকেশ করে গেছেন।

হলঘর সাজানো হয়েছিল সুন্দর। ভক্তবৃন্দে ঠাসা। উপঢৌকন, প্রণামী আর নৈবেদ্যের স্তূপ জমা হয়েছে একদিকে। সোনার খড়ম, সবুজ মিনে করা সোনার বেলপাতা। নিরেট সোনার হরতকী। কফি সেট-এও সোনার চাদর বসানো। হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা যায় এমন কাশ্মীরী গায়ের চাদর। রৌপ্যাধারে সোনার লবঙ্গ। স্বর্ণাধারে মৃগ কস্তুরী নাভি। সিল্কের গেরুয়া চাদরের ওপর কাঁচা টাকার ঝলমলে স্তূপ।

ঝাঁজালো ভক্তবৃন্দ আসর জমিয়েছেন পছন্দ মত। ব্রীজলাল

থাপার, হনুমান দাস লালার সঙ্গে একত্রে। দু'জনেই মুখে কি যেন বিড় বিড় করছেন। জপ করছেন হয়তো। পা ফাঁক করে সিগার ফুঁকছেন পবিত্র তালুকদার। পাশে তখনও অহল্যা মিত্র। 'ধর্ম' নিয়ে কাকে যেন জ্ঞান দিচ্ছেন। নীটশে কী বলেছেন, কিরকিগড-এর মত কী— নজীর টেনে ইনটেলেচুয়াল ম্যাসট্রেবেশন্-এ এই মানুষটির ক্লান্তি নেই। রাঁচিপুরের রোমহর্ষক সেনগুপ্ত হেমেন ভাদুড়ীর সব কথাতেই কেন যে খুশী হচ্ছেন বুঝলাম না। শুধু মনে হলো রাঁচিপুর ইস্পাত কারখানার যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে বিস্তর টাকার। শ্বেতাঙ্গ যে কোম্পানী অর্ডার পেয়েছেন, হেমেন ভাদুড়ী তার ম্যানেজিং এডভাইসার।

'সমন্বয়' পত্রিকার পুরো স্টাফকে সুবিমল রায় ব্যবহার করছেন নিজের হচ্ছে মত। কে কে অনুপস্থিত তার তালিকা দিতে গিয়েও মৃগেন দত্ত ধমক খেলেন। ভদ্রলোক তাতেও খুশী।

মৃগেন দত্তের অবস্থা দেখে আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের কথা মনে হলো। ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে ভদ্রলোক উপহার কিছুই দিতে পারেন নি। তাই ক্ষমতাশালী ভ্রাতার মন পাবার তাগিদে গায়ে খেটে শোধ দিলেন। কারণে-অকারণে সিঁড়ি ভাঙতে সুরু করলেন। সন্দেশ বাঁচানোর খাতিরে দরবেশটা চালাতে বললেন বেশী। আগে থেকে মেখে রাখায় লুচি শক্ত হচ্ছে বলে উড়ে ঠাকুরকে অতিরিক্ত মাত্রায় কথা শোনালেন। শারীরিক পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত থাকবার কথা নয়, তবু খালি গায়ে বরকর্তার সামনে গিয়ে গামছা দুলিয়ে হাওয়া খেতে খেতে পয়সা দিলেও খাঁটি জিনিস যে বাজারে মেলা দুষ্কর— এই বহু পুরাতন প্রসঙ্গ তুলে চেষ্টাকৃত হো হো হাসিতে আসর জমিয়ে তুললেন।

মৃগেন দত্ত উপহারের ফেরে পড়েন নি। তবু পরিচিত সেই ভদ্রলোকের অবস্থার সঙ্গেই যেন তুলনা মেলে।

বিশ্রাম নেই মৃগেন দত্তের। হৈ হট্টগোলে কোথাকার মাল কোথায় গেছে তার হিসেব তৈরীতে ব্যস্ত। ছ'ফুটের নিওন আলো

কি পরিমাণ আনা হয়েছে তার বিল লক্ষ্য করছেন। সামান্য ক'দিনে এত গ্যালন পেট্রোল কী কারণে লাগতে পারে সেই চিন্তায় মীনাক্ষী ধরের কাছে গিয়ে ড্রাইভারের সততা সম্পর্কে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন। কেরানীরা মেডিক্যাল বিল এ. জি. অফিসে যে নিয়মে কাটা-ছেঁড়া করে, অনেকটা সেই প্রচণ্ডতায় নিউ মার্কেটের ফুল-ওয়ালাদের বিল মৃগেন দত্তের হাতে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল।

আমাকে দেখে সুতপা উঠে এলো। এতগুলো ঝাঁজালো মানুষের মধ্যে আমি জানি সুতপা বিব্রত বোধ করছে। সঙ্গে পরিমল দত্তগুপ্তকেও দেখলাম। সুতপা কী যেন বলতে চায়। ইঙ্গিত করে একটু আড়ালে সরে দাঁড়াই। এসে দাঁড়াতেই হেসে বলেছি,

—ভাল লাগছে না?

সুতপা অন্য কথা বললো,

—আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলে কোথায়? যাবে কখন?

—কেন খারাপ লাগছে?

পরিমল দত্তগুপ্ত হলঘরের বাইরে টেনে আনেন। সিগারেট ধরিয়ে সুতপাকে বলেন, 'আর একটু অপেক্ষা করুন। স্বামীজী এখনই ঘরে যাবেন।'

'অর্কিড দেখেছো?' সুতপা জানতে চাইলো।

—তোমার ভাল লেগেছে?

—অপূর্ব! ঐগুলোই যা ভাল লাগলো।

'বউ খুঁজে পেয়েছো,' পিঠে একটা মৃদু চাপড় খেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি সুবিমল রায়। 'বাড়িটা একটা তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এত লোক যে হবে ভাবতেই পারিনি। তবে মানুষ আছে, আমার কাজের লোক নেই। অধ্যাপক উইলমেয়ারের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?' সুবিমল রায় খুবই খুশী, খুবই ব্যস্ত।

—হেমেন ভাদুড়ী তো সব সময়ই সঙ্গে আছেন। এতক্ষণ ছিলাম।

—সাধক হলেও মানুষটা তো আমেরিকান। আমার ধারণা ছিল শিবাজী নন্দার ওখানে উঠবেন। কিন্তু বিশাখাদেবী ছাড়লেন না। প্রফেসার উইলমেয়ার স্বামীজীর সঙ্গেই থাকতে চাইলেন। হেমেনদা না থাকলে আমি মুশকিলে পড়ে যেতাম। তুমি এতক্ষণ ছিলে আমি শুনেছি। তুমি সময় করে উইলমেয়ারের সঙ্গে একটু থাকবার চেষ্টা ক'রবে।

—প্রফেসার উইলমেয়ার সম্পর্কে কালকের কাগজে একটা ম্যাটার থাকা দরকার। কনফুসিয়াস মতবাদ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এত বড় একজন পণ্ডিত আমি দেখিনি। ভাবছি প্রফেসার উইলমেয়ারকে দিয়ে সম্ভব হলে কিছু বলাবো। আমি অবশ্য আজকের সাক্ষাৎকারটি কাগজে রাখছি।

—খুব ভাল হয়। এসব তুমি যা ভাল মনে কর তাই হবে। স্বামীজীর এয়ারপোর্টে আসার ঘটনাটি আজ সমন্বয়ে কী চমৎকার সাজিয়েছে। সুরেনের ক্ষমতা আছে। বেশ তৈরী করেছো ছোকরাকে।

—সত্যিই লেখাটা ভাল হয়েছে।

সুবিমল রায় চলে গেলেন।

—পরিমলদা আপনি কতক্ষণ? এখানে আপনাকে দেখবো আশা করিনি।

সুতপার দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ একটুকরো হেসে পরিমলদা বলেন,

—আমি স্রেফ মজা দেখতে এসেছি।

—সবটাই উড়িয়ে দিতে চান?

—চল বাইরে গিয়ে বলবো। আমার আর তোমার স্ত্রীর একই অবস্থা। আমি তালে এসেছি, তোমার স্ত্রী এসেছেন বাধ্য হয়ে।

—থামুন আপনি। আপনার স্থান, কাল পাত্র জ্ঞান এখনও হলো না।

পরিমলদা প্রাক্তন ইংরেজ মালিকের বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিকের

এডিটোরিয়াল বোর্ডের ডাকসাইটে কর্মচারী। শিবাজী নন্দা এখন পত্রিকাটির অন্যতম অংশীদার। ইংরেজীটা চমৎকার লেখেন পরিমলদা। বাঙাল। কলকাতার চলতি ভাষা আমার মত রপ্ত করতে পারেন নি। মনে হয় চেষ্টাও করেননি। বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। বিপত্নীক। একটি মেয়ে আছে। এক সময় সমন্বয়-এ ছিলেন। বৃদ্ধা মাকে নিয়ে নিয়মিত গঙ্গাস্নান করেন। মদ খান। সবার সামনে আজও সগৌরবে ঘোষণা করেন, অমিয় পালিত দুটি জিনিস হাতে ধরে শিখিয়েছেন— মদ খাওয়া আর জার্নালিজম।

এমন সময় শোনা গেল তিনি আসছেন। স্বামীজী এবার ওপরে যাবেন। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। ভক্তবৃন্দ এবার বাইরের করিডোরে জায়গা করতে ব্যস্ত। একটু কাছাকাছি। নৈকট্য সুখের আগ্রহ।

বিশাখা দেবী ও মীনাক্ষী ধরের কাঁধে ভর দিয়ে ধীর পদক্ষেপে স্বামী কামদানন্দ এগিয়ে আসছেন। আগুল্ফলম্বিত সিল্কের ঢোলা গেরুয়া। অপূর্ব গৌরকান্তি। সে এক অলোকসুন্দর শোভা। অনেকগুলো হীরের আংটির ঝিলিক। হাতে জপের মালা। সুন্দর মুখশ্রীতে অনতিব্যক্ত হাসির ক্ষীণ আভাস। এই হাসিটুকুই নাকি সব।

ভক্তবৃন্দ নিশ্চল। করজোড়ে নত মস্তকে স্থির। স্বামীজীর ঠিক পেছনেই প্রফেসার উইলমেয়ার। হেমেন ভাদুড়ী পাশে আছেন। শিবাজী নন্দার হাতে রুমাল। ছলছলে চোখ। বিশাখা দেবী ও মীনাক্ষী ধরকে আরও সুন্দরী মনে হলো। আমি স্তব্ধ। বিস্মিত। সম্পূর্ণ হতবাক। মহামান্য এক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছি বলে মনে হলো না। স্বামীজীর অত্যাশ্চর্য ঐশ্বরিক শক্তির কথা বিচলিত করেনি এতটুকু। মনে হলো যেন হারেমে চলেছেন নেরো। হয়তো বা সুরু হলো বাগদাদ সুলতানের আর এক নিশীথাভিসার শেহরাজাদীর গল্প যেন শেষ হয় নি আজও।

হেমেন ভাদুড়ী এক কথায় রাজি হবেন ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম এখান থেকে ছাড়া পেতে রাত হবে। কিন্তু আমার কথায় সঙ্গে সঙ্গে এক গাল হেসে বললেন,

—তোমার খেয়াল আছে, আমি কিন্তু একদম ভুলে গেছি। আজ অন্তত প্রফেসার উইলমেয়ার সম্পর্কে জোরালো একটা কিছু লেখা দরকার। তোমাকেই লিখতে হবে। তোমাকে আটকাবো না। তুমি এসো।

পরিমলদাও আমাদের সঙ্গে এলেন। শূন্য হলঘর। কেউ নেই। বেদীর ওপর উপহার, উপঢৌকন আর প্রণামীর বিপুল সংগ্রহ ছড়ানো। কুকরী হাতে নিয়ে বেদী পাহারায় তিনটে নেপালী পাহারারত।

পরিমলদা আমাদের সঙ্গে বাড়িতে এলেন। শুধু একবার গাড়িতে অর্থপূর্ণ হেসে বললেন,

—বাড়িতে কিছু আছে নাকি ?

—আছে !

—আছে টা কী ?

—চলই না। তোমাকে মোটামুটি আজ ভাল জিনিস খাওয়াবো। 'ডিপ্লোম্যাট' চলবে ?

—তোমারই তো দিন। তোমার মেম সাহেবের আবার আপত্তি-টাপত্তি নেই তো ?

সুতপা হেসে বলে,

—আপত্তি করলেই বড় শোনেন আপনারা।

—স্বামীজীকে কেমন লাগলো বলুন ?

—কী বলবো।

ঘাড় ঘুরিয়ে আমি বললাম, 'সুতপা এ সব বিশ্বাস করে না।'

—তাই নাকি। ঘোরতর নাস্তিক। আমি গিয়েছিলাম শিবাজী নন্দাকে খুশী করতে।

'সুতপাকে তুমি বোঝাতে পারবে না। সুবিমল রায়কে তো

আমি চিনি। ধ্রুববাবু আসেন নি। বাড়িতে বসে 'মনে এলো' ফিচার লেখা এবার বার করবেন। সুতপা তো আমাদের মত পরের চাকরি করে না। কলেজের মাস্টারী ঠিক চাকরি নয়, হেসে হেসে বললাম কথাগুলো।

—খুব বলছো। আমাদের চাকরি নিত্য যাচ্ছে।

—অত সোজা নয়।

বাড়িতে এসেই 'সমন্বয়'-এ একটা ফোন করলাম। প্রফেসার উইলমেয়ারের ওপর লেখাটা আমি রাত দুটো নাগাদ সংগ্রহ করতে বললাম। মনে মনে ভাঁজাই ছিল, শুধু লিখে ফেলবার অপেক্ষা।

বড় রকমের দুটি গ্লাশ তৈরী করে জুত হয়ে বসি। পরিমলদা বললেন, 'অরুণ বিড়ি আনাও। আমার আবার বিড়ি না হলে ঠিক জমে না।'

গোপাল বিড়ি আনতে গেল।

—খুব একটা জমাবো না পরিমলদা। প্রফেসার উইলমেয়ারের ওপর লেখাটা আমার শেষ করতে হবে। শুনলে তো, রাত দুটোতে লেখা নিতে লোক আসবে।

—কী লিখবে কী ?

—সাক্ষাৎকার সম্পর্কে একটু সাজিয়ে দু-কলমের মত।

—প্রফেসার উইলমেয়ার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা ?

—ভদ্রলোকের পাণ্ডিত্য অসীম। তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার খুবই ভাল লেগেছে। বছর দুই আগে দিল্লীতে আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। হেমেন ভাদুড়ীই পরিচয় করিয়ে দেন। বৌদ্ধধর্মের ওপর এমন চমৎকার বলেন। ভদ্রলোক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া একরকম গুলে খেয়েছেন। এখন ব্যাংকক্-এ থাকেন। কনফুসিয়াস মতবাদ সম্পর্কে এত গভীর জ্ঞান।

—তুমি দেখছি একজন ভক্ত বনে গেছ। আচ্ছা, হেমেন ভাদুড়ীর সঙ্গে প্রফেসর উইলমেয়ারের সম্পর্কটা কী ?

—বলতে পারবো না।

—স্বামীজীর সঙ্গে প্রফেসার উইলমেয়ার হঠাৎ এলেন কেন?

—ব্যাংককেই পরিচয়। কী সূত্রে এসেছেন ঠিক জানি না। তবে প্রফেসার উইলমেয়ার তাঁর গবেষণার কাজেই ভারতে এসেছেন।

—হেমেন ভাদুড়ী সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

—একজন বীরপুরুষ। মানুষটা খারাপ নয়।

পরিমলদার সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে। বিড়ি এলো। সুতপা কয়েকটি ফ্রাই পাঠিয়ে দিল। দু'পাত্রের পর আমাদের তৃতীয় গ্লাসে হাত পড়েছে। পরিমলদার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে ভাল লাগে। এতটুকু বেচাল হন না। বাজে কথা বলেন না। জিনিসটা তিনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই নেন। কোনোদিনই গ্লাস লুকোতে দেখিনি। মেয়েকে পড়াতে পড়াতে পরিমলদাকে মদ খেতে দেখেছি। নিতান্ত পছন্দসই মানুষ ছাড়া পরিমলদা কারো সঙ্গে বসে মদ খান না।

'প্রফেসার উইলমেয়ার সম্পর্কে তোমার নিজের একটা ধারণা হয়েছে, আমার ধারণা তার ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না', পরিমলদা একটা বিড়ি ধরালেন।

—আমি কিছু মনে করবো না। আপনি বলুন না ভদ্রলোক সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

—হেমেন ভাদুড়ীকে তুমিও চেন, আমিও জানি। শিবাজী নন্দার মত মানুষ প্রফেসার উইলমেয়ারের অনুগত। ব্যাপারটা বুঝি না। শিবাজী নন্দাকে পুরোপুরি একটা ক্যাশিস্ট্ জীব বলা চলে। প্রফেসার উইলমেয়ার গুণী লোক। ভাষাবিদ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অতিশয় ওয়াকিবহাল ব্যক্তি, আমি শুনেছি।

—'লামাইজম' বইটা....

—শুনেছি, দেখিনি। পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রফেসার উইলমেয়ারের এই পরিচয়ই যথেষ্ট নয়।

—বুঝলাম না।

—আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় অরুণ। অবশ্য দুম করে আমি দায়িত্বহীনের মত কথা বলতে চাই না।

—তুমি চেনো নাকি ?

—পরিচয় নেই। তবে চিনি। এই প্রফেসার উইলমেয়ার দালাই লামা ভাবতে এলে নিউইয়র্ক থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন এদেশে। ম্যাক্সওয়েল টেলর কাশ্মীর ঘুরে যাবার পরও হজরৎ বাল চুরি হবার সময় এই প্রফেসার উইলমেয়ারকে আমি গুলমার্গে-এ দেখেছি। সবটাই কেমন যেন গোলমেলে।

—এতে গোলমালের কী দেখলেন পরিমলদা ?

—আমি বলতে চাইছি প্রফেসার উইলমেয়ার এমন একজন সিদ্ধপুরুষ যে, তিনি শুধু 'supreme peace of nirvana'-র তালাশে নেই।

—পরিষ্কার করে বল।

—আরও অনেক কিছু শুনেছি। দিল্লীর অবিনাশদার কাছে তুমি এই প্রফেসার সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পাবে।

—অবিনাশদা কী বলেন ?

—প্রফেসার উইলমেয়ার জাকার্তায় একজন পলিটিক্যাল এ্যাটাশে হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন কিছুদিন। টুঙ্কু আবদুল রহমানের সঙ্গে গল্‌ফ্ খেলতেও দেখা গেছে।

—বলেন কী ?

পরিমলদা একটু স্মিত হেসে বলেন,

—বোতলটা একটু এগিয়ে দাও। ফ্রাইগুলো সুন্দর হয়েছে। কই তুমি শেষ কর।

এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে বোতলটা টেনে নিলাম। বড় একটা গ্লাস বানিয়ে পরিমলদার হাতে তুলে দিয়ে ব'ল, 'এ সব আমি কিছুই জানতাম না।'

—অবিনাশ চক্রবর্তী বাজে কথা বলবেন না।

—কখনই নয়।

—প্রফেসার উইলমেয়ারের সবচেয়ে বড় ঘটনা দিল্লীতেই ঘটেছিল। সবটাই অবিনাশদার নিজের চোখে দেখা। কিছুদিন আগে গয়াতে Fellowship of Buddhists-এর অধিবেশন হয়েছিল তোমার মনে পড়ে?

—জানি আমার 'লাস্ট স্ট্র-হোল্ড' লেখবার সময় Buddha on the Barricades'-এ তার উল্লেখ করেছি। চীন অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল। রাশিয়ান লামা ডাম্বাল দরজে এসেছিলেন। ইন্দোনেশীয়ান ডেলিগেট উইলসি প্রাচনা সুব্রত সুকর্নের গাইডেড-ডেমোক্রেসীর প্রশংসা ও মালয়েশীয়ার মুণ্ডপাত করলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে চীনের চর ছিল। পুরোপুরি পলিটিক্সের ব্যাপার। 'Buddha on the Barricades'-এ এসব আমি বলেছি।

—তুমি তাহ'লে অনেক কিছুই জান।

—ঐ লেখাটার জন্যে আমার জানতে হয়েছিল।

—প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশ থেকেই এসেছিলেন। সায়গন থেকে এসেছিল একটা ছোট্ট দল। অবিনাশদা বললেন, সেই দলে বছর পঁচিশেক বয়সের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে তার পালাম এয়ার-পোর্টে আলাপ হয়। নামও বলেছিলেন, আজ মনে নেই। দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই বৌদ্ধ ভিক্ষু দল সঙ্গে কিছু দলিল চিত্র আনে। ষোল মিলি-র ডকুমেণ্টারী ছবি তারা অধিবেশনে দেখাবে বলে সঙ্গে এনেছিল।

—আমি জানি পরিমলদা, বৌদ্ধগয়ায় প্রতিনিধিদের সামনে ভিয়েতনামী প্রতিনিধিদল 'Message from Saigon' নামে একটা ছবি দেখায়।

—হতে পারে, কিন্তু ঐ তরুণ যে দলিল চিত্র সঙ্গে এনেছিল তার শেষ পর্যন্ত প্রদর্শনী হয়নি। অবিনাশদা আর কয়েকজন রিপোর্টার-এর

সঙ্গে সেই দলিল চিত্র দেখেছিলেন। সায়গনে আমেরিকান সেনারা গোটা দেশবাসীর ওপর কী বীভৎস অত্যাচার চালাচ্ছে তার বিপুল প্রামাণ্য চিত্র এই যুবার সঙ্গে ছিল। ওয়াটার টর্চার থেকে সুরু করে ভিয়েতকং হিসেবে সন্দেহ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হেলিকপ্টার থেকে মাটিতে ছুঁড়ে দেওয়া, প্যাগাডার ওপর নপাম বর্ষণ, মঠে মঠে ঢুকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীনীদের ওপরও প্যারাফিন টেস্ট, তার দিয়ে গাঁথা রক্তাক্ত মানুষের মালা—দক্ষিণ ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন অত্যাচারের সামগ্রিক চিত্র থাকলেও ছবিতে বৌদ্ধ নির্যাতনই প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। অবিনাশদা থাকলে খুব ভাল বলতে পারতেন।

দারুণ ডকুমেন্টারী মনে হচ্ছে। তারপর কী হলো ?

'ডিপ্লোম্যাট' পরিমলদার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে বুঝতে পারি। উচ্ছ্বাস একটু বেশী মনে হয়। মুখের কাছে তুলছেন, আবার গ্লাসটি নামিয়ে রাখছেন। সুতপা আগ্রহ দেখায়, 'তারপর ?'

—আমার ঠিক ঠিক সব মনে নেই। তবে বৌদ্ধ গার্ডেনস্-এ কী একটা অনুষ্ঠান যেন ছিল। বৃক্ষরোপণ গোছের কিছু একটা হবে। অবিনাশদা সেখানে ছিলেন। ঐ দিনই সেই ছবির প্রদর্শনী, ছোটখাটো একটা ঘরোয়া বৈঠক হবার কথা। তারপর সেটা গয়াতে যাবার কথা ছিল। অবিনাশদা ঐ ফিল্ম-এর ব্যাপারে বেশী খবর রাখতেন, কারণ ষোল মিলি-র প্রজেক্টার তিনিই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। তখন বিকেল বেলা। 'তিন মূর্তি মার্গ'-এ বাঁক নিয়ে তেরছা এগিয়ে সামনে চাণক্যপুরী। সাউথ এভিনিউ থেকে কী কাজ সেরে অবিনাশদা ফিরছিলেন। হঠাৎ 'শান্তিপথ'-এ বাঁক নিতেই পাশ থেকে প্রায় সত্তর মাইল বেগে একটা এয়ারকণ্ডিশাণ্ড ঝলমলে গাড়ি অবিনাশদার হেরাল্ডকে ওভারটেক করলো। তারপরই সংঘর্ষ। বিকট একটা আওয়াজ। প্রচণ্ড ব্রেক্। ঘটনাস্থলে পৌঁছতে অবিনাশদার এক মিনিটও লাগেনি। সে এক রক্তাক্ত দৃশ্য। অবিনাশদা একরকম ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। সেই যুবা। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু। ষোল মিলির

দলিল চিত্র নিয়ে সে প্রদর্শনীতে পৌঁছানোর জন্যে পথে নেমে ট্যাক্সি-খুঁজছিলো। অবিনাশদা তাঁর সম্বিত হারাতে বসেছিলেন। নিস্তব্ধ, জনশূন্য বিপুল রাস্তা। একটার পর একটা ঝলমলে গাড়ি আলো পাল্টে, সুরেলা হর্ন বাজিয়ে মিশ্রণ কংক্রিট পথে 'চিড়-চিড়' শব্দ তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। পর্দা লাগানো DLZ বিপুল বেগে সামনের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। কেউ থামছে না। এয়ার কণ্ডিশাণ্ড গাড়িটা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। বৌদ্ধ যুবা ছিন্নভিন্ন হয়েছে, কিন্তু কঠিন পাষাণের সঙ্গে সংঘাত থেকে ড্রাইভার গাড়িটাকে বাঁচিয়েছে। গাড়ির রেডিওটা খোলা ছিল। প্রচণ্ড একটা যন্ত্রসঙ্গীতের চূড়ান্ত আরোহণ তখন শুধু অব্যক্ত ব্যথায় আছড়াচ্ছে। ড্রাইভারের সঙ্গে আরোহীকে নেমে আসতে দেখে অবিনাশদা চমকে উঠেছেন। হলদে আলখাল্লা পরা যেন ইয়ুল ব্রাইনর। স্বয়ং অধ্যাপক উইলমেয়ার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠেছেন পরক্ষণেই। বৌদ্ধ যুবার রক্তাক্ত দেহটা নিজেই দুই বলিষ্ঠ পাঞ্জায় তুলে নিয়েছেন। হলদে কাপড়ে মোড়া হতভাগ্য ভিক্ষুর হাতের পেটিকাটি ছিটকে পড়েছিল কিছুটা তফাতে। ড্রাইভার সেটি নিয়ে এলো। তারপর নার্সিং হোম। সব শেষ। সার্টিফিকেট অল্পক্ষণেই পাওয়া গেল। হতভাগ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুর রক্তাক্ত দেহটাও পেতে দেরি হয়নি। শুধু একমাত্র কিনারা হয়নি সেই হলদে পেটিকার। যোল মিলির তিনটি বড় বড় রীল যাতে জড়ানো ছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন অত্যাচারের প্রামাণ্য দলিল চিত্রের কোনো হদিশই আর করা সম্ভব হয়নি।

কথা শেষ করে পরিমলদা একটু ঝিম ধরে রইলেন। অর্থপূর্ণ একটু হেসে শূন্য পাত্রাধারটি শব্দ করে টেবিলে রাখেন। ঘড়ি দেখে অল্পক্ষণ পর উঠে পড়লেন। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় একবার শুধু ঘুরে তাকান। মৃদু হেসে বললেন,

—আমার ধারণা তোমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। তবে শুধু

Supreme peace of nirvana-র তালাশে যে প্রফেসার উইলমেয়ার নেই এটুকু বলা যেতে পারে।

ঘরে এলাম। মাথাটা দপ দপ করছে।

শুয়ে পড়েছিল, শব্দ শুনে সুতপা উঠে বসলো,

—খাবে তো?

—স্নান করলে ভাল হতো।

—তুমি কী এখন লিখতে বসবে?

—শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। কথা দিয়েছি। রাত দুটোতে গাড়ি আসবে। প্রফেসার উইলমেয়ারের ওপর জোরালো লেখাটা শেষ করতেই হবে।

সুতপা প্রশ্ন করলো,

—তোমার কী মনে হয়। প্রফেসার উইলমেয়ারটি কে?

—তুমি আবার এসব গল্প বাইরে ক'রো না। হয়তো চারদিকে রটে যাবে প্রফেসার উইলমেয়ার সি. আই. এ-র লোক। এমনিতেই তো আমার মিত্রের অভাব নেই।

তুচ্ছ কারণে সুতপার সঙ্গে লেগে গেল। আমি কেন যেন নিজেকে সংযত করতে পারি না,

—অমিতকে দুপুরে খেতে বলেছো ভাল কথা। আবার আমাকে জড়ানো কেন? শরৎবাবুর উপন্যাসের আদর্শ নারী চরিত্র হয়ে পাতের কাছে বেড়াল বসিয়ে অমিতকে হাওয়া কোরো। আমি কিন্তু দাদা-ঠাকুর নই। তোমার এই বৌঠান-বৌঠান ভাব আমার অসহ্য লাগে। বলছি কাজ আছে। কোথায় থাকি, ঠিক নেই। তুমি বলছো, দুপুরে আমাকে অমিতের সঙ্গে বসে মাছের ঝোল খেতে হবে।

সুতপা একরকম ফুঁসে ওঠে,

—ইচ্ছে না হয় এসো না!

—অমিত একটা পার্সোনালিটি হয়ে উঠেছে, এ কথা তো জানি না।

—অযথা তুমি কথা বাড়াচ্ছো। তুমি যেন অন্য কিছু বলতে চাইছো।

—যা বলতে চাই, সে বোঝবার ক্ষমতা তোমার হবে না।

—বল না কী বলতে চাইছো?

—অমিতকে তুমি হাজার বার নেমন্তন্ন কর আমার আপত্তি নেই। তবে—

—নেমন্তন্ন কী বলছো, অমিত তোমার ভাইপো।

—সেইটাই তো আমার অপরাধ। তুমি যে বাড়িতে 'বিন্দুর ছেলে' আরম্ভ করবে সত্যিই আমি ভাবিনি।

—কথাটা কোন অর্থে হলো?

—তোমার সঙ্গে খোলা মনে আজকাল কথা বলাও মুশকিল।

আমার কথার অর্থ যাই হোক, তার পেছনে গায়নাকোলজিষ্ট ডাক্তার মজুমদারের কথাবার্তার কোনো সম্পর্ক নেই।

সুতপা যেন চমকে উঠলো আমার কথায়। কয়েক মুহূর্ত পর অল্প একটু শুকনো হেসে বললো,

—তুমিই ভাল জান। আমার তো মনে হয় খোলা মনে কথা বললে তুমিই নিতে পার না। থাক, কথা না বাড়ানোই ভাল। আমার মত তুমি এম. এ. পাস করনি বলে, আমি কোথায় যেন একটা কমপ্লেক্স-এ ভুগছি—এসব কথাও হয়তো উঠে পড়বে। আগে জানলে অমিতকে আমি ডাকতাম না।

সুতপার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে কেমন নিভে গেল। চলে যাচ্ছিলো। ডাকলাম,

—শোনো!

—বলো।

—কিছু মনে করবে না?

—বলোই না।

—হয়তো বিশ্বাস করবে না, সেদিন অমিত আমাকে একরকম অপমান করেছে।

—কী বলবো!

—আমার বক্তৃতার বিরুদ্ধে সে ও ভাবে বক্তব্য না রাখলেই পারতো। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না।

—এসব আমি বুঝি না।

—খুব বোঝো। অমিতকে যদি সত্যিই তুমি ভালবাস, স্নেহ করো, তবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রো। কোন্ সময় ধরে-টরে নিয়ে যাবে—জীবনটা নষ্ট হবে। অমিতকে আমিও স্নেহ ক'রি। তাছাড়া এদেশে বিপ্লব হবে না। অযথা নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে। এসব আমি এককালে অনেক বেশী করেছি।

—এ সম্পর্কে তুমিই কথা বললে ভাল হয়।

—বলতাম। কিন্তু সেদিন অমিতকে আমি আবিষ্কার করেছি। নিজস্ব একটা মতামত এমন শক্ত হয়ে গেছে যে আমার কথায় খুব কাজ হবে না। ভেতরে ভেতরে সে যে এভাবে নষ্ট হয়ে গেছে জানতাম না। কাদের সঙ্গে মেশে তুমি দেখলে অবাক হয়ে যেতে। তুমি কী কিছুই জানতে না। আমার জানা ছিল সিনে ক্লাব নিয়ে হৈ চৈ করে। ফেলেনি, ঋত্বিক ঘটক আর বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌ নিয়েই মত্ত। রাজনীতির এত কিছু অমিত জানলো কোথা থেকে।

সুতপার মনটা একটু নরম হয়েছে মনে হলো। এক টুকরো হাসতে চেষ্টা করে বলে,

—পাঁচজনের সঙ্গে মিশছে। বয়স তো হচ্ছে।

—গোল্লায় যাবার বয়েস। তুমি কী কিছুই জানতে না। আমার ওপর অযথা রাগ ক'রো না। তোমরা সবাই আমাকে কী ভাব আমি বুঝি না। তবে আমি জগতগুরুর রোল নিয়ে পৃথিবীতে আসিনি। সবাইকেই যে লেনিন-স্তালিন হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

সুতপা চলে গেল। বেশ বুঝতে পারি সুতপা সবই জানে। আজকের এই নিমন্ত্রণের পেছনে প্রচ্ছন্ন কোনো মতলব না থাকলেও অভিপ্রায় ছিল। আমার সঙ্গে অমিতের স্বাভাবিক আবহাওয়া সুতপা ফিরিয়ে আনতে চায়। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন। ভাল করে কিছু মনে নেই। অমিতকে সামনে পাইনি। সমস্ত জ্বালা আমি সুতপার ওপর ছেড়ে দিয়েছি। পরদিন সকাল বেলা ঘুমন্ত সুতপাকে বারান্দায় আবিষ্কার করেছি। খাবার টেবিলে ভাঙ্গা কাঁচের বাসনের স্তূপ। অনেক কিছুই করেছিলাম। ধুতি পাঞ্জাবীই পরনে ছিল। বিছানায় ছিল শুকনো বমি। শোবার বিছানা পূর্বেও আমি নষ্ট করেছি। সুতপা পাল্টে দিয়েছে। পরদিন কথা প্রসঙ্গে গতরাত্রে নেশার ঝোঁকে সুতপাকে সোনায় মুড়ে দেবার প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ তুলে চায়ের টেবিলে হাসাহাসি

করেছে। বারান্দায় একা শুতে যাবার মত ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। নোঙরা বিছানায় সুতপার ঘৃণা হয়েছিল, না আমার প্রতি নিদারুণ একটা ঘৃণা মনে দলা পাকিয়ে উঠেছিল! সেই থেকেই চলছে। আমি সহজ করবার চেষ্টা করেছি—পারিনি। আপত্তি তুলেছিল প্রথমে, তবে শেষ পর্যন্ত সেদিন সঙ্গে গেল। আমার নিজের তরফ থেকে সুবিমল রায়ের বাড়িতে স্বামীজী দেখাতে নিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকলেও খুব একটা আগ্রহ ছিল না। বিশ্রী একটা আবহাওয়া আমি শুধু ভেঙে দিতে চেয়েছিলাম।

সবাই জানে আমরা প্রেম করে বিয়ে করেছি। কথাটা অর্ধ সত্য সামান্য পরিচয়। নিতান্তই কয়েকদিনের দেখা। আমার ভাল লাগলো।' বিয়ের আগে পরস্পরের জানবার সুযোগ খুব একটা হয় নি। হয়তো কোথাও আরোপ-করা ভালো-লাগালাগির ব্যাপার ছিল। সুতপা তখন অস্থির। উমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে সেদিন মনে হয়েছে অনেক জিতেছি। উমা সুন্দর ফুল, গন্ধ নেই। সুতপা কিন্তু তার নিজের সৌরভ সম্পর্কে সচেতন। কী যে চায়, বুঝতে পারি না। সুতপার যৌবন মাতৃত্বে পূর্ণতা পেতে চায় বুঝি। কিন্তু সে অক্ষমতা আমার নয়। ডাক্তার মজুমদার যেন আমাদের দু'জনকেই খুশী করতে চান। ডাক্তার মজুমদারের কথাবার্তা অনেকটা সেপারেশনের পর অনিবার্য ডিভোর্স এড়ানোর কনসিলিয়শনের টেবিলে বিচক্ষণ ম্যাজিস্ট্রেটের শেষ চেষ্টার আন্তরিকতার মত মনে হয়েছে। মনের ব্যাপারই নয়। আমাদের শরীর সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে চাই। তবে এ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতেও ভয় লাগে। আমার তরফ থেকে এটুকু বলতে পারি, নিষ্ফল একটা পিতৃত্বের অনিবার্য জ্বালায় আমি জ্বলছি না। 'আমি কে, কে তোমার' গোছের মিথ্যে খোল বাজানো মাকুন্দ আত্মসান্ত্বনাও আমাকে স্পর্শ করে না। সবটা মিলিয়ে এমন একটা হচপচে ব্যাপার, কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না। মদ আমি নিয়মিত খাই না। কাজ থাকলে

কখনও নয়। সুতপার তাতে ভাল লাগলেও একটা বক্তব্য আছে। পর স্ত্রীলোক সম্পর্কে আমার পরিপূর্ণ নিশ্চেতনাও সুতপার চোখে হয়তো পরিপূর্ণ নিষ্কলুষ নয়। সুতপার নিষ্করুণ অভিব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল একদিন। সুতপা বলেছিলো, তুমি আসলে খুব এ্যাম্বিসস্—চালাক লোক। সুতপার কথাগুলো প্রাকৃত ভাষায় আমার কানে বেজেছিল সেদিন। যেন আমার ইচ্ছে-টিচ্ছে আছে, সিফিলিসের ভয়েই শুধু বারাঙ্গনা বিমুখ। নিতান্ত অকারণেই আজকাল হঠাৎ লেগে যায়। বাইরের ঘর থেকে সুকান্তের ছবি গোপালকে সরিয়ে নিতে বলায় সুকান্তের কবি প্রতিভা সম্পর্কে আমার নিদারুণ অবজ্ঞাই যে প্রকটিত হয়—সুতপা আশ্চর্যরকম আবিষ্কার করে। আমার ঘরে তো রবীন্দ্রনাথও নেই। সুতপার অদ্ভুত যুক্তি, 'এতকাল ছিল।' পাঁচ টাকা ভাঙিয়ে দশ টাকার বুঝ হাতে পেয়ে এক হাট লোককে জানান দিয়ে বাড়তি পাওনা প্রত্যর্পণের আত্মপ্রসাদের মত, এক পয়সাও যৌতুক না নিয়ে আমার বিয়ে করবার কথা আমি নাকি পাঁচজনকে শুনিয়ে হাস্যকর আত্মপ্রচারের আনন্দ পাই। সবই মনের ব্যাপার। দুর্বোধ্য মানসিকতা। চলতে ফিরতে লাগে, নড়তে-চড়তে বাজে।

ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াতে হয়। সুবিমল রায়ের ঘরে হাজারো রকমের মানুষ দেখেছি। পলিটিক্যাল ভাঁড় থেকে 'ব্লু-ফক্স'-এর ছেনাল। ভি. আই. পি. থেকে ভি. ডি.। কিন্তু আজকের আবহাওয়া একটু অন্য রকম।

মুখোমুখি বসে সুলেখা বক্সী। পাশে এক বিদেশী ভদ্রলোক। টুথব্রাশের মত গোঁফ। চাওড়া জোড়া ভ্রূ-যুগলে অনবরত বিস্ময় রেখা।

'বোসো', চেয়ার দেখিয়ে সুবিমল রায় বসতে বলেন। আসন

গ্রহণ করতেই পরিচয় করিয়ে দেন। ভদ্রলোক সুলেখা বক্সীর পরিচিত। এক কালের নাইরোবীর বন্ধু। নাম জলিল জেব্রান। একজন আফ্রিকা বিশারদ। উচ্ছ্বাস একটু বেশী। করমর্দন করতে হাতে ব্যথা পেলাম। সুলেখা বক্সী অর্থপূর্ণ হাসতে চেষ্টা করেন। চতুর চতুর চোখে তাকান। ভাবটা যেন সবই জানেন। কী ভাবছি, সে কথাও যেন জেনে ফেলেছেন।

বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে সুবিমল রায়ের কথা চলছিলো। সত্যিই গুরুদেব লোক। বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন। কালো আফ্রিকা সম্পর্কে সুবিমল রায় খুব বিচলিত মনে হলো। পরনে কিছুক্ষণ আগের ভাঙা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি। কাঁচা পাকা মাথার চুল কাত করে আঁচড়ানো। ছোট কাঁচি দিয়ে নখ কাটছিলেন।

—কেয়মে নক্রুমাকে আমার আদৌ পছন্দ নয়। তবু আমি ঘানার এই সামরিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করি না। এ সম্পর্কে আমি অনেক লেখালেখি করেছি। ভারতের সংবাদপত্র আফ্রিকার ফ্যাসিবাদের এই পদধ্বনিকে সমর্থন করবে না।

বেশ বুঝলাম ডাহা তাল মারছেন সুবিমল রায়। লেখালেখি একমাত্র 'সমন্বয়'-ই করেন। সে সমস্তই আমার নখদপর্ণে। এডিটোরিয়াল একটা লিখেছিলেন অবশ্য, তবে খসড়াটা আমার। ম্যানেজ করতে ওস্তাদ। আজকাল ইংরেজী নির্ভুলই বলেন। বেলজিয়ান কঙ্গো সম্পর্কে এমন বলে যাবেন যে কেউ বিশ্বাসই করবেন না গভীর রাত্রে এই মানুষটিই টেলিফোনে চীৎকার করেছেন এই সেদিন, 'অরুণ, কাতাঙ্গাটা কোথায়? ওটা কী ফরাসীদের কলোনী ছিল? আফ্রিকার ট্রাবল্ড স্পটগুলো নিয়ে ছোট ছোট লেখা 'সমন্বয়'-এ থাকুক আমি চাই। শোম্বে একটা খেল্ দেখাচ্ছে বটে।'

মিঃ জেব্রান মৃদু হেসে বলেন,

—আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্যু ডে-টা পছন্দ করি না। ডেমোক্রেসীর যাঁরা মূল্য দেন তাঁরা এই সামরিক চক্র সমর্থন করবেন না। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন মিঃ রায়, ঘানার সাধারণ মানুষ কিন্তু খুশী হয়েছে। ল্যাতিন আমেরিকার ক্যু ডে-টা আর কালো আফ্রিকার সামরিক অভ্যুত্থান ঠিক এক জিনিস নয়। গত জানুয়ারীতে নাইজেরীয়াতে যখন সামরিক চক্র ক্ষমতা দখল করলো, লোকে তাতে খুশী হয়েছিল। আক্রার পথে পথে নাচ গান দেখলে ঘানার রাজনৈতিক উত্তাপ আপনি চিনতে পারতেন। এটা হলো কেন? আসলে নেতারাই এই পরিস্থিতির জন্যে দায়ী। কুশাসন, চুরি আর স্বজনপোষণে প্রতিটি নেতাই অদ্বিতীয়। ক্ষমতা হাতে রাখতে দুর্নীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। কঙ্গোতে কাসাভুবু ও শোম্বের ক্ষমতার লড়াই এমন জঘন্য স্তরে গেল, যে দেশের শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল—মবুতু-কে তাই দরকার। দাহোমে-তে তিন উপজাতীর বিভেদে, তিন বছরে দুবার সরকারের পতন হলো। তাই কর্নেল সোগ্লো-কে সমর্থন করতেই হবে। সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক—শাসনযন্ত্র সেখানে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। চীন অনেকটা ঢুকেও পড়েছিল। তাই ডিভিড ডাক্কোকে সরিয়ে কর্নেল বোক্কাসা যখন ক্ষমতা দখল করলেন দেশের মানুষ তাঁকে সমর্থন করেছেন। আপার ভল্টায় প্রেসিডেণ্ট মরিশ ইয়ামেগো তার ক্যাবিনেটে আত্মীয়স্বজন বসিয়েছিলেন। সবাই তাঁর নিজের লোক। রাজার মত চলতেন। ইয়োরোপের ঘোড়দৌড়ের মাঠ আর রম্য হোটেলে বিস্তর ফরেন-এক্সচেঞ্জ ব্যয় করতেন। টাকার মূল্য হ্রাস পেলে তিনি দেশের সরকারী কর্মচারীদের মাইনে কমালেন। তাই কর্নেল লামিজান যখন অতর্কিতে ক্ষমতা দখল করলেন, তখন দেশবাসী তাঁকে মেনে নিয়েছে। দেশবাসীই সব। জনসাধারণই দেশের মালিক। কালো আফ্রিকার সাধারণ মানুষ এই ক্যু ডে-টা সমর্থন করছে। এ এক ধরনের কালো আফ্রিকার ডেমোক্রেসী।

সামরিক চক্র লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করার বড় কারণ, শাসক-শ্রেণীর সামনে দাঁড়ানোর মত বিপক্ষ দল কোথাও নেই। শ্রমিক শ্রেণী দুর্বল। একমাত্র আর্মির একটা ঐতিহ্য ছিল গোড়া থেকেই। তারা সংবদ্ধ। শিক্ষিত। সমরনায়কেরা ইয়োরোপে কেউ কেউ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। তারা সুশৃঙ্খল। সামরিক পোশাকের মর্যাদা দিতে জানে। তারা হয়তো সক্ষম, কিন্তু ধনী নয়। তারা খাকী রঙের জিপ চড়ে, মার্সিডিস্ দেখেনি।

সুবিমল রায় এবার মন্তব্য করেন,

—কালো আফ্রিকার মৈত্রী ও সংহতি-সঙ্ঘ স্থাপনের যে চেষ্টা জিমো কানিয়াট্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে সামরিক চক্র নিশ্চয়ই বেকায়দায় পড়বে। এ সম্পর্কে দিল্লীতে একজন কূটনৈতিক প্রতিনিধি আমাকে সেদিন খুব জোর গলায় বললেন।

মিঃ জেব্রান তাঁর নিজের যুক্তি রাখেন,

—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কালো আফ্রিকার ওপর দিয়ে যে স্বাধীনতা আন্দোলন বয়ে গেছে তাকে বিপ্লবের প্রথম পর্ব বলা যায়। এখন গোটা মহাদেশ জুড়ে চলেছে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব—এই সামরিক অভ্যুত্থান। খারাপই হোক আর ভালই হোক এ আবহাওয়া এখন চলছে। সামরিক ক্যু চার মাসে দুটি দেশে নতুন শাসন এনেছে। আমার বিশ্বাস আরও এ রকম ঘটনা ঘটবে। আফ্রিকার মৈত্রী ও সংহতি-সঙ্ঘ স্থাপনের যত চেষ্টাই জিমো কানিয়াট্টা করুন, তাতে বিশেষ সুবিধে হবে না। আশ্চর্য একটা দ্বন্দ্ব নিজেদের মধ্যে প্রকট। ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী সোমালিয়ার প্রধানমন্ত্রী উস্‌সেন-এর সঙ্গে একমত হতে পারেন না। কারণ সীমান্ত-সঙ্কট, রাহাজানি চলেছেই। বুরাণ্ডির প্রধানমন্ত্রী লিওপোল্ড বিয়ার সঙ্গে রুয়াণ্ডা প্রতিনিধি এক টেবিলে বসতে চান না। সীমান্তে উপজাতীয় হামলা লেগেই আছে। সুদানের মহম্মদ মহাগোব-এর সঙ্গে উগাণ্ডার মিল্টন ওবোটের সম্পর্ক তিক্ত। কারণ সুদানী রিবেল-দের তিনি জায়গা

দেন। কঙ্গোর লৌহ-মানব যোশেভ মবুতু-র সঙ্গে তানজিয়ানার জুলিয়াস নেয়েরি-র সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটেছে। কারণ নেয়েরি শিম্বা বিদ্রোহীদের ফানেল আর্মস দিচ্ছে। কালো আফ্রিকায় মাত্র দু'জনের সম্পর্ক ভালো। জিমো কানিয়াট্টার সঙ্গে জাম্বিয়ার কেনেথ কোয়াণ্ডার বন্ধুত্ব আছে ভালই।

ফোন এলো। সুলেখা বক্সী ফোন ধরলেন। হিন্দীতে কথা বললেন। কথায় বুঝলাম মিঃ জেব্রানকে সঙ্গে নিয়ে এখন যাবেন। এই ফোনের অপেক্ষাতেই ছিলেন।

'ইউ নো রয়েড স্ট্রীট ?' ফোন নামিয়ে সুলেখা বক্সী প্রশ্নটি আমাকে করলেন। বলে দিলাম। সুবিমল রায় একটুকরো হেসে ছোট কাঁচিটা ড্রয়ারে রেখে বেল বাজালেন। তারপর সুলেখা বক্সীকে বলেন,

—ব্যস্ত হয়ো না, গাড়ি ও ড্রাইভার তোমাকে দিচ্ছি। সে সব রাস্তা চেনে। কাজকর্ম শেষ করে আমাকে ফোন করবে। তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তায় থাকবো। আমার বাড়িতে এত অতিথি যে তোমাকে হোটেলে উঠতে হলো—খুবই লজ্জা লাগছে।

—তুমি কী হোটেলে আসবে ?

—এখনই কিছু বলতে পাচ্ছি না সুলেখা। তুমি এমন সময়ই এলে !

—বল তো কালকে থেকে যাই।

—এখনই ঠিক বলতে পাচ্ছি না। পরে হোটেলে তোমাকে জানাবো।

—রাত্রের ডিনারে থাকবে তো ?

—পরে বলবো।

—মীনাক্ষী ধরের পারমিশন নিতে হবে।

চোখটা আমি চট করে সরিয়ে নিলাম। আকাশে দুর্যোগের চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু মেঘের অভিসন্ধি নিরীক্ষণে অতিশয় মনযোগী হয়ে পড়ি।

—অযথা রাগ করো না। স্বামীজী কাল যাচ্ছেন। তাছাড়াও একজন সম্মানী বিদেশী অতিথি ঘরে। আমার তো কাজকর্ম একরকম বন্ধ। আজ সকালে তাই পত্রিকা অফিসে পালিয়ে এসে হাতের কাজ সারছি। এমন সময়ই তুমি এলে! তবে কাজ বন্ধ থাকবে না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। গেলেও তো কালকের ফার্স্ট ফ্লাইট্-এ যাচ্ছো না।

—ঠিক আছে পরে কথা হবে। হোটেলে তোমার অপেক্ষা করবো।

—এসো।

সুলেখা বক্সী মিঃ জেব্রানকে সঙ্গে নিয়ে উঠে দাঁড়ান। প্রচুর শুভেচ্ছা জানিয়ে মিঃ জেব্রান সুলেখা বক্সী সম্পর্কে এতটুকু চিন্তা না করবার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

সুলেখা বক্সী একবার শুধু ফিরে বললেন,

—দিল্লীতে এলে আসবেন কিন্তু ফরিদাবাদে।

মিঃ জলিল জেব্রানের সঙ্গে করমর্দন করবার হাত থেকে রেহাই পেতে, দরজার কাটা পর্দাটা আমি ডান হাতে এক পাশে টেনে ধরলাম। সুলেখা বক্সীর মজবুত চেহারা। তবে বুক, কোমর ও পাছায় হোসিয়ারীর হুঁশিয়ারী বোঝা যায়। জোড়া ভ্রূর অনবরত বিস্ময় রেখায় হাসির ঝিলিক লাগিয়ে মিঃ জেব্রান বিদায় নিলেন।

জানতে চাইনি, সুবিমলবাবু নিজেই কথা তুললেন। মেজাজটা আজ ভাল।

—সুলেখার ব্যাপারটা তো জান, স্বামীটা বিস্তর টাকা চোট দিয়েছে। জলিল জেব্রানকে দিয়ে একটা চেষ্টা চলেছে। এতবড় স্কাউনড্রেল, সুলেখার খোরপোষ পর্যন্ত দিচ্ছে না। দরকার হলে আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হয়। বেচারাকে এভাবে ঠকাবে!

—আপনি পাঁচজনের সংসার নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। এত জনের জন্যে এত করেন।

হাত উল্টে আত্মপ্রসাদের হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে বললেন,

—কর্তব্যবোধ অবাধ্য। অনেক সময় ভাবি এ সবের মধ্যে আর যাবো না। কিন্তু দেখছো তো! লেগেই আছে। তবে সুলেখার কথা আলাদা। এত বেশী নির্ভর করে। এত অসহায়। জলিল জেব্রান সুলেখার পূর্ব পরিচিত। কেনিয়া থেকে পরিচয়। মিঃ বক্সীকে যথেষ্ঠ চেনেন। প্রথমে জলিল জেব্রানকে দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। তবে সুলেখার কথাবার্তা থেকে বুঝলাম লোকটাকে নির্ভর করা চলে। আর কিছু না পারি মিঃ বক্সীর ভারতের ব্যবসা আমি নিকেশ করে দেবো। মিঃ বক্সী লম্পট। সুলেখার জন্যে সত্যিই কষ্ট হয়। তাই বলে তুমি ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু বলবে না। সুলেখা যে কলকাতায়, আমার এখানে এসেছিল কাউকে বোলো না।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারি। সুবিমল রায় আমাকে সতর্ক করে দিলেন, ঘুণাক্ষরেও যেন মীনাক্ষী ধরকে সুলেখা বক্সীর কলকাতা অভিসার আমি প্রকাশ না করি।

মৃগেন দত্ত এসে ঘরে ঢোকেন। সুবিমল রায় প্রসন্ন হেসে বলেন,

—তোমাকে একটা কাজ দেব। তোমার তো যশোরে বাড়ি।

—সে কথা মনে করিয়ে আর দুঃখ দেন কেন!

—তোমার যশোরে বাড়ি, তুমিই হচ্ছো আসল লোক। কই-মাগুর নিশ্চয়ই তুমি আমাদের চেয়ে ভাল চিনবে। শোন মৃগেন, বেশ বড় সাইজের কিলো পাঁচেক মাগুর আমাকে কিনে দেবে। দিল্লী পাঠাবো। হাজার হলেও বাঙ্গালী তো, তাছাড়া বীরেশ্বরদা মাগুর মাছ খুব ভালবাসেন। তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই। ফার্স্ট ফ্লাইট-এ যাবে না। সকাল আটটার মধ্যে তুমি আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও।

চোখে চোখ পড়তেই হেসে ওঠেন,

—একেও তুমি কর্তব্যবোধ বলতে পার। কর্তব্যবোধ সত্যিই অবাধ্য।

'সমন্বয়'-এর অফিসের চেয়ারে বসে সুবিমল রায়কে ইদানীংকালে এত সহজভাবে হাসি-খুশীতে দেখিনি। মনে হয় যেন বেশ কিছুদিন পর স্বামীজী সন্দর্শন ও সুলেখা বক্সীর নৈকট্য সুখে আজ বেশ মেজাজে আছেন।

মৃগেন দত্ত তার দায়িত্বটুকু আবার বুঝে নিতে চান,

—পাঁচ কিলো ?

—কম-বেশী হলে ক্ষতি নেই। তবে বেশ বড় সাইজ।

আমি কপট বিস্ময় প্রকাশ করি,

—অত মাগুর দিয়ে কী হবে ?

—বীরেশ্বরদাকে চেন না। মাগুর মাছ যে কী ভালবাসেন!

চেয়ার ছেড়ে সুবিমল রায় উঠে দাঁড়ালেন। ঘরসংলগ্ন বাথরুমে যেতে যেতে বলেন,

—তোমরা আধুনিক যুগের লোক। মাগুর মাছ যে কী জিনিস!

'আমি ভাবলাম কী-না-কী! মাগুর মাছের জন্যে এত কাণ্ড! তিনবার ফোন,' মৃগেন দত্তের চোখেমুখে সোয়াস্তির আনন্দ।

—বীরেশ্বর পাল একজন ভি. আই পি. জানেন! তাছাড়া মাগুর মাছটা ফ্যালনা হলো ? কথায় বলে, মাগুর মাছের ঝোল, আর যুবতী মেয়ের কোল! আপনি দেখছি কিস্যু শেখেননি। শুধু 'সমন্বয়'-ই বুঝেছেন।

মৃগেন দত্ত হঠাৎ কিছুটা এগিয়ে বলেন,

—তোমার কী ব্যাপার বল তো!

—কিসের ব্যাপারে।

—আমার কাছে লুকোবে না। কাউকে আমি বলবো না!

আপনার কথা আমি কাউকে বলবো না।

—এসব কী শুনছি?

—কী শুনছেন?

—'সমন্বয়' ছেড়ে দিচ্ছো?

—আপনার মাথা খারাপ! কে বলেছে আপনাকে?

—বড়বাবুই বলেছেন।

বিস্ময়ের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাই। সুবিমল রায় আমার সম্পর্কে এতবড় দায়িত্বহীন কথা বলবেন ভাবতেই পারি না। কৌতূহল এবার আমার বেশী,

—ভেঙে বলুন তো। কী বলেছেন বড়বাবু?

—কালই বলছিলেন, কী কথায় এডিটোরিয়াল বোর্ডের কথা চলছিলো। বড়বাবু কথাপ্রসঙ্গে আপনার তারিফ করছিলেন। শেষের দিকে হঠাৎ এক সময় মন্তব্য করলেন, 'সমন্বয়' যে অরুণকে ধরে রাখতে পারবে চিরকাল সে ভরসা কোথায়? অন্য কোথাও সে চলে যেতে পারে।' চিন্তিতই দেখলাম।

আমি হেসে ফেললাম। মৃগেন দত্তের কৌতূহল তাতে বৃদ্ধি পেল।

—বল না। আমাকে বলতে তোমার বাধা আছে?

—চাকরিই যদি করতে হয় তবে আর পাঁচজনের মত ভাল চাকরির চেষ্টা নিশ্চয়ই আমি করি। তবে বছর খানেক আগে 'সমন্বয়' ছাড়বার যে সম্ভাবনা ছিল, আজও ব্যাপারটা সেখানেই আছে। নতুন কোনো পরিস্থিতির কথা আমার জানা নেই। বাজে কথা বলবার আমি লোক নই আপনি জানেন। আপনাকে অন্ততঃ আমি ভাল মারবো না।

বাথরুমের ফ্ল্যাশ টেনে সুবিমল রায় বেরিয়ে এলেন। কাগজ সম্পর্কে দু'চার কথা শেষ করে মৃগেন দত্তকে একরকম তাড়ালেন। চেয়ারে ফিরে এসে বলেন,

—প্রফেসার উইলমেয়ার তোমাকে খুঁজছিলেন। হেমেনদা কোনো ফোন করেন নি?

—কথা হয়েছে। সন্ধ্যেতে যাব। স্বামীজী কাল যাচ্ছেন কখন?

—বোম্বে মেলে। গয়ায় প্রফেসার উইলমেয়ার নেমে যাবেন। স্বামীজীর সঙ্গে থাকছেন শিবাজী নন্দা। বিশাখা দেবী আর মীনাক্ষী পরশু প্লেনে যাচ্ছে। আপাতত এখন রাণীক্ষেতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রাম হয়তো অদল-বদল হবে। মাদ্রাজের শিষ্যরা ছিঁড়ে খাচ্ছে। প্রভুর মন টেনেছে। বিশাখা দেবী মানালি-টানালি বলছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্রাম নেবার সময় হয় তো পাবেন না। সন্ধ্যেতে তুমি এসো কিন্তু।

—আমি আটটায় মিঃ ভাদুড়ীকে কথা দিয়েছি। সাড়ে সাতটার আগে 'সমন্বয়' থেকে বেরুতে পারবো না।

—আমাকে তুমি নাও পেতে পার। এখন তোমার প্রোগ্রাম কী? বাড়ি যাবে? সমন্বয়-এ যে আমি থাকবো এখন একথা তো তোমার জানার কথা নয়

—আমার নিজের কাজ ছিল। মফঃস্বল এডিশনের সুনীতিবাবুকে কিছু বলার ছিল। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম-এর রিপোর্টারদের সঙ্গে একটা বৈঠক হলো। হঠাৎ শুনলাম আপনি ডাকছেন।

—হেমেনদার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে, সে খবর তো আমার জানা ছিল না। অপারেটর বাদলকে তোমার বাড়ি দিতে বললাম, বাদল জানালো তুমি এখানে আছো। এখন যাচ্ছো কোথায়?

—আলী সাহেবের ওখানে। শুনলাম অসুস্থ। একবার যাওয়া উচিত।

সুবিমল রায় আবার মৃগেনবাবুকে চাইলেন,

—আমি যতক্ষণ আছি—থেকো। পালিয়ো না। আর দেখ, বুদ্ধি খাটিয়ে কই মাছ কিন্তু কিনো না কাঁটা মেরে মাগুরগুলো নইলে মেরে ফেলবে। আচ্ছা....আচ্ছা।

রিসিভার নামিয়ে রেখে একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলেন,

—ঠিক আছে। তোমাকে আর আটকাবো না। এসো।

চেহারা ও আকৃতিগত গঠনের প্রভূত হেরফের থাকা সত্ত্বেও আফজল আলী বেগ-এর সঙ্গে তুলনা খুঁজতে গেলে ইন্দ্রের রাজসভার চিত্রসেনের কথাই আমার আগে মনে পড়ে। উর্বশীরা ঘিরেই আছে। দিব্যাস্ত্র সংগ্রহার্থে তপস্যারত অর্জুনদের আনাগোনা এখানে সকাল সন্ধ্যে। যশস্বী সাহিত্যিক, নাট্যকার, সিনেমাব বীরপুরুষ ও নৃত্য-বাদ্যাদিতে পারদর্শীদের চোরাই অভিসার লেগেই আছে। আফজল আলী বেগ-কে চটিয়ে এ পর্যন্ত আমি কাউকেও বড় রকমের পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত হ'তে দেখিনি। আলী সাহেবের স্বয়ং ইন্দ্রের সঙ্গে দোস্তি। এই সর্বকায় প্রৌঢ় মানুষটি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের অন্যতম পুরোধা।

আলী সাহেবের ঘরে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। সকাল থেকে একজন হয়তো রবীন্দ্রনাথের অপ্রচলিত গানগুলো শুনিয়েই যাচ্ছে। একটার পর একটা। টানটান হযে আলী সাহেব শুয়ে আছেন। বিস্মৃত, অবহেলিত গানগুলির পুনরুজ্জীবিত করবার চিন্তায় মশগুল। পাশে কাবাবের থালা হাতে নিয়ে শীর্ণকায় এক বাঙালী র‍্যাবো অপেক্ষাবত। শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যমণ্ডিত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলওয়ালা শুকু লাহিড়ী দিল্লীতে দলবল নিয়ে যেতে চায়। যাবার আগে পুরো ট্রুপ নিয়ে এসে হাজির। বজ্রসেন শুকু লাহিড়ী নিজে। গুণী লোক। যথেষ্ট পরিচিত। নিভৃতে ডেকে রসিকতা করে বলেছি,

'তোমাদের একি ভ্রান্তি—কে ওই পুরুষ দেব কান্তি! পুরস্কার-টুরস্কারের তালে আছো নাকি?' শুকু লাহিড়ীর রসবোধ আছে। বেমওকা সন্দেহভাজন এক সখী এসে পড়ায়, খিস্তি না করে নাচের ছন্দে জানালো—'বোলো না, বোলো না, বোলো না'—। সন্দেহভাজন

সখী সর্বসময়ই নৃত্যরতা। অতশত বুঝলো না। পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণের একক প্রদর্শনী হাতছাড়া না করে হয়তো ভবিষ্যতে বড় রোলে প্রমোশনের আশায় সুরু করলো—'আমি দয়াময়ী! মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা—বোলো না।' কিন্তু আলী সাহেবকে শ্যামা-ই শেষ পর্যন্ত কাত করে ফেলেন।

আলী সাহেবের চেহারা ও আকৃতিগত গঠন দেখে নতুন করে বিশ্বাস জন্মায় ডারউইনতত্ত্বে। এই কৃষ্ণকান্তি, খর্বকায়, লোমশ মানুষটির দিকে শ্যামার নির্নিমেষ আঁখি ও ভক্তি বিহ্বলতার আপ্লুত সুর, 'মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন' লক্ষ্য ক'রে যে কোনো মানুষের মনেই হবে না, 'নহে নহে, এ নহে কৌতুক।' বাথরুমের সামনে সিগারেট দেওয়া-নেওয়া করবার সময় শুকু লাহিড়ীকে বলেছি, 'আলী সাহেবের খুব ভাল লাগছে।' একটা বড় রকমের চিমটি কেটে শুকু লাহিড়ী উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে শোনালো, 'এ মাণিক পেলেম আমি অনেক দেবতা পূজে, বাধার সঙ্গে যুঝে— ।'

ঘরে ঢুকে দেখি আলী সাহেব চেন লাগানো গাড়ির চাবিটা ঘোরাচ্ছেন। মনে হলো যেন ওটা সুবর্ণদ্বীপ থেকে আনা। ওটাই যেন 'ইন্দ্রমণির হার।'

তবে সমীরণ ঘোষকে দেখে অবাকই হয়েছিলাম প্রথম দিন। গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম চরিত্র। মাঠে-ময়দানে নাটক করে বেড়াতেন। নাটকের মাধ্যমেই কৃষক জাগরণ প্রচার করতেন। ছিন্ন বসন। কলাপাতে আহার। রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে শয্যা রচনা করেছেন দিনের পর দিন। দিন বদলেছে। আজ সমীরণ ঘোষের স্বতন্ত্র নাটুকে দল। শতাধিক মাজাভাঙা স্তাবক সভ্যদের মধ্যে তিনি ফুয়েরার-এর মত বিচরণ করেন। বেশীদিন কোনো শক্তিশালী নটকে তিনি সংস্থায় রাখেন না। ডানা বেরুনোর আগেই তুচ্ছ কোনো অজুহাতে তাকে বহিষ্কার করেন। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণীর কামরায় সস্ত্রীক চলেছেন। স্বামীর

গরবে গরবিনী নন—তিনিও শিল্পী। তৃতীয় শ্রেণীর কামরার অন্তরা। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে সবাই নাট্য আন্দোলনের শরিক হবার আনন্দ পেতে পেতে চলেছেন। দু-একটি ক্ষুদে গোয়েন্দাও অবশ্য আছে। সমীরণ ঘোষ তাঁদের সিক্রেট সার্ভিসে কাজে লাগান। তারা সভ্যবৃন্দের হৃদপিণ্ডের খবর সংগ্রহ করে। সংস্থার আয়-ব্যয় সম্পর্কে কারো বেয়াড়া প্রশ্ন মনে এলে, সমীরণ ঘোষ আশ্চর্য কায়দায় আত্মপ্রকাশ করেন। 'তুমি দেরী করে ঢুকেছিলে কেন? দেরী করে ঢুকেছিলে কেন?' বলতে বলতে, নাটক শেষ হতেই হতভাগ্য অভিনেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। দু-একটা সেট্ আর আলো-টালো উল্টে দিয়ে সে একটি অতি নাটকীয় দৃশ্য। আয়-ব্যয়ের প্রসঙ্গ আর ওঠেনি। অভিনেতা দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

সমীরণ ঘোষ আজ যশস্বী ব্যক্তি। নাট্যকার পরিচালক হিসাবে তিনি আজ প্রবল তেজে প্রতিষ্ঠিত। অর্থ যে কত করেছেন—সেটাই রহস্য। এ হেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিকেও আলী সাহেবের দেহের দুর্গম অঞ্চল চুলকোনোর আনন্দসুখ দিতে দেখেছি। বিকৃত ওষ্ঠাধার, নিমিলিতনেত্রে আলী সাহেব বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে উপদ্রুত প্রদেশ সম্পর্কে জানান দিচ্ছেন—'ওপরে, ওপরে, পাশে, আর একটু নিচে।'

সমীরণ ঘোষের হাত ও মুখ দুইই চলেছে। সাম্প্রতিক মস্কো ভ্রমণ তাঁকে হতাশ করেছে। আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায় এমন রুশ শিল্পীদের সম্পর্কেও তিনি খুব একটা উৎসাহ দেখান না। এতদিন সে কেন এত চেরকাশভ, চেরকাশভ শুনেছেন—সমীরণ ঘোষ বুঝতে পারেন না।

আলী সাহেব উঠে বসলেন। ঠোঁটের হাসি দেখে মনে হয়, এ সব তিনি আগেই জানতেন। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে মস্কো পর্যন্ত সমীরণ ঘোষ না গেলেই পারতেন। আলী সাহেব বিছানা থেকে উঠে কাকে যেন ফোন করতে চলে গেলেন। বসেই রইলেন

সমীরণ ঘোষ। নাট্যসংস্থার জন্যে মোটা রকমের অর্থ সাহায্যের আবেদনপত্রটির হাজারো মিথ্যে কথার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে চলেছেন।

এই আলী সাহেব। এই কলিযুগের চিত্রসেন। আফজল আলী বেগ-এর এই পরিচয়। আলী সাহেবের তিন কামরার এই ফ্ল্যাট বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম তীর্থস্থান। রাজ্যসুদ্ধ শুকু লাহিড়ী আর সমীরণ ঘোষের দল এই কলাকেন্দ্রে নিত্য আসেন।

ঢুকতেই মুখোমুখি দেখা।

'দাদা আপনি এখানে! কী সৌভাগ্য', চেয়ার থেকে একরকম লাফিয়ে ওঠে অজয়।

—তুমি এখানে কী করছো? কতক্ষণ?

—এই কিছুক্ষণ। ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল। চলেই যাচ্ছিলাম। আলী সাহেবের চিঠিটা নিয়েই কেটে পড়বো।

—কেমন আছেন আলী সাহেব?

—লাম্বাগোতে কষ্ট পাচ্ছেন। তবে এখন অনেক ভাল। চলছেন-ফিরছেন।

ঘরে অপর একজন উপস্থিত। পরিচয় নেই তবে চিনি। লেখক-প্রকাশক বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে একটা শান্তিনিকেতনী বিরাট ব্যাগ। চোখে সেলের চশমা। সিল্কের পাঞ্জাবী, হীরে বসানো সোনার বোতাম। দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের সেবা করে চলেছেন। বেস্ট সেলার কখনও নয়। তবে দুশো কপির পর সংস্করণ বাড়িয়ে বেকুব পাঠকদের চমকে দেন। বড় রকমের পুরস্কার আজও জোটেনি। 'সমন্বয়' থেকে বাৎসরিক সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়। সুবিমল রায়ের ইচ্ছে ছিল, পুরস্কার এ বছর বনমালী বাবুকেই দেবেন। কিন্তু মীনাক্ষী ধর তার আগেই দেবাশীষ মিত্রের নাম

নির্বাচন করে ফেলেছিলেন। মেয়েমানুষকে আস্তে আস্তে উলঙ্গ করে যেখানে সেখানে, যখন তখন রতিক্রীড়ার বিবিধ আসনের সুনিপুণ বর্ণনা সমৃদ্ধ শ্বাসরোধকারী উপন্যাস 'দাহ' 'সমন্বয়-'এর বিদগ্ধ পণ্ডিত নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্য হিসাবে মনোনীত হয়। আমার সময় হয়নি। সুতপা কয়েক পাতা পড়ে হাল ছেড়ে দেয়। আমার এক বন্ধুর মুখে শুনেছি, তার স্ত্রীর বাচ্চা-বিয়োনোর সময় এক ড্রাই-ডে-তে সে স্ত্রীর 'উইনকার্নিস'-ই দু-বোতল খেয়ে কোনোরকমে সে রাত্রের মত জীবনধারণ করেছিলো। কিন্তু জড় নিষ্প্রাণ বাংলা উপন্যাস যে সজীব একটি নারীদেহ উপভোগের আনন্দ দিতে পারে, তা তিনি 'দাহ'-তেই প্রথম দেখলেন। নিরালায় বসে একক মৈথুনের আনন্দে পাঠকের দেহ নাকি 'দাহ' দহন করে।

—আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে।

—কোনো দরকার নেই।

—দাদা চটে গেছেন ?

—দেখাই করো না আজকাল।

—আমি যদি বলি কাল যেতাম।

—বিশ্বাস করতাম না।

—যদি বলি কাল যাব।

—কাল না যাওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করবো না।

—আপনি অসম্ভব চটে গেছেন !

—তুমি একবার দেখা করতে পার না ?

—এবার থেকে খুব দেখা হবে। দিদি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। দাঁড়ান দিদিকে ধরতে চেষ্টা করি।

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই অজয় কোণের টেলিফোনের দিকে চলে গেল। ডায়াল করতে করতে একবার ফিরে বলে,

—ও বেলা আপনার সময় হবে ?

—কী ব্যাপার কী ?

লাইন পেয়েছে অজয়। কথা কানে আসছিলো,

—অরুণ সান্যালকে এখানে পেয়েছি। আলী সাহেবের বাড়িতে। তুমি কথা বলবে ? আমি কিস্স্যু বলিনি। তুমি বলবে তো বল, দাদাকে দিচ্ছি।

রিসিভারের মুখ চেপে ধরে অজয় আমাকে ইঙ্গিত করলো। ব্যাপারটা বুঝলাম না। হঠাৎ এত কী কথা! আমাকে খোঁজবার কী আছে। রিসিভার কানে তুলে বলি,

—বলছি।

—অরুণ সান্যাল ?

—কথা বলছি।

—অজয়টা এত দায়িত্বহীন হয়েছে আজকাল, আপনার সঙ্গে দেখা করবার আমার যে কী দরকার। আজ যাব, কাল যাব করে অজয় শুধু দেরী করে দিচ্ছে।

—কী ব্যাপার কী ?

—টেলিফোনে কী বলবো ? অন্যের সঙ্গে চলে, কিন্তু আপনার কাছে!

—কী ব্যাপার কী, বল না ?

—অজয় কিছু বলেনি ?

—না!

—আশ্চর্য!

—অবশ্য অজয় বড় সময় পায়নি। এইমাত্র আলী সাহেবের এখানে দেখা। ভয়ানক তড়বড় করেতো! যাহোক ব্যাপার কী ?

—বিকেলে আসবেন আজ ? বিশেষ কথা আছে।

—অসম্ভব।

—কিন্তু কাল সকালেই তো আমি আউটডোরে চলে যাচ্ছি। আজ আমি ফ্রি আছি। যত রাত্রিই হোক আমি থাকবো।

—সম্ভব হবে না। দুপুরে বরং তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে।

—এখনই তো দুপুর।

—এখনই। ঘণ্টা দুই পর।

—তাই আসুন। আমি বেশীক্ষণ আপনার সময় নেব না। আমার আবার এমন হয়েছে জানেন—ডাক্তার রেস্ট নিতে বলেন। কিন্তু চারদিকে এত কমিটমেণ্টেস। দুটো নাগাদ আসছেন তো? আড়াই-টেতেই ছেড়ে দেব। বিকেলের দিকে আপনার কাজ থাকে জানি।

—তিনটে হলেও ক্ষতি নেই। তবে যেতে সামান্য কিছু দেরী হতে পারে। কিন্তু কী কারণে দরকার বললে না।

'আসুন না', সুরেলা হাসির ঝিলিকের রেশ অপর প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

লেখক-প্রকাশক বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায় সব লক্ষ্য করছিলেন। চোরা চোখে দেখছিলেন। জাবনা মাখা কাঠের গামলা সরিয়ে নেবার আশঙ্কায় গাভী যেমন পদশব্দ শুনে আড়চোখে গোয়ালার মতিগতি অনুধাবন করবার চেষ্টা করে, বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখেও যেন সেই সন্দেহের দৃষ্টি।

ফিরে আসতেই অজয় বলে,

—আসলে আপনার 'বেহাগ' গপ্পোটা দিদির খুব ভাল লেগেছে। দিদি ওটা করবেন। আমাকে রোজ বলেন কিন্তু জানেন এই গেভাকলার ফিল্ম জোগাড় করতে আমার কালঘাম ছুটছে। একদম সময় করে উঠতে পারিনি। আশ্চর্য যোগাযোগ—আলী সাহেবের এখানে যে আপনাকে পাব।

অবাক হয়েছি। কমলা হঠাৎ 'বেহাগ' পছন্দ করলো। অজয় বলে চলে,

—তবে শেষের দিকটা সিনেমার খাতিরে হয়তো নতুন করে ভাবতে হতে পারে। দিদি অবশ্য বলছে তপতী মাস্টারী নিয়ে

শিলং শেষ পর্যন্ত যাবে না। দুর্দিন, প্লেন সার্ভিস বন্ধ। সুপ্রকাশ এসে দমদমে দেখা পেল। দুপুরে তো যাচ্ছেন, দেখুন কী হয়!

—তুমি থাকবে তো?

—আমাকে এখন ঘুরতে হবে। একদম সময় করতে পারবো না।

বাংলা গল্প উপন্যাস লেখা আমি ছেড়েই দিয়েছি। 'বেহাগ' আমার মনেই ছিল না। তবে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার নামধাম নিয়ে ও গল্পের পরিণতি সম্পর্কে অজয় যা বললো, তাতে মনে হয় গল্পোটা নিয়ে কমলা সিরিয়াসলি কিছু ভাবছে। মন্দ কী, অভাব তো লেগেই আছে। টাকাও নাকি আজকাল বেশ পাওয়া যায়। দুটো এয়ার কুলার বসানো আর হয়ে উঠছে না।

—আলী সাহেবের সঙ্গে তোমার কী দরকার?

—বললাম তো, স্যুটিং বন্ধ। গেভাকলারের কাঁচা ফিল্ম না পাওয়ায় আমাদের কাজকর্ম বন্ধ। চারদিকে তদ্বির করতে হচ্ছে। আলী সাহেবকে দিয়ে আচ্ছা করে লিখিয়ে নিচ্ছি। এমন গোলমালে পড়ে গেছি!

—তোমার আবার কী ছবি?

অজয় হেসে বলে,

—এবার একটা বড় রকমের কাজে হাত দিয়েছি। কী যে হবে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

আলী সাহেব দ্রুত ঘরে প্রবেশ করেন,

—এ সব কী করেছেন বনমালী বাবু। এত খাবার খাবে কে? আমাকে আপনি ভাবেন কী? আরে, তুমি কোথা থেকে! 'লাস্ট-স্ট্রং হোল্ড'-এ ঢুকে বসে আছো। একদম পাত্তা নেই। বিভাস তোমার জন্যে বৎসহারা গাভীর মত ছুটে বেড়াচ্ছে। তোমার কী মনে হয় পারবে? কারো হাতে দেবে না। বালকৃষ্ণানকে দেবে; আমি ফোনেও কথা বলবো।

এক সঙ্গে তিন জনের সঙ্গে কথা বলে পরিশ্রান্ত আলী সাহেব একটা খাম অজয়ের হাতে তুলে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বলা অবস্থায় আলী সাহেবকে বড় দেখি না। সুন্দর সোফা সেট। অনেকগুলো দামী চেয়ার। তবু আলী সাহেব ছোট্ট, নরম ডিভাণটাই পছন্দ করেন। বিরাট ঘরটাও বেশ সাজানো। সুন্দর সুন্দর পট। ভারতের নানা জায়গার লোকশিল্পের চিত্তাকর্ষক সংগ্রহ সত্যিই দেখবার। আলী সাহেবের কেউ নেই। আমি অন্তত দেখিনি। অকৃতদার। পূর্ব ইতিহাস অস্পষ্ট। চমৎকার সংস্কৃত জানেন। লেখেনও। তবে ইংরেজীতে। রাবণ সীতাকে ধর্ষণ করেছিলো কিনা, তাই নিয়ে আলী সাহেবের সঙ্গে পবিত্র তালুকদারের বেশ কিছুদিন চিঠির মাধ্যমে ঝগড়া হয়েছিল কলকাতার স্বনামধন্য ইংরেজী দৈনিকে। শেষ পর্যন্ত আলী সাহেব প্রমাণ করেন, রাবণ বাঁ হাতে সীতার কেশ ও ডান হাতে উরুদ্বয় ছাড়া সীতার অন্য কিছুই স্পর্শই করেননি। চেষ্টাও করেননি। রম্ভা স্বর্গের অপ্সরা। স্বর্গের হলেও বেশ্যা বলা চলে। রম্ভার কোনো লোকাস্ট্যাণ্ডি নেই। নলকুবেরের মস্তক চূর্ণ হবার অভিশাপকে রাবণ গ্রাহ্য করবার পাত্র নন। বাল্মিকীই আসলে ভয় পেয়েছিলেন। সীতার সতীত্ব রক্ষায় এই সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স-এর প্রয়োজন ছিল না। কারণ রাবণ লম্পট ছিলেন না। ড্রেন-পাইপ পরা রোড সাইড রোমিও-ও তিনি নন। জোর করাটাকে তিনি জানতেন ভালগর। রাবণ ছিলেন বলবান য়্যারিস্টোক্র্যাট। পবিত্র তালুকদারও কম নন। তবে 'ধর্ষণ' 'রেপ্' ও 'বলাৎকার' শব্দের হাজারো ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যায় ধর্ষিতা ইংরেজী পত্রটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। সম্পাদক ছোট্ট করে নিউজ ছাপলেন—'সীতা ধর্ষিতা [illegible]' সম্পর্কে আর কোনো মতামত ছাপা হবে না। আফজল আলী বেগ শেষ পর্যন্ত রাবণের য়্যারিস্টোক্রেসী ও সীতার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

দু'চার কথার পর অজয় চলে গেল।

পূর্ব প্রসঙ্গ ধরে আলী সাহেব বলেন,

—বিভাস পারবে?

—খাটতে পারে। যোগ্যতা আছে। আপনি ভরসা দিলে কাগজ নিশ্চয়ই চালাতে পারবে।

—খুবই তো উৎসাহী। আমার যথাসাধ্য আমি করবো। তবে প্রথম থেকেই কাগজের লাইনটা বেঁধে দিতে হবে। বিভাস পারবে আমি জানি—কিন্তু ওর ঐ লেফ্‌ট্‌ ভাবটা কাটিয়ে দেবার দায়িত্ব আমাদের সকলের। বাংলা দেশে পড়বার মত একটা ইংরেজী সাপ্তাহিক আজ বড় দরকার।

লেখক-প্রকাশক বনমালী বন্দোপাধ্যায় চুপচাপ। বাইফোকাল চশমায় অদৃশ্য এক গামলা হারানোর আশঙ্কার গভীর দৃষ্টি অতিশয় প্রকট। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলেন। হঠাৎ আধবসা হয়ে ফিরে তাকিয়ে আলী সাহেব বলেন,

—আপনি এখনও আছেন! আমি তো ভেবেছি অনেকক্ষণ চলে গেছেন।

—আমি আপনাকে ফোন করবো।

—সেটা তো আপনি করেও দেখাতে পারতেন। এই কথা বলবার জন্যে এত বেলা পর্যন্ত বসে আছেন। কিন্তু এত খাবার খাবে কে? এত এনেছেন কেন?

বনমালীবাবুর চোখে-মুখে খুশীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে। হাত জোড় করে বল্লেন,

—আমি কিছুই জানি না। অম্বালিকা সব নিজের হাতে করেছে। কোন্ ভোরে উঠেছে। কাল রাত থেকে কী যে মাথায় ঢুকেছে! আমি বললাম, পারবেন না! পারবেন না! লাম্বাগো-তে কষ্ট পাচ্ছেন। উঠতে পারেন না। কে কার কথা শোনে। অম্বালিকা বললো, আসতে পারবেন না যখন তুমি দিয়ে এসো।

আসতো, অম্বালিকা আসতো, কিন্তু দেরী হতো। দুপুরের খাওয়াটাই আপনার হয়তো····হে····হে····হে!

—অনেককাল দেখি না। আনবেন একদিন। অম্বালিকাকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

—দিন সাতেক পর আপনাকে ফোন করবো।

—বেশ তো। আমার মনে থাকবে। দেখি কী করতে পারি।

—আপনার শরীরটাও তো আবার ভাল নয়।

নমস্কার জানিয়ে বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায় ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। বাইরে প্রকাশ ছিল না, তবে আলী সাহেবের শুয়ে পড়া দেখে মনে হলো বাঁচলেন।

—আপনি শুনলাম অসুস্থ।

—আরে সেই তো হয়েছে আমার মহা ঝামেলা। শুভার্থী আর হিতাকাঙ্ক্ষীদের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে পড়ছি। সবাই জেনে ফেলেছে এলেই পাওয়া যাবে। এরাই আমাকে দেখছি আরও অসুস্থ করে দেবে।

—বিভাসের কাছে শুনলাম। তবে দেখে তো মনে হচ্ছে সেরে গেছে। লাম্বেগো অবশ্য বড় বিশ্রী জিনিস।

কথা কেড়ে নিয়ে বিচিত্রিত বালিশটা দুই হাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরে আলী সাহেব বলেন,

—তোমার 'লাস্ট স্ট্রং হোল্ড' শুনছি দারুণ হয়েছে।

—কোথায় শুনলেন?

—যেখানে যাচ্ছি।

—আপনি দেখেছেন?

—এ নিয়ে হৈ চৈ হওয়া দরকার। চীনের শক্তি সম্পর্কে আমাদের উপেক্ষা করা অন্যায়। শত্রুর শক্তিকে ছোট করে দেখা, নিজের শরীরের রোগ পুষে রাখার চেয়েও বিপদজ্জনক।

কথা চলতে থাকে। আমার হিসেবে ছিল চৌরঙ্গীর আড্ডাতেই আজ ল্যাঞ্চ সারবো কিন্তু আলী সাহেব হাঁ-হাঁ করে ওঠেন,

—প্রচুর! প্রচুর আছে। আরও দু'চার জন থাকলেও ক্ষতি ছিল না। তুমি আমার এখানে খেয়ে যাও।

রাজি হলাম। আপত্তি করলাম না।

—বনমালীবাবুর 'কাছাকাছি' উপন্যাসটা পড়েছো? খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে শুনলাম।

—বাংলা উপন্যাস ইদানীং কালে বোধ হয় পড়িনি। বনমালীবাবুর 'কাছাকাছি'-র নাম শুনেছি। তবে পড়িনি।

—কতজনকে খুশী করবো বলতে পার! আর সে কী সোজা বই! চল্লিশ ফর্মা ধরে কী এত লিখলেন! পড়বো কখন?

—চল্লিশ ফর্মায় তো 'দূরে-দূরে' উপন্যাস হওয়া উচিত।

খিলখিল করে হাসতে থাকেন আলী সাহেব। চুলকোনো এক স্বভাব। শরীর দুলিয়ে হাসেন। মেজাজ এসে গেলে ছেলে-মানুষের মত করেন।

খাবার টেবিল দেখে আমি থ বনে যাই। চিকেন-এরই কয়েক প্রস্থ। পাঁচমিশালী নানা কিছু দিয়ে আমিষ নিরামিষ দু-রকম ভাত। এলাহি কাণ্ড। ক্ষিদেও পেয়েছিল। 'কাছাকাছি' না পড়া থাকলেও বনমালীবাবু সম্পর্কে শ্রদ্ধা বাড়ছিলো। সুতপা কেন অম্বালিকার মত রাঁধতে পারে না ভাবছিলাম। প্রশংসা না করে পারা যায় না,

—চমৎকার খাচ্ছি।

গন্ধ পেয়ে কোথা থেকে দুটো বেড়াল এসে জুটেছিল। ধোপদুরস্ত চেহারা দেখে মনে হলো আলী সাহেবেরই পোষা। লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, ল্যাজ সোজা করছে। আলী সাহেব খেতে খেতে পাত থেকে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

'হ্যাঁ রান্না ভালই', আলী সাহেব চামচ দিয়ে বড় সাইজের একটা মাংসের দলা ছিঁড়ছেন।

বিনা বাক্য ব্যয়ে আমি খেয়ে চলেছি।

—খাও, খাও। অনেক আছে। ভাত কম খেয়ে মাংস খাও।

আলী সাহেব এবার এক চামচ ভাত তুলে নিলেন,

—তুমি এসে পড়ায় খুব খুশী হয়েছি। তোমার স্ত্রীকে ফোনে জানিয়ে দাও বাড়িতে খাবে না।

আলী সাহেব আবার মাংস ভাঙ্গছেন।

—ঝগড়া করে বেরিয়েছি। খাব না জানে।

'ঝগড়া কর কেন', বিলম্বিত ক্ষেদোক্তির সঙ্গে আলী সাহেব আর এক চামচ ভাত তুলে নেন।

—বাড়িতে না খেয়ে আজ মনে হচ্ছে জিতলাম। বাড়ির রান্নাটা যদি ভাল হয়। বনমালীবাবু সত্যিই ভাগ্যবান।

—স্বয়ং বিচিত্রবীর্য !

আলী সাহেব চামচেটা একরকম ছুঁড়ে মারলেন মাংসের প্লেটে।

মনে হলো যেন চটেছেন। ব্যাপারটা বুঝলাম না। প্রচণ্ড একটা বিদ্রূপ ছিল কথা দুটোতে।

—অন্যের কথা জানিনে, তবে আমার স্ত্রী এরকম রান্না জীবনেও খাওয়াতে পারবে না।

বড় সাইজের ঠ্যাঙ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবার মধ্যেও আলী সাহেবের রোষ প্রকাশ পাচ্ছিলো। খানিকটা জল খেয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত পর বললেন,

—তুমি একটা বুদ্ধু।

আমি আলী সাহেবের হাবভাবে হকচকিয়ে যাই।

—তোমার মাথায় কিস্যু নেই। শেষ করে আনলে এখনও তুমি বুঝতে পাচ্ছো না ? তুমি কী মনে কর এ সমস্ত রান্না বনমালীবাবুর স্ত্রী রেঁধেছে ? অম্বালিকা এসব করেছে ?

আমি থ।

ছিঁড়তে না পেরে বড় সাইজের একটা মুরগীর পাঁজর বেড়াল ছুটোর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আলী সাহেব এবার হেসে ফেলেন,

—আমার বেড়াল ছুটোও তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধি রাখে। গন্ধ পেয়েই ঠিক ধরেছে। তখন থেকে 'চাঙ-ওয়া' 'চাঙ-ওয়া' করছে তুমি শুনতে পাচ্ছো না।

চামচটা হাত থেকে আমার খসে পড়লো।

—অম্বালিকা রেঁধেছে! তাল মারবার জায়গা পায়নি। এদের কী বলবে! এখন হাতে ক'রে এনেছে, কী করা?

আমি নির্বাক। বিস্ময়ে বিমূঢ়।

হৃদয়ঙ্গম হতে সামান্য দেরী হলো। সবই বুঝতে পারি। লেখক-প্রকাশক বনমালীবাবু হয়তো ঠিকই করেছেন। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বালিকা যদি মহর্ষি ব্যাসের ঔরসে ক্ষেত্রজ সন্তান প্রসব না করতেন তাহ'লে শান্তনুর বংশধারা রক্ষা হ'তো কী? মহাভারতের খাতিরেই পাণ্ডু-র জন্মের প্রয়োজন ছিল। বনমালীবাবুর সাহিত্য প্রতিভা সর্বভারতীয় দুর্লভ পুরস্কার, সম্মান ও পারিতোষিকে ভূষিত ও স্বীকৃত হতে আলী সাহেবের আজ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসেরই ভূমিকা। তিরস্কারে অম্বালিকার কী যায় আসে, চাই শুধু আজ বনমালীবাবুর 'কাছাকাছি'-র পুরস্কার।

আলী সাহেবের ওখান থেকে কমলার বাড়ি অনেকটা পথ। অনেক কথাই মনে পড়ে। অজয়ের কী আশ্চর্য পরিবর্তন! এই সেই অজয়। দেখা করবার জন্যে 'সমন্বয়'-এ আমার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেছে দিনের পর দিন। নিজের উপস্থিতি জানান দিতেও ভয় পেয়েছে। আর আজ টেনে টেনে 'দাদা' বলে। আপত্তির কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু অস্বোয়াস্তি লাগে। কী আশ্চর্য পরিবর্তন। কী অসম্ভব বদলানো।

সে আজ অনেক দিন আগের কথা। অমিয় পালিত তখনও 'সমন্বয়'-এ। আমি ঘুরতে ঘুরতে কিছুদিনের জন্যে এসে

ঠেকেছিলাম সিনেমার পাতায়। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অল্পদিনেই। নানা কাজে ও নানান স্বার্থে সিনেমা ও নাট্য-জগতের অনেক রথী-মহারথীতে ঘর তখন ভরা থাকতো। আমার লেখার যে এত মূল্য তার আগে অনুভব করিনি। সিনেমা বিভাগে এসেই প্রথম মদ খেতে শিখি।

আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে অজয় প্রথম যেদিন এলো। রোগা লম্বাটে চেহারা। মাথার চুল কাত্ত করে আঁচড়ানো। মুখশ্রী সুন্দর। চোখের দৃষ্টিতে তারুণ্যের ছাপ। তবে এক লহমা তাকালেই বোঝা যায় অফুরন্ত দারিদ্র্য অজয়কে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছে। আধময়লা অজয় আমার টেবিলের সামনে এসে হাত-জোড় করে নমস্কাব করলো। জরুরী কোনো ছাপার ম্যাটার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। পেছনে ছিল কমলা। সে আমার নজরে আসেনি।

হাতেব কাজটুকু সেরে অজয়ের দিকে তাকাতেই কমলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কবে অজয় এক সঙ্গে বহু কথা বলে গেল।

বসতে বলেছি। অজয় কমলাকে বসিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে রইলো। কমলাকে আমার বেশ লেগেছিল সেদিন। একহারা গডনেব লম্বাটে গঠন। মুখটা যেন তুলিতে আঁকা। একটি নিখুঁত চেহারা। শুধু উচ্চারণে টান। 'ছিল'-কে বলে 'আছিলো'।

দেশ পদ্মাপার। দেশ বিভাগের পর শত সহস্র ছিন্নমূলের সঙ্গে অজয়-কমলাও এসেছে। বাবা শ্যামনগবে মাস্টারী যোগাড় করেছেন—তাই সবাই ধুবুলিয়া ক্যাম্প ছেড়ে এসেছে। কমলা একটা ছবিতে কাজ ক'রছে। দশ দিন সুটিং হয়েছে বললো।

বড় রোলেই অভিনয় করেছে কমলা। অবশ্য নায়িকা নয়। তবে নায়কের সঙ্গে চারদিনের কাজ। ভুল বোঝাবুঝির সিকোয়েন্স-এ বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে সে দুরন্ত অভিনয় করেছে। পরিচালক ফ্লোর-এই নাকি সুটিং এর পর মন্তব্য

করেছেন—জাত অভিনেত্রী। আরও একজন পরিচালক কমলাকে ছবিতে কাজ করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

কথা প্রসঙ্গে অজয় তার ডোরাকাটা মলিন হাফ সার্টের পকেট থেকে একটা খাম বের করলো। একটা ছবি। কমলার। ছবিতে কমলা যেন আরও ভাল আসে। সমস্ত ব্যাপারটা অল্পক্ষণেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। গোটাটাই বুঝলাম। হেসে বললাম, আপনার ছবি আমি দেখবো। সমালোচনা করবার সময় আপনার কথা আমার মনে থাকবে। ছবি ছাপার অসুবিধে অনেক। তবে চেষ্টা করবো।

সুন্দর একটুকরো হাসলো কমলা। পরণে অল্প দামী একটা রঙ্গিন সিল্কের শাড়ী। প্রচুর ব্যবহারে কোঁচকানো। বেণী না করে পাকিয়ে গড়া খোঁপার বাঁধন থেকে কিছু কিছু চুল বেরিয়ে পড়েছে। নিতান্তই অনভ্যস্ত, তাই বাঁধন এখনও শক্ত হয়নি। হাতে হলদে রঙের দু-গাছি চুড়ি। ছোট একটা ক্যাটকেটে ঘড়ি। প্ল্যাস্টিকের কালো ব্যাগের চেনটা বোধহয় নষ্ট হয়ে গেছে।

অজয়-কমলা চলে গেল।

আমি আমার কথা রেখেছি। ছবি দেখেছি। প্রেস শোতে যেচে কথা বলায় কমলা সেদিন কী খুশী। কমলার অভিনয় আমার ভালই লেগেছে। ছবিটাও। সমালোচনায় সে কথা আমি লিখেছি। তবে ছবিটা ছাপতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কী আমি চেষ্টাই করিনি।

তারপর কমলার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে বাস-স্টপেজে। সামান্য দু-লাইনের লেখা। দেখলাম কমলাকে আমি মুগ্ধ করেছি। অতিকৃতি, অতিভঙ্গী করিনি। কমলা জাত আর্টিস্ট। সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ। এমন দু-চার কথা লিখেছিলাম। দুটো বাস আমাকে ছাড়তে হলো। কমলার উচ্ছ্বাস আর কমে না। বললো, আপনাদের কাগজের একটা আলাদা কৌলীন্য আছে। আমার সম্পর্কে আপনি

যখন এত ভাল লিখলেন, অন্য পেপারগুলো খুবই প্রশংসা করলো তারপর। শুনে খুশী হবেন আমি আরও একখানা বইতে কাজ পেয়েছি!

—আপনি ভাল অভিনয় করতে পারেন। প্রশংসা নিশ্চয়ই পাবেন। আপনি অভিনয় কী ছোটবেলা থেকেই করতেন?

কমলা একটু হাসলো। বললো, 'কোন দিনই না। লেখাপড়া শিখিনি। রোজগার করবো কী করে? আমরা অনেকগুলো ভাই বোন। বাবা মাস্টারী করে আর কত পান! আমিই বড় মেয়ে। বিশ্বাস করুন অভিনয়টা সত্যিই আমার অভিনয়। আচ্ছা, অজয়কে আপনি একটা কিছুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারেন?'

আমার হাতে কাজ ছিল। বললাম, 'অজয়কে আমার অফিসে একবার পাঠিয়ে দেবেন। ওর সঙ্গে আমার কথা হবে।'

—কবে যাবে?

—যে কোন দিন। বুধবার বাদ।

—স্কুলের পর রাত এগোরোটা পর্যন্ত টিউশানি বাবা আর আজকাল করতে পারেন না। আমি আর কত পাই বলুন! কোন স্থিরতা নেই। কারো কথার কোনো মূল্য নেই। এত জঘন্য লাইন। সম্মান নিয়ে কাজ করাই মুশকিল। একমাত্র হিরোইন ছাড়া সবই তো এক্সট্রা। তবে আজকাল অনেক নাকি ভাল হয়েছে শুনছি। অনেক শিক্ষিতা মেয়ে এ লাইনে এসেছেন। আগে নাকি জঘন্য ছিল। আপনার কাছে লুকোবো না। বাসের অপেক্ষায় আছি। টালিগঞ্জ পর্যন্ত বাসেই যাব। ওখান থেকে একটা ট্যাক্সী নিতে হবে আমাকে। এত মিথ্যে কথা আর মিথ্যে ভড়ং-এর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া—

—আপনার হবে। নিশ্চয়ই আপনি নাম করবেন।

—ঐটুকু ভরসা। এই আশাটুকু আমার অবলম্বন। নইলে আমি দাঁড়াবো কোথায়?

আমার বাস এলো। কমলা অজয়ের কথা আবার বললো। অফিসে দেখা করতে বললাম।

অফিসে নয় অজয় বাড়িতে এলো একদিন। বুদ্ধি কম। বিদ্যে আরও কম। ওকে কোন কিছুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার তার চেয়েও অনেক কম।

তবে দেখলাম নিজের চাকরি-বাকরি সম্পর্কেও একটা মোটামুটি ধারণা করে এসেছে। কলকাতার বাইরে যাবে না। ঘোরাঘুরির কাজ তার দ্বারা নাকি হবে না। বললাম,

—তুমি চন্দননগর যাও। ওখানে পারিজাতবাবুর সঙ্গে দেখা করো। আমি লিখে দিচ্ছি। ভদ্রলোক বড় প্রেস চালু করেছেন। দেখ কী হয়!

সেই দিনই গেল সন্ধ্যেতেই ফিরে এলো। বললো, 'আমার নাম-ধাম লিখে নিলেন। চিঠি আমার নামে আসবে।'

চিঠি এসেছিল কিনা জানি না, তবে অজয় আর আসেনি। কমলার সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন।

প্রায় বছর পাঁচেক পর। গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে আমার স্তাবক এক বড়লোক বন্ধু খাওয়াচ্ছিল। সন্ধ্যে বেলা। বেশ ভীড়। টেবিলে টেবিলে গোল হয়ে বসা। সিগারেটের ধোঁয়া। গ্লাসের তলা থেকে বীয়ারের বুদ্‌ বুদ্‌ ছুটে আসা নিরীক্ষণ করছিলাম। এমন সময় একটা নারীকণ্ঠ আমার কানে এলো,

There's a man staring at me—the creature's spoiling my drinks. I don't know him, do you?

ফিরে তাকিয়ে দেখি সুন্দরী আর কেউ নয়—কমলা। বিশ্বাসই হয় না। কোণের এক পাঞ্জাবী যুবাই হয়তো কমলার বিরক্তির কারণ।

আমার বন্ধুটি চাপা গলায় বললো, 'হিরোইন সুদর্শনা রায়চৌধুরী।'

আমার চোখ এতটা ভুল করবে? চোরা চোখে আর একবার তাকিয়ে দেখলাম অনুমান মিথ্যে নয়। রাজা দুর্যোধনের কন্যা নন, স্বয়ং শ্যামনগরের উদ্বাস্তু শিক্ষক-তনয়া কমলাই। পাশের অবাঙালী যুবার সঙ্গে আমার কাল্পনিক অগ্নিদেবের চেহারা ও আকৃতিগত গঠনের কিছুমাত্র মিল নেই।

বন্ধুটিকে বলতেই হেসে বললো,

—কমলা ওঁর আগের নাম। আজকাল তো কমলা রায় চৌধুরী নয়—এখন সুদর্শনা রায় চৌধুরী।

আমি আমার কৌতূহল চাপতে পারলাম না। সিনেমা বিভাগ ছেড়ে আসবার পর ওদিকে আর আমার কোনো সম্পর্কই নেই। ছবিই দেখি কম—বাংলা ছবি একরকম দেখিই না। তবে সুদর্শনা রায় চৌধুরী আমার শোনা নাম। বিজ্ঞাপনের ছবি দেখে অন্তত এতদিন আমার এ পরিবর্তনের কথা জানা উচিত ছিল।

আশ্চর্য রকম পরিবর্তন হয়েছে। চেহারাটা বরাবরই তারিফ করবার। এখন দেখলাম আরও সুন্দর। যেন রূপে ঝলমল করছে কমলা। মহার্ঘ একটা ঘিয়ে রঙের সিল্কের শাড়ি আলগোছে দেহের সঙ্গে লেপটানো। অল্প একটু ব্লাউজ। অনভ্যস্ত হাতের পাকানো পাকানো খোঁপা নেই। হলদে চুড়ির চিহ্ন নেই। দুর্মূল্য প্রসাধনের রঙ-রেখা আর গন্ধে যেন মম করছে ওদিকটা।

আমাকে উঠতে হলো। একেবারে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'Everybody is staring at you'. ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ছিলাম আমিও।

কমলার আঁকা ভ্রূ-লতা যেন চরিষ্ণু এক বলাকা। বীয়ার পাত্র হাতে নিয়ে নিখুঁত উচ্চারণে এক বিলিতি দিব্যির সঙ্গে রক্তিম ওষ্ঠাধরের বিস্ময়োক্তি, 'কি অবাক। কতকাল পরে দেখা হ'লো। আপনাকে দেখে আমার ভয়ানক আনন্দ হচ্ছে।'

কমলা পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ভদ্রলোক সুদর্শনার অগ্নিদেব নন—মাদ্রাজী এক চিত্র-প্রযোজক।

প্রেম নয়—ব্যবসার কথাই চলছিল। যথেষ্ট বিনয়, সুন্দর ভদ্রতা, 'আসুন না একদিন আমার ওখানে।'

কাজের কথা বলছে তাই আর বিরক্ত করলাম না, 'নিশ্চয়ই একদিন আসবো।'

—ন্যু-লিপুরে একদিন আসুন। অনেক গল্প করবো।

সবটাই কেমন নতুন নতুন। বাঁকা উচ্চারণ কী আশ্চর্য রকম রপ্ত করেছে কমলা। ঠাট-ঠমক, জেশ্চার সবই যেন বদলে গেছে। নিউ আলিপুরের বাসায় একদিন কেনই বা যাব। কী গল্পই বা করবো আমি কমলার সঙ্গে !! এই কমলার ঠোঁটেই আমি 'আছিলো' শুনেছি এককালে।

সেবার হিস্টোরিক্যাল কংগ্রেস কভার করে ফিরছি। এলাহাবাদে অজয়ের সঙ্গে রেল স্টেশনে দেখা। অজয় বোম্বে থেকে আসছে। সে ফার্স্ট ক্লাশ শীতাতপ কামরায়—আমি তৃতীয় শ্রেণীতে এক পিঠ ভাড়ায় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে গাদাগাদি হয়ে।

প্ল্যাটফর্ম-এ দেখা। টেনে টেনে, বিলম্বিত সুরে 'দাদা' সম্ভাষণে ফিরে দেখি সুবেশা এক তরুণ। দারিদ্র্য এক সময় অজয়কে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেছে। এখন অর্থ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করবার অধিকার অজয়ের হাতে এসেছে। প্রাচুর্যের ছাপ। স্বচ্ছলতা চেহারায় সৌকুমার্য এনেছে। শৌখিন পোশাক। বিলম্বিত, টেনে টেনে 'দাদা' ভাল না লাগলেও সৌজন্য বোধ যথেষ্ট। ভদ্র, বিনয়ী। বেশ লাগলো অজয়কে।

—ছবি করছি।

—অভিনয় করছো ?

—ক্ষেপেছেন। প্রোডাকশনে আছি।

—ভালই আছো দেখছি।

—থাকতে হয় তাই আছি।

—কমলা তো এখন টপ্।

—হ্যাঁ, এখন দিদির দিন যাচ্ছে।

—আমি জানতাম কমলা নাম করবে।

—দেখা হলো, ভালই হলো। আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে।

—সিনেমায় আমাকে নামাবে ?

—আমার নিজের ব্যাপারে আপনার ওখানে যাব। আমার দৌড় তো আপনার জানা আছে। আপনি আমার বিদ্যে-বুদ্ধি সবই জানেন। আপনি আমার হাঁড়ির খবর জানেন। আপনাকে বলতে সঙ্কোচ হয় না। কিন্তু অন্য কাউকে আমার ইংরেজী বিদ্যের বহর জানাতে লজ্জা লাগে। এমনিতে বলতে-টলতে অসুবিধে হয় না। ভুল হচ্ছে কিনা বুঝতে পারি না, তাই বেশ চালিয়ে যেতে পারি। তবে নিজের নাম আর বাড়ির ঠিকানা ছাড়া তো ইংরেজী লিখতে পারি না। কারো কাছে ভাঙতেও পারি না।

—ইংরেজী দিয়ে তোমার আবার কী হবে ?

—একটা ব্যাপারে অসম্ভব ঠেকে গেছি। আমি আপনার ওখানে চলে আসবো। এমন কিছু না। আপনি শুধু একটু দেখে দেবেন। পাঁচজন যেন না হাসে। আমি তো তবু ভাল—এমন সব মাল আছে জানেন, র-ফিল্ম-এর দরখাস্ত করতে হিসসিম খেয়ে যায়। এদিকে মক্কেলের মেরিন ড্রাইভ-এ বাড়ি দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।

—এসো। এলেই তো পার।

—আসবো।

—কমলা কেমন আছে ?

—মাঝে ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছিল। এখন ভাল। দিদি নিউ আলিপুরে। আমি কিন্তু ওখানে থাকি না। মাথা গোঁজবার মত আমিও একটা ডেরা করেছি। বাবা আমার

সঙ্গেই থাকেন। আমরা সবই এখন যোধপুর পার্কের ওখানে। রামকৃষ্ণের ব্যাপারটা আছে—ওখানেই। বললেই লোকে দেখিয়ে দেবে।

অজয় চলে গেল। মনে মনে ভাবি, ভালই তো। অজয় কায়দা-কায়দা রপ্ত করেছে, কিন্তু চালবাজ নয়। পরিবর্তিত জীবনে কিছু কিছু তো বদলাবেই। ভালই লেগেছে অজয়কে।

তবে অজয় এলো না। ইংরেজী দেখাতে আসেনি। হয়তো প্রয়োজন হয়নি। অবশ্য তার পরেও দু-এক জায়গায় দেখা হয়েছে। এগিয়ে এসে কথা বলেছে। এতটুকু উন্নাসিক নয়। লুকোচ্ছে দেখে সিগারেট উল্টে চেয়েছি। একদিন বাড়ি পর্যন্ত লিফ্‌ট্ দিয়েছিলো আমাকে। প্রয়োজন ছিল না। অজয় আমার কী ধার ধারে! শুধু একটু দায়িত্বহীন। তবে অন্তর সম্পদের পরিচয় পেয়েছিলাম। অনেকের জন্যে কিছু কিছু করে।

প্রায় মাসখানেক পরের কথা। অনেক রাত। এত রাত্রে আমি শুয়েই পড়ি। কিন্তু হাতের বইটা বেশ লাগছিল। পড়ছিলাম। এমন সময় বাইরে বেল বাজার আওয়াজ।

দরজা খুলে হতবাক হলাম। দেখলাম কমলা। আবছা আলোতে যেন ঝলমল করছে।

কমলা ভেতরে এলো। একটু যেন অস্বাভাবিক। মদ খেয়েছে। চোখে মদিরতা। চলন-ফেরনে শঙ্কা। বললো, 'অজয় আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। তাড়াতাড়িতে ওর মাথার বোধহয় ঠিক নেই। আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

ঘরে এলো কমলা। খানিকটা জবাবদিহির সুরে বললো,

—অজয় যে আপনার বাড়িতে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে সত্যি আমি ভাবিনি।

—এত রাত্রে কী ব্যাপার কী?

—আমি পালিয়েছি। অজয় আমাকে বাঁচিয়েছে। কামাল আমাকে খুন করবে বলেছে!

কিছুই বুঝলাম না। শুধু আন্দাজ করলাম, স্টুডিও-র ফ্লোরের বাইরে অদৃশ্য চিত্রনাট্যের এক অবাঞ্ছিত এক্স্‌টেম্পার সিকোয়েন্সের অভিনয়ে জড়িয়ে পড়েছে কমলা। শুধু 'লোকশন্‌' হিসাবে আমার বাড়িটা কমলার পছন্দ নয়। অজয়ের ওপর চাপা বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম।

সাসপেন্স আমার মন্দ লাগে না। দর্শকের আসনে বসে সে রস গ্রহণ করতে ভালই লাগে। কিন্তু সিনেমার পর্দার সরণশীল দৃশ্যচিত্র যদি গভীর রাত্রে বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়ে, তাহলে আমার মত মানুষের পক্ষে খুব প্রীতিকর নয়।

আমি একটা প্রশ্নও করলাম না। কামাল সম্পর্কেও না। শুধু বললাম,

—অনেক রাত। এখানে তুমি নিরাপদ। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দাও। শুয়ে পড়। অজয় কখন আসবে কে জানে!

—অজয় আপনার এখানে যে কেন আমাকে ফেলে গেল।

—অজয় হয়তো ঠিকই করেছে। তাড়াতাড়িতে তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? তোমার চেহারাটা তো আড়াল করা যাবে না। দেখলেই সবাই চিনবে। নানা কথা হবে। ভিড় জমবে। তাই হয়তো কাছাকাছি আমাকে পেয়ে অন্য কিছু ভেবে দেখবার প্রয়োজন বোধ করেনি। হয়তো ফুরসুৎ পায়নি।

হঠাৎ খেয়াল হলো, আমি তো কমলাকে 'আপনি' বলতাম। শোবার ঘরে যেতে যেতে কমলা বললো,

—তাতে কী হয়েছে। আপনার মত শ্রদ্ধা করবার আঙুলে গোণা কয়েকজন লোকই কলকাতায় আমি পেয়েছি। আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন। তবে লোকের মাঝখানে 'কমলা' বলে ডাকবেন না।

সকাল হলো। কথা বিশেষ হলো না। অপরিচিত এক ভদ্রলোক এলেন। কমলা চলে গেল। শুধু একবার আমাকে পাশে ডেকে বললো, 'আপনি কিন্তু আমাকে কিছু জিগ্যেস করলেন না।'

—বলার মত হলে নিশ্চয়ই আমি শুনতে পেতাম। তবে শত্রু বৃদ্ধি না করাই ভাল। সব ব্যাপারেই হিসেব করে চলতে হয়। সুনাম-গৌরব কোনো কারণেই নষ্ট হতে দেবে না।

—সত্যি আপনি আমাকে অবাক করেছেন।

কমলা চলে গেল। আর দেখা হয়নি। কোনো দিনই না। অনেক দিন পর আজ অজয়কে আলী সাহেবের এখানে পেলাম।

কমলার বাড়ি এ তল্লাটে সবাই চেনে। আলাদীনের প্রদীপের কথা গল্পে পড়া। চোখে দেখলাম। টাকা দিয়ে সোনা কেনা যায়। কিন্তু স্বভাব-চরিত্র, ঠাট-ঠমক সবই কী বদলে যায়?

কমলা আমার 'বেহাগ' নিয়ে সুরু করলো। গল্পটা পছন্দ হয়েছে। ছবি করতে চায়। তবে 'কিন্তু' আছে। নায়কের খুঁড়িয়ে হাঁটাটি পছন্দ নয়। শেষটাও নাকি বদলাতে হবে। এই দুপুরেই মাল খেয়ে আছে কমলা।

—বাংলা বইয়ের নায়ক খুঁড়িয়ে হাঁটবে লোকে একদম নেবে না। তারপর অর্ণব ফ্যান হাজারো দর্শক পর্দাতে যদি তাঁকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে তা হলে তাদের খারাপ লাগবে। খুঁড়িয়ে হাঁটিয়েও গল্পে খুব সাহায্য হচ্ছে না। আর শেষটা ওরকম করলেন কেন?

আমি অবাক হয়ে কমলার কথা শুনছিলাম।

—বেশ টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ শেষের দিকটা যেন কেমন হয়ে গেল। গল্পের নায়িকা তার ভুল বুঝুক। দুম করে চাকরি নিয়ে আমি চলে গেলাম, অর্ণবকুমার তার ল্যাবরেটারীতে গিয়ে বসলো—এটা যেন কেমন কেমন।

পাশেই ছিলেন পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান।

পরিচালক বললেন, 'আমি তো ভাবছি ল্যাবরেটারীতেই গল্প শেষ করবো।'

ক্যামেরাম্যান বলেন, 'শেষের দিকে ল্যাবরেটারীতে দারুণ দারুণ সট আছে।'

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো। 'বেহাগ' নামটা খুব পছন্দ কমলার। কোথায় কোথায় পাল্টানো দরকার সবই শুনলাম। অনেক কিছুই ভাবছিলাম।

ডিভানে আধশোয়া অবস্থায় বেড়ালের সাইজের লোমে ঢাকা একটা কুকুর বুকে চেপে ধরে কমলা ক্যামেরাম্যানের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে,

—তাগদায় মিঃ মোথিয়ার অর্কিড কালেকশন দেখেই 'বেহাগ' আসলে আমার পছন্দ হয়। গল্পটা তাগদায় ফেলে দেব।

পরিচালক হঠাৎ মুখ তুলে বলেন,

—অবশ্য আমরা দু'রকম 'এণ্ড'-ই রাখতে পারি। শেষ পর্যন্ত দর্শক যেটা নেয় সেটাই রাখবো। গল্পে যা আছে তা থাকবে। আপনি যা বলছেন সেটাও থাক না। এয়ারপোর্টে দেখা হলো। দুর্যোগের জন্যে প্লেন সার্ভিস বন্ধ। আপনি অর্ণবের গাড়িটা দেখলেন। অর্ণব অপেক্ষা করছে। ঝড। তারপর শুধু পথ আর গাড়ি। ওরা দু'জনে যাচ্ছে। সাউণ্ড এফেক্ট এখানে তীব্র। 'বাতাসিয়া লুপ'-এ এনে ক্যামেরা গুটিয়ে যাবে।

ক্যামেরাম্যান উৎসাহী,

—আমার 'নাইফ ইন দি ওয়াটার'-এর কথা মনে হচ্ছে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম, 'বেহাগ'-এর নায়ক নায়িকা 'তপতী' ও 'সুপ্রকাশ'-এর নামোল্লেখ না করে এঁরা সুদর্শনা আর অর্ণবকুমারের চরিত্রে ফেলে গোটা বইটা দেখছে। 'বেহাগ' গল্পটা এমন কিছু নয়। মিঃ মোথিয়ার তাগদার অর্কিড কালেকশনই যেন সব।

কমলা হঠাৎ হেসে বলে,

—কই কিছু বলুন। আপনি অসম্ভব চুপচাপ।

—ভাবছি।

—শেষটা পাল্টাতে পারলে ভাল হয়। আমি আমার মত ভাবছি। আপনিও ভাবুন।

মনটা খিঁচড়ে যায়। মুখ খুলতে পারতাম সহজেই। 'বেহাগ'-এর ল্যাবরেটারীই সব। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-ব্যবস্থায় ভাল ভাল গবেষণার কাজে বৈজ্ঞানিক কী ভাবে মার খান ও পেটোয়া ধনীদের খপ্পরে পড়েন, এ কথাই আমি বলতে চেয়েছি। প্রেম আছে। তবে আমার 'বেহাগ' মোটেই নায়ক-নায়িকার ভুল বোঝাবুঝি নয়। 'বেহাগ' গল্পটির একটি শব্দও যে আমি পাল্টাতে রাজি নই এটুকু জানান দিতে পারতাম। কিন্তু সংযত করেছি নিজেকে। আগে হ'লে কিছুতেই পারতাম না। কমলার কথা, পরিচালকের দু-রকম 'এণ্ড'-এর তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করি। মনে হলো, ধৈর্য পরীক্ষা হচ্ছে। সুদর্শনা আর অর্ণবকুমার যদি গল্পের শেষে গাড়িতে পাশাপাশি বসে দুর্যোগের দিনে বাতাসিয়া লুপ আবর্তন করতে আমার 'বেহাগ' ব্যবহার করতে চায়, তাতে আপত্তি করবারই বা কী আছে? 'নাইফ ইন দি ওয়াটার'-এর তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থা তো আমার নয়। আমাকেও তো গাড়িতে নিচ্ছে। হাজার পাঁচ-ছয় নিশ্চয়ই দেবে।

পরিচালক বললেন,

—আমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ সুরু করবো। সামনের সপ্তাহে আপনার সঙ্গে সব ফাইনাল করে নেব। আমি যাব আপনার ওখানে।

—বেশতো। আমি ভেবে রাখবো। সুদর্শনাকে আমি ফোনও করতে পারি।

নরম ছোট্ট কুকুরটা কমলার শরীরের গন্ধ শুঁকছে। আদর খাচ্ছে। চাটছে। নোনা নোনা গন্ধ। মেয়েলী গন্ধ। সোনালী হুইস্কির গন্ধ।

উঠে পড়লাম। করিডোর থেকে নজরে পড়ে ছেকলে বাঁধা দুটো বিরাট এ্যালশেসিয়ান দুই নেপালী চাকরের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে।

কমলা ডিভানে শুয়েই আজ হাত নাড়লো। বাঁক ঘুরতেই সিঁড়ি। বেলা পড়েছে। আমার গাড়িটা এবার ছায়া পাচ্ছে। হঠাৎ নজরে এলো। সিঁড়ির দু'পাশে পোড়ামাটির দুটো বড় বড় ঘোড়া গমনোন্মুখ আমাকেই যেন দেখছে। ঘাড় বেঁকিয়ে পরস্পরে যেন হো হো করে হাসছে।

আজ ছুটির দিন। পাশের ফ্ল্যাটের কেষ্ট গাঙ্গুলীর ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। ভদ্রলোককে মোটামুটি পাশনম্বর দেওয়া চলে। শেতাঙ্গ এক ফার্মের বড় চাকুরে। ভাল মাইনে। হামেশাই বাইরে যান। ফরাসী স্ত্রী। অফিসেরই নতুন গাড়ি! বাড়িটাও অফিস থেকে ভাড়া নেওয়া। জেমস-বণ্ড পর্যন্ত সাহিত্যে আকর্ষণ। বাড়িতে বসে ভাল মদ একা খান। আমার মত লুঙ্গী পরেন না। মুসলমান বাবুর্চি। শহরে গোলমাল থাকলে ভয়ে গাড়ি বার করেন না। ট্যাক্সী নেন। স্ত্রীকে আমি কম দেখেছি। আলাপ সামান্যই। সুতপার কাছে কখনো-সখনো আসে। সাহেব হলেও কেষ্ট গাঙ্গুলী রসনায় পুরোপুরী বাঙালী। সুতপা একদিন দেখলাম সর্ষেবাটা ইলিশ মাছ তৈরীর কায়দা-কানুন দেখাচ্ছে।

নিছক আড্ডা নয়। টেলিফোনে কেষ্ট গাঙ্গুলীর সকালের দ্বিতীয় কাপ চা পানের আমন্ত্রণ জানানোর কারণ কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পেল। একটু বিচলিত। বাইরে খুব একটা প্রকাশ ছিল না তবু ঘুরে ফিরে ঐ একই কথা।

—আপনার কী মনে হয় আর গোলমাল-টোলমাল হবে ?

—বলা খুবই শক্ত। জোর করে কিছুই বলা যায় না। আপনি একেবারে আনাড়ির মত কাজ করেছেন।

—ইয়াকুবকে তো পানের দোকানে কাল এই মারে তো সেই মারে। শুনলাম মুসলমান বলেই ইয়াকুবকে ছেড়ে দিয়েছে। বলেছে, সাম্প্রদায়িক গোলমাল বাধাবার এক শ্রেণীর লোক চেষ্টা করবে, সেই জন্যেই নাকি ওরা ইয়াকুবকে মারধোর করেনি।

—আপনি ছেলেটাকে মারতে গেলেন কেন! বড় কাঁচা কাজ করেছেন। দু'একটা চড় চাপড় দিয়ে ছেড়ে দিলেও এতটা গড়াতো

না। ঘরে আটকে রেখে পুলিশে ফোন করতে যাওয়াই আপনার মারাত্মক বোকামো হয়েছে।

—ব্যাপারটা যে অতটা গড়াবে বুঝতেই পারিনি।

—আন্দাজ করা উচিত ছিল।

—আসলে অরুণবাবু ব্যাপারটা কী জানেন, লোফারটা আমার স্ত্রীর সঙ্গে ইংরাজীতে তর্ক সুরু করলে আমি ধৈর্য রাখতে পারিনি।

—লোফার-টোফার বলবেন না।

—লোফার নয়তো কী ?

—আপনার ভুল হয়েছে ওখানেই। বিদেশে ছিলেন মশাই। কলকাতার হালচাল যে কী, কিছুই জানেন না। বন্দুকের নল দিয়ে যদি ওরা ক্ষমতা দখল করতে চায়, তবে আমার-আপনার কী ? দেওয়াল নষ্ট করুক না। তাছাড়া আপনিও ভাড়াটে। দেওয়ালের মালিক নন। এটা আপনি বোকার মত কাজ করেছেন। আর এদের চটিয়ে আপনি টিকতে পারবেন মনে করেছেন ? ঐ সব লোফার-টোফার বলবেন না। ব্রাশ সুদ্ধু যাকে আপনি ধরেছিলেন, সে ছোকরা ফাইন আর্টসের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। এরা উগ্র, কিন্তু শিক্ষিত। এরা পাড়ার লোকের সমর্থন পাবে। তাছাড়া আপনি একেবারে মাটি খাওয়া কাজ করেছেন, পঙ্কজবাবুকে আপনি ধাক্কা মারলেন। চেনেন না, জানেন না। গুরুত্ব না বুঝে এমন হঠকারিতার মধ্যে গেলেন, আমি না এসে পড়লে মুশকিল হতো।

—আপনি না থাকলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। যাক যা হবার হয়ে গেছে। ব্যাপারটা এখন আর না গড়ালে রক্ষে।

পরশুর অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছিল। কেষ্টবাবুকে আদৌ সমর্থন করা চলে না। এমন বেকুব মানুষ। আমি না এসে পড়লে মুশকিলই হতো।

দূর থেকেই লক্ষ্য করেছি। লোকে লোকারণ্য। আমাদের বাড়িটা আক্রান্ত হয়েছে। ইঁট আর খোয়ায় কাচ ভাঙছে জানলার।

সে এক মারমুখী জনতা। দেওয়ালে কালো রঙ দিয়ে রাজনৈতিক শ্লোগান লিখছিলো এক ছোকরা। কেষ্টবাবু হাতেনাতে ধরেছেন। চড় মেরে টানতে টানতে ঘরে টেনে এনে পুলিশে ফোন করছিলেন। ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে যাবার আগে আমার হস্তক্ষেপ কাজের হয়। পঙ্কজবাবু এ তল্লাটের অবিসংবাদিত নেতা। কেষ্টবাবু কাউকেই চেনেন না। কার সঙ্গে কোথায় কী রকম ব্যবহার করতে হয় কিছুই জানেন না। আমি ব্যাপারটা আশ্চর্য রকম আয়ত্তের মধ্যে রেখেছি। দলের দু-একজন পাণ্ডা আমার পরিচিত। বন্দীমুক্তি, অটোমেশন ও ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য তুলে নেবার কাগজ-পত্রে দ্বিধাহীন চিত্তে সই দেবার সময় আমার এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আমার ঘরেই জিনিভা কনফারেন্স বসিয়েছি। কিন্তু কেষ্ট গাঙ্গুলী কিছুতেই ক্ষমা চাইবেন না। যেন মূর্তিমান ফস্টার ডালেস। শেষে অনেক কষ্টে রাজি করানো গেল। কিন্তু আর্টস কলেজের তরুণ ছোকরাই শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসে। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করলো,

—আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া অর্থহীন। আমার ব্যক্তিগত মান-অপমানের ঘটনা আদৌ নয়। ব্যাপারটা পার্সোনাল নয়। কেষ্টবাবু হঠাৎ চটে গিয়ে এমন কাজ করেছেন, এ কথা বিশ্বাস অন্তত আমি করি না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী প্রিভিলেজড্ ক্লাস তৈরী হয়েছে। পরশ্রমভোজীদের দালাল না হলেও চিন্তাধারায় তাঁরা তাদের শরিক বলা চলে। কেষ্টবাবু সেই শ্রেণীর একজন। পঙ্কজদা এ তল্লাটের একজন গণ-প্রতিনিধি। তিনি যা স্থির করবেন তাই হবে।

পঙ্কজবাবু আর আমার চেষ্টায় ব্যাপারটা মিটে যায়। কিন্তু কেষ্টবাবু কাল সকালে অফিসে বেরুনোর সময় মোড়ের মাথায় গাড়িতে ইঁট খেয়েছেন। ইয়াকুবকে এই মারে তো সেই মারে—গত রাত্রের ঘটনা।

—আপনি আর ঘাঁটাঘাটি করবেন না। কেউ রিমার্ক পাস করলে উপেক্ষা করবেন। আপনার স্ত্রী শুনলাম বন্দুক খুঁজছিলেন—আপনার কী মাথা খারাপ। টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন। লোফার-টোফার বলবেন না। ওসব মনেই চেপে রাখুন। ঘটনা যা ঘটে আমাকে জানাবেন।

একটা ফোন এলো। কেষ্টবাবু রিসিভারে আমাকে ডেকে দিয়ে বললেন,

—মিসেস কথা বলবেন।

সুতপা আমাকে কেষ্টবাবুর বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করায় একটু অবাক হয়েছি। রিসিভার কানে নিয়ে বলি,

—বল।

—শীগ্‌গীর এসো। তোমাদের রাখালবাবু ফোন করেছিলেন। অমিয় পালিতকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তোমাকে এখনই পি. জি'তে যেতে বলেছেন।

'কোনো খারাপ খবর নয় তো', রিসিভার নামিয়ে রাখতে কেষ্টবাবু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন।

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কেষ্টবাবুর কথায় হুঁশ ফিরে আসে, 'না সেরকম কিছু নয়। আমাদের পরিচিত একজন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে গেছেন। আমাকে এখনই উঠতে হবে। পরে কথা বলবো।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে আমি কেষ্ট গাঙ্গুলীর ঘর ছেড়ে এলাম।

বিস্তর ভিড়।

এমার্জেন্সীতে অমিয় পালিতকে আনা হয়েছিল। গাছতলায় কয়েকজনের সঙ্গে রাখালবাবু। ইতিমধ্যে অনেককে বলেছেন। আমাকে আবার শোনালেন। রাত্রে অমিয় পালিত ভালো মানুষের মত শুতে গিয়েছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন।

রাখালবাবু রাত এগারোটা পর্যন্ত ছিলেন। রাখালবাবুর কোনোরকম সন্দেহ হয়নি। ঘরে আলো জ্বালা দেখে কেদারের প্রথম সন্দেহ হয়। কেদারকে অমিয়বাবু ইশারা করেন। কথা বলতে পারেন না।

বুদ্ধি করে কেদার প্রথমেই রাখালবাবুকে ডেকেছেন। ফোন পেয়ে রাখালবাবু সোজা চলে এসেছেন। সেই থেকেই চলছে।

—করোনারী ?

—ডাঃ মিত্র খুব চেষ্টা করছেন। তবে কিছুই তো বড় একটা করার নেই।

—পড়ে-টড়ে গিয়েছিলেন কী ?

—কেদার বলেছে না। অমিয়দাকে আমি এসে বিছানাতেই দেখি। সত্যিই বিশ্বাস হয় না। কয়েকঘণ্টা আগেও আমি আড্ডা দিয়ে গেছি মানুষটার সঙ্গে। দিব্যি ছিলেন।

'করোনারী অনেকটা শারীরিক ক্যু-ডেটা। যেখানে-সেখানে যখন-তখন বেমওকা ভাবে আত্মপ্রকাশ করে', একজন আধা-পরিচিত ভদ্রলোক মন্তব্য করেন।

—খুব চেষ্টা করছেন ডাঃ মিত্র। রাত থেকে এ পর্যন্ত ভদ্রলোককে বসতে দেখলাম না।

—বড়বাবু জানেন ?

—এই তো এইমাত্র গেলেন। বড়বাবু বলছেন, দরকার হলে ভেলোর থেকে ডাঃ মাথুরকে তিনি আনাবেন। তবে আমার মনে হয় ডাঃ মিত্রই যথেষ্ট। ডাঃ মিত্র কী একজন সাধারণ ডাক্তার !

বেলা বাড়ছে। খবর ছড়াচ্ছে। অনেকেই আসছেন-যাচ্ছেন। একই কথা বার বার। রাখালবাবুর কাছে শোনা কথা আমিও জানান দিচ্ছিলাম। করোনারীতে কবে কে ঠিক এই রকম আক্রান্ত হয়েছেন, কোন ডাক্তার যমের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিলেন—ব্যক্তিগত জীবনের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা অনেকেই জানান দিচ্ছেন।

সুবিমল রায় আবার এলেন। চিন্তিত! চীফ রিপোর্টার রাখাল-বাবুকে সুবিমল রায় নিভৃতে ডেকে নেন। কাঁধের ওপর হাত রাখলেন। কিছু বলতেই রাখালবাবু প্রবল বেগে মাথা নাড়লেন। ইঙ্গিতে আমাকে পাশে ডাকেন সুবিমল রায়। শুনলাম। তবে রাখালবাবুর সঙ্গেই আমি একমত হই। বললাম,

—এ সময়ে আর ডাঃ মাথুরকে ডাকবার দরকার নেই। ডাঃ মিত্রও কম নন। তাছাড়া এ এমনই কেস—চেষ্টাই করা যেতে পারে। ওষুধপত্তর আর ডাক্তারী মারপ্যাচের বড় স্কোপ নেই।

রাখালবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সুবিমল রায় ডাঃ মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমিও সঙ্গে রইলাম। ডাঃ মিত্র সুবিমল রায়ের পরিচয় শুনে খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না। আমার দিকে ফিরেও দেখলেন না। যা কিছু বলার রাখালবাবুকেই বললেন। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য ভরসা হারানোর কারণ নেই। রোগীর অবস্থা এখন একটু ভালোর দিকে।

সুবিমল রায় হঠাৎ ডাঃ মিত্রের হাত চেপে ধরে বলেন,

—আপনি জানেন না, কতবড় একটা প্রতিভাকে বাঁচানোর ভার আপনার হাতে। যে কোনো মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত। আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

ডাঃ মিত্র মিষ্টি একটুকরো হাসলেন। সুন্দর একহারা গড়ন। ভদ্রলোকের যোগ্যতা সম্পর্কে বাজারে অনেক 'মিথ্' চলতি আছে। ইয়োরোপ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল ও অন্যতম বীর চিকিৎসকদের অধীনে কাজ করেছেন। পরিচয় আমি পাইনি, তবে যে কোনো রোগী ডাঃ মিত্রের সামনে এলে কোথায় যেন একটা ভরসা পাবেন বলে মনে হয়।

সুবিমল রায়ের দিকে ফিরে ডাঃ মিত্র বলেন,

'আমি সব জানি। তবে এখন সে আলোচনা অর্থহীন। আমি নিজে সব সময় থাকছি।

আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করছি। আপনি বিচলিত হবেন না। আমাদের কাজ করতে দিন।' রাখালবাবুর দিকে ফিরে ডাঃ মিত্র বললেন, 'আপনি সেই রাত থেকে কেন আছেন? এত লোকের থাকবার কোনো দরকার নেই। একজন থাকলেই যথেষ্ট। বাড়ি যান। পরে আসবেন।

ফেরার পথে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুবিমল রায় বলেন,

—চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের উৎকণ্ঠায় রাখবে। রাখাল আমি বাড়িতেই থাকবো। দরকার হলে ফোন করবে। সঙ্গে তোমার টাকা আছে তো?

—আছে।

—আরও কিছু রাখো।

—দরকার হবে না।

সুবিমল রায় সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

আমাদের দেখে কেদার এগিয়ে এলো। অমিয় পালিতের গত পঁচিশ বছরের অতি পুরাতন ভৃত্য। বন্ধু, পাচক, সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনের পরামর্শদাতা ও দুর্দিনের একমাত্র সঙ্গী। পাগল পাগল চেহারা হয়েছে কেদারের। দেখে মনে হলো রাখালবাবুর কাছে প্রভুর সর্বশেষ সংবাদ শোনবার জন্যে সে ব্যগ্র। রাখালবাবু কেদারের উৎকণ্ঠা ভেঙে দিয়ে বলে,

—ভালই আছেন। তুই এখন কী করবি? আমার সঙ্গে চল।

—কোথায় বাবু?

—আমার বাড়িতে যাবি। আবার আমার সঙ্গেই আসবি। আরে তোর অসুখ করলে দাদাকে দেখবে কে? চল গাড়িতে চল।

—আমি এখানে কোথাও খেয়ে নেব। আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।

—তুই খামাখা থেকে কী করবি?

—যদি দরকার-টরকার লাগে।

—সে জন্যে তোর চিন্তা নেই। তাছাড়া ঘণ্টা দুই পরেই তো আবার আমরা ঘুরে আসছি।

একটা লোককে পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের মধ্যে এ এক নতুন দৃশ্য।

—চোর ?

রাখালবাবু হেসে বললেন,

—মহা চোর। তুমি আসবার কিছুক্ষণ আগেই ধরা পড়েছে। সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। নাম পাল্টে-পাল্টে, মিথ্যে পরিচয়ে লোকটা নাকি প্রায়ই নিজের শরীরের রক্ত বেচতে আসতো। আজ হাতে-নাতে ধরা পড়েছে।

রাখালবাবু কেদারকে নিয়ে চলে গেলেন। আমিও রওনা হলাম।

অমিয় পালিতের কথা বার বার মনে পড়ে। এই মানুষটি হেরে গিয়েও যেন সবাইকে হারিয়েছেন। কত বড় বড় অফার—নেননি। নিজের পছন্দ মত মানুষ নিয়ে কাগজ বের করেছেন। রাখতে পারেন নি। সাংবাদিক হিসাবে এত সম্মান আজ পর্যন্ত কেউ পেলেন না। মাকর্সবাদী পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না। তবে 'সমাজতন্ত্রবাদ' নামে অমিয় পালিতের পুস্তকটি আজও বাংলায় অন্যতম প্রামাণ্য বই। বাংলা দেশের আর্ধেকের বেশী সফল জার্নালিষ্ট অমিয় পালিতের হাতে গড়া। মদ, জার্নালিজম আর খিস্তি—রাখালবাবুর মত আরও কয়েক জনকে হাতে ধরেই শিখিয়েছেন। বাংলা দেশে অমিয় পালিতের বিশেষ 'স্কুল অফ জার্নালিজম' এখনও কিছুকাল চলবে। কেদারকে ছাড়া অমিয় পালিতের হারানোর মত কেউ নেই। অনিবার্য যকৃতের ব্যামোয় পুরাতন বন্ধুদের অনেকেই স্বর্গারোহণ করেছেন। আমরাই শেষের ব্যাচ। আমাদের পর নতুনদের আর অমিয় পালিতের সঙ্গে কাজ করবার সৌভাগ্য হয়নি।

বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া সেরে সবে সিগারেট ধরিয়েছি, এমন সময় ফোন। রাখালবাবুর। অবস্থা খারাপ। আশঙ্কা আমার ছিলই।

গাড়িও তাই গ্যারাজে তুলিনি। দু'চার মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি। তবু হাসপাতালে পৌঁছোতে কিছু দেরী হলো। আজ শহরে কী যেন একটা আছে। আমার খেয়াল যখন হলো তখন গাড়ি ঘোরানো আর সম্ভব নয়। খাদ্য মিছিল বা বাম কমিউনিস্টদের বড় রকমের জমায়েত হয়তো ছিল মনুমেণ্টের নিচে। জনস্রোত সরে যেতে বিলম্ব হলো। হরিশ মুখার্জি রোড পেতে যথেষ্ট সময় লাগলো।

ঢুকতেই অশুভ একটা থমথমে ভাব। কাউকে কিছু জিগ্যেস করতেই ভয় লাগে। অনেক লোক। বহু মানুষের ভীড়। সবাই চুপচাপ। হঠাৎ নজরে পড়লো মঙ্গলাকে। অমিয় পালিতের ভাগ্নে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে শব্দ না করে কাঁদছে। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো। তবু যেন বিশ্বাস হয় না। ধারে কাছে রাখালবাবুর চিহ্ন নেই। শুধু তাঁর গাড়িটা রোদ্দুরে পুড়ছে।

রোদ্দুর বাঁচিয়ে খাপছাড়া টুকরো টুকরো জটলা। নামতেই গগলস্ পরা মৃগেন দত্ত। অমিয় পালিত নেই। দুটো দশ মিনিটে দেহত্যাগ করেছেন। সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। এ সংবাদ শোনবার জন্যে মন কিছুটা তৈরীই ছিল। কিন্তু ডাঃ মিত্রের ভরসায় কিছুটা আশা নিয়ে ফিরেছিলাম। ভদ্রলোকের ওপর রাগই হলো।

—আপনাকে খুঁজছিলেন রাখালবাবু।

—কোথায় রাখালবাবু?

—বোধ হয় ডাক্তারের ঘরেই। এই মাত্র ছিলেন।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

মুখোমুখি দুজনে। মনটা আমার ডাঃ মিত্রের ওপর খিঁচড়ে ছিল; কিন্তু রাখালবাবুর হাবভাব দেখে একটু অবাকই হলাম। বাঁচাতেই তো পারেন নি। ডাঃ মিত্রের কাছে উপকৃত হবার কি আছে।

—আমি জানি আপনি কী চেষ্টাই করেছেন। তবে টেলিফোনে আপনি দিল্লীর ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে যোগাযোগও রাখছিলেন এটা জানতাম না।

—প্রয়োজন ছিল না, তবু ডাঃ মুখার্জিকেও পরামর্শ করেছি প্রতি পদে। রাখতে পারলাম না। বাংলা দেশ একজন প্রতিভা হারালো। আপনারা অনেকেই অমিয় পালিতের গুণমুগ্ধ, স্নেহের পাত্র। অমিয় পালিতের মৃত্যু আপনাদের কাছে অনেকখানি, বুঝি। রাখালবাবু হয়তো আপনি জানেন না, ঋণ আমার শোধ হতো না কোনো দিনই, কিন্তু আমি যে অপ্রস্তুত হয়ে থাকবো সারাজীবন। মেডিক্যাল পড়া আর এম আর. সি. পি করবার প্যাসেজ মানি সবই আমার অমিয় পালিতের কাছে পাওয়া। আমার জীবনের সামান্য যেটুকু সাফল্য সবটাই অমিয় পালিতের সাহায্যে, এ কথা হয়তো আপনি জানেন না রাখালবাবু।

ডাঃ মিত্র চোখের জল গোপন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। আমার কঠিন হৃদয়, তবু পকেটে রুমাল খুঁজি। রাখালবাবু সর্বস্বান্ত। হাউ হাউ করে কাঁদছেন।

ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে। খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। গোটা বাংলা দেশের গুণীজন যেন পি. জি.তে আজ ভিড় করেছেন। পত্রিকা অফিসের গাড়ি আর স্বনামধন্য মানুষের আনাগোনায় হাসপাতালের স্বাভাবিক অবস্থা ব্যহত হয়। এসেছেন দিকপাল। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। প্রাক্তন টেরোরিস্ট। লোক-সভা ও বিধান-সভার সদস্য। এলেন আলী সাহেব। সংবাদপত্রের কর্মীবৃন্দ। এলো ছাত্রদল।

সত্যিই দেখবার। এ এক আশ্চর্য সমন্বয়। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না এমন মানুষও পরস্পরে আজ একত্রে মিলেছেন। আইন সভায় পরস্পরে ফাটাফাটি করেন, তবু অমিয় পালিতের খবর পেয়ে দু'জনেই এসেছেন। আসলে অমিয় পালিত একটা বিশেষ যুগের প্রতিনিধি। একটা দুরন্ত ব্যক্তিত্ব। ঝলমল করা দেদীপ্যমান সত্য পুরুষটিকে কেউ ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। ভয় পায়। হয়তো

হিংসার পাত্র অনেকের। কিন্তু ঘৃণার পাত্র কখনও নয়। এ ধরনের ব্যক্তিত্ব আজ বাংলা দেশ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে।

ভাবাবেগে চঞ্চল মানুষ সুবিমল রায়ও উপস্থিত। সবার সামনে প্রায় একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন,

—অমিয় পালিত যে আমার জীবনে কতখানি সে আর কেউ না জানলেও আমি জানি। আমার সঙ্গে যেটুকু বিরোধ—আদর্শগত। কিন্তু ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেছি। অতিশয় আত্মসম্মানী পুরুষ। শিশুর মত মন। যখনই যা বলেছি, দ্বিধাহীন চিত্তে অমিয়বাবু এগিয়ে এসেছেন। 'সমন্বয়' পত্রিকার আজ এই সাফল্যের পেছনে অমিয় পালিতের কতখানি দান অন্য কেউ স্বীকার না করলেও আমি তা ভুলতে পারবো না। আমি তো ভুলতে পারবো না যৌবনের সেই অমিয় পালিতকে। যাঁর তীব্র ও ধারালো লেখনী ইংরেজ প্রভুদের বিনিদ্র রজনীর কারণ হয়েছিল আমি তো ভুলতে পারি না, 'সমন্বয়'-এ জোরালো এডিটোরিয়াল লিখে অমিয় পালিত আমার মতই কারা-লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। আমার সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ—শেষ পর্যন্ত অমিয় পালিত চলে গেলেন। আমি ধরে রাখতে পারিনি। তাঁর মত সত্যনিষ্ঠ চরিত্র আমাদের সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। আদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও অমিয় পালিতের চরিত্র থেকে আমাদের শিখতে হবে।

পালাৎসো ভিনিৎশিয়ার ঐতিহাসিক ব্যালকনী নয়, কিন্তু পি. জি. হাসপাতালের এই প্রাঙ্গণে সুবিমল রায়ের কথার মধ্যে আমি যেন আজ মাত্তিওত্তি হত্যাকাণ্ডের পর মুসোলিনীর আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তৃতা শুনলাম। মিথ্যার পর মিথ্যা জীবন, কাল্পনিক কথা ও কাহিনীর সপ্রচুর অভ্যাসে নিজের আত্মাপরাধ আজ আত্মীকরণে উত্তীর্ণ। এ সবই আজ বিশ্বাস করেন সুবিমল রায়।

রাখালবাবুকে ছাড়লাম না। এক রকম জোর করে ধরে নিয়ে যাই। বললাম,

—আপনি না খেয়ে আছেন! কোনো মানে হয়! এখন আর আপনার না থাকলেও চলবে। চলুন চট করে ঘুরে আসি।

আধঘন্টাও লাগেনি। ফিরে আসতেই মৃগেনবাবু বললেন,

—শহরের অবস্থা খারাপ। কিছু শুনলেন-টুনলেন? য়ুনিভার্সিটির ওখানে গুলি চলেছে। শহরে ১৪৪—বড় রকমের মিছিল হয়তো করা যাবে না।

—মিছিল করবার দরকার কী? কিন্তু সব গেলেন কোথায়? এত মানুষ কোথায় সব?

'ছবি তুলে আর প্রেস রিপোর্টারদের কাছে নাম লিখিয়ে মক্কেলরা কেটে পড়েছেন', অল্পবয়সী এক তরুণ পাশ থেকে মন্তব্য করে। 'আমরা থাকবো, কোন ভয় নেই। দরকার হ'লে আরও ছেলে আনতে পারবো।'

বেরুতে বেরুতে বিকেল গড়িয়ে গেল। মঙ্গলা-র কান্না আর থামে না। কেদারের কোনো অভিব্যক্তি নেই। অপেক্ষাকৃত কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে। ভাষাহীন, মূক জানোয়ারের দৃষ্টি যেন কেদারের চোখে। কী যে হয়ে গেল বুঝতে অক্ষম। আমি জানি একমাত্র কেদারকেই অমিয় পালিত রিক্ত করে গেলেন। মঙ্গলাকে কেদারই খবর দিয়ে আনিয়েছে। ভাগ্যে মঙ্গলাই আজ পৃথিবীতে অমিয় পালিতের একমাত্র উত্তরাধিকারী। ক্যাশ টাকা কিছু নেই। স্থাবর সম্পত্তি আদৌ থাকবার কথা নয়। শুধু কিছু বই আছে। দুই যুগ অতিক্রান্ত, 'সমাজতন্ত্রবাদ' আজও বেশ বিক্রি হয়। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মঙ্গলার হয়তো কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু 'সমাজতন্ত্রবাদ' পুস্তকের অধিকার থেকে মঙ্গলাকে যে বাদ দেওয়া যাবে না, সেটা মঙ্গলার কান্না দেখে ধারণা করা চলে।

আমি গাড়িটা হাসপাতালেই রেখেছি। রাখালবাবু ড্রাইভারকে তাঁর গাড়ি শ্মশানে পৌঁছে দিতে বলে শবানুগমনে এলেন। আলীসাহেব বিদায় নিলেন।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মতিগতি শুভ নয়। আলীসাহেব বিদায় নিলে এঁরা যে ক'জন থাকবেন শেষ পর্যন্ত বোঝা মুশকিল। রাখালবাবু বললেন,

—ছাত্ররা খবর পেয়েই এসেছে। এরা না থাকলে মুস্কিল হতো।

—সঙ্গে থাকলেও কাঁধ দিতে অনেকেই চান না। ছাত্রদল আসায় সুবিধে হলো। তবে এরা সব বাম কমিউনিস্ট। লাল ঝাণ্ডা ওড়াতে চাইলো না দেখে অবাক হচ্ছি।

হাজরার মোড়ে এসে আমি অবাক হলাম। যা আশঙ্কা করেছিলাম। বেরুনোর সময় লোক মন্দ ছিল না। চোখ এড়িয়ে অনেকেই সরে পড়েছেন। এখন দেখছি আমরা ক'জন। অল্পবয়সী তরুণ ছাত্রের মন্তব্য আমার কানে বাজে, 'ছবি তুলে আর প্রেস-রিপোর্টারদের কাছে নাম লিখিয়ে মক্কেলরা কেটে পড়েছেন।'

কয়েক দিনের অশান্তি গতকাল উঠেছে চরমে। শহরের অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়েছে। আজ সকাল থেকেই থমথমে ভাব। আজ ধর্মঘট। সব কিছুই বন্ধ। জোর করে ট্রাম চালানোর কথা ঘোষণা করা হলেও সম্ভব হয়নি। বড় রাস্তায় ক্রিকেট খেলা চলেছে।

অমিয় পালিতের ব্যাপারে দু'দিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। সুবিমল রায় বড় রকমের এক শোকসভা ডেকেছেন। শহরের যা পরিস্থিতি শনিবারেও অবস্থা স্বাভাবিক হবে বলে মনে হয় না।

প্রেসের গাড়িতে এক রাউণ্ড শহর প্রদক্ষিণ করে এলাম। সকালের দিকে বিশেষ কিছু হয়নি। উত্তর কলকাতায় কয়েকটা বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়েছে। বোমা আর ইঁট-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পুলিশকে কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাতে হয়।

অবাক হলাম। সুতপা বাড়ি নেই। আরও শুনলাম অমিতের এক বন্ধু এসেছিল সুতপাকে নিতে। গোপালকে প্রশ্ন করি,

—সেই দাড়িওয়ালা ছেলেটা ?

—না। তবে গোঁফ আছে।

—কিসে গেল ?

—হেঁটে। সবই তো বন্ধ।

—কোথায় গেল ?

—জানি না।

—কিছু বলে গেছে ?

—না।

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। খেতে বসে চটেই গেলাম,

—দু'দিন ধরে সবাই জানে আজ ধর্মঘট। কাল মাছ কিনে রাখিসনি কেন ? জুতো মেরে বাড়ি থেকে তাড়াবো সব। এগুলো কে খাবে ?

—বৌদিকে বলেছিলাম। বৌদি বললো দরকার নেই!

সুতপার ওপর আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। শহরের অস্বাভাবিক অবস্থা। হেঁটে হেঁটে কোথায় যেতে পারে ভাবছিলাম। ঐ গোঁফওয়ালা ছেলেটা কে?

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর সুতপা এলো। পরিশ্রান্ত। মুখটা রোদে তেতে লাল হয়ে গেছে। হাতের ব্যাগটা রেখে ব'ললো,

—কতক্ষণ?

প্রচণ্ড একটা বিরক্তি দলা পাকিয়ে উঠছিলো, তবু নিজেকে সংযত করেছি। কথার জবাব দিলাম না। সুতপা মাথার কাঁটা খুলছিলো। গরম চুলগুলো আলগা করে হাওয়ায় এসে বসলো। একবার ফিরে তাকিয়ে একটু ভয়ে ভয়েই বললো,

—এদিকে তো কাণ্ড হয়েছে।

—অমিতকে ধরে নিয়ে গেছে?

'তুমি কোথা থেকে শুনলে?' সুতপার চোখে বিস্ময়।

—আন্দাজ করলাম। আমাকে এত বুদ্ধু ভাব কেন? কিন্তু তুমি কী ছাড়াতে গিয়েছিলে?

—লক আপ থেকে আজ জেলে নিয়ে গেল। শরীরটাও বেচারার ভাল নয়।

—তুমি কোথায় ছিলে? কে তোমাকে এ সবের মধ্যে যেতে বলেছে?

—তুমি ছিলে না, খবর পেয়ে তাই আমাকে যেতে হলো। জামা কাপড় কিছু দিয়ে এলাম।

—এ আমি জানতাম।

—তুমি একটু ফোন-টোন করে দেখ না।

—কোথায় ফোন করবো?

—তোমার তো জানা শোনা আছে।

—সুতপা তোমার এই ন্যাকা ন্যাকা কথা আমার একদম ভাল্

লাগে না। অমিত সম্পর্কে তোমার সমর্থন থাকতে পারে কিন্তু আমার নেই। আমাকে তো পাত্তাই দিতে চায় না। অনেকটা খোলা জায়গা আছে—আমাকে পোলট্রি করবার উপদেশ দেয় অমিত। আমাকে সে উপেক্ষা করে। ইদানীং একে বারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অমিত সম্পর্কে আমার কোনো সিমপ্যাথী নেই আজ। তুমি জামা কাপড়, টুথব্রাশ পৌঁছতে গিয়েছিলে। আমাকে জিগ্যেস করা উচিত ছিল। আমি চাই না তার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র যোগাযোগ থাকুক। অমিত আমার এখানে ভবিষ্যতে আর না এলে আমি খুশী হবো। জানিয়ে দিও। অনেক দিন, অনেক ভাবে বলেছি তোমাকে। ঝগড়া কর, আমার কথা বুঝতে চাওনি। বিপ্লব করবেন? তবে আমার জানা-শোনা আজ দরকার পড়ে কেন? কিছুদিন ঘানি টানুক। হ্যাঁ আমি পারি। কিন্তু সে আমার কথা শুনবে? লিখে দিক সব ভুল করেছে। ক্ষমা প্রার্থনা করুক। আমি জানি সে এসব করবে না। আগে আগে মনে হতো হয়তো কোথাও আমারও ভুল হচ্ছে। এখন দেখছি সবই ঠিক। এতটুকু ক্ষমা নয়। এদের ওপর নির্মম না হলে দেশটাই রসাতলে যাবে। কাল রাত্রে গোপালকে পাঠিয়ে কিছু মাছ কিনিয়ে রাখলে কি দেশদ্রোহিতা হতো? কোন দিন শুনবো তুমি ধর্মঘটীদের সঙ্গে মিছিলে গেছো। ঐটুকু আমার দেখা বাকি আছে। কোনই যোগ্যতা নেই। তোমার কিছু দেবার ক্ষমতা নেই। আছে নিরেট খানিকটা আত্মসম্মান।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। সুতপা উঠে গেল। এখন বাড়িতে থাকলে আরও অপ্রীতিকর কিছু করে ফেলবার আশঙ্কা। বেরিয়ে পড়লাম। সুতপা সবটাই দেখলো। কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলো না।

সোজা এলাম 'সমন্বয়'-এ। খবর পেলাম গোলমাল বাইরে ছড়িয়েছে। কলকাতা আজ একরকম ঠাণ্ডা। তবে সন্ধ্যের পর হয়তো শহরের অবস্থার অবনতি হবে বলে আশঙ্কা করা যায়।

গেরিলারা এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। তবে বিক্ষিপ্ত পটকা আর ইঁটের বিপ্লব 'সমন্বয়'-এর ঘরে বসেই আন্দাজ করা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-একজন জানান দিচ্ছে—গুলি চলছে। হেসে বলেছি, 'আপনাদের কান তৈরী হয়নি। টিয়ার গ্যাসের সেলের আওয়াজ। ফ্যাসফ্যাসে শব্দ হয়। গুলির আওয়াজ আরও নিটোল। গোল আর ভরাট। গুলি চলছে না। মিথ্যে গুজব ছড়ানো আর তিলকে তাল করা আপনাদের স্বভাব। পুলিশ অসম্ভব ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে।

মৃগেনবাবুর সঙ্গে এক ছোকরা ক্যামেরাম্যানের লেগে গেল। মৃগেনবাবু তার তোলা ফটোগ্রাফ ছাপতে অস্বীকার করেছেন। 'কর্মচঞ্চল হাওড়ার ব্রীজ' ক্যাপশনযুক্ত পুরুনো ছবি কালকের কাগজে ধর্মঘটের খবরের সঙ্গে প্রকাশ করবার সুবিমল রায়ের নির্দেশে আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন মৃগেনবাবু। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়ানোর আগে হস্তক্ষেপ করতে হলো। নির্দেশ মত মৃগেনবাবুকে চলতেই হবে। ফটোগ্রাফারের ক্ষতি হোক এ আমি চাই না। সবই তারুণ্যের ব্যাপার মনে হয়। ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে আমার খুব একটা বেগ পেতে হলো না। অমিয় পালিতের খুব বড় একটা ছবি পুরোনো ফটোগ্রাফ থেকে তৈরীতে যে কোনো মূল্য কবুল করতে 'সমন্বয়' রাজি আছে, একথা জানালাম।

ফোন এলো। বামাকণ্ঠ শুনে মনে হয়েছিল সুতপার। স্বয়ং মীনাক্ষী ধর অপর প্রান্তে,

—কনগ্রাচুলেশন।

—হঠাৎ!

—কী করছো?

—অকাজই বলতে পারেন।

—আসতে হবে যে।

—কোথায়?

—আমার এখানে।

—কী ব্যাপার কী? কনগ্রাচুলেশন কিসের?

—এসে শুনবে। তুমি কিছু শোনো নি?

—কনগ্রাচুলেশন জানানোর মত কিছু শুনিনি।

—এস।

—আমাকে যে থাকতে হবে। যেতে দেরী হবে।

—দাদা তোমাকে ডাকছেন। এস।

—সুবিমলবাবু ওখানে নাকি?

—তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। ধর, দাদা কথা বলছেন।

অবাক হবার ধুম পড়েছে আমার। সুবিমল রায় এত ভনিতা তো করেন না।

—কনগ্রাচুলেশন।

—আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

—এস।

—এখনই।

—অপেক্ষা কর্‌ছি।

—কিছু বলবেন না? শুধু কনগ্রাচুলেশন।

—এসে শুনবে।

বিকেল গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চারটের পর ধর্মঘট নেই। তবে দোকান পাট সব বন্ধই। বাস কিছু কিছু চলছে। ট্রাম নেই। পার্ক স্ট্রীটটা সত্যিই ভদ্রলোকের জায়গা। দোকান খোলা পাওয়া গেল। একটা বোতল কিনে নিলাম। 'ব্লু-ফক্স এর রুদ্ধদ্বার ভেদ করে ফুটপাতে তোতলামো বাজনা ছড়াচ্ছে। পানের দোকানের সামনে টাউট্। রিক্সাওয়ালার 'রিন-ঠিং' আওয়াজের মধ্যে গণিকার হাতছানি। বায়োলজির নিচেরতলার অস্থিরতায় কাতর কতগুলো নারী-পুরুষের শরীর নিয়ন আলোতে জ্বলছে-নিভছে।

অনেক কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছি। সুবিমল রায় হয়তো নতুন পরিকল্পনা স্থির করেছেন। আমার খুশী হবার কিছু হয়তো

আছে। কিন্তু এভাবে মীনাক্ষী ধরের বাড়িতে সুবিমল রায় ইতিপূর্বে কোনোদিন ডেকে পাঠান নি। কিছুই আন্দাজ করতে পাচ্ছিলাম না। হাজারো কথা মনে আসছিলো। সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছু ভেবেছি। তবে 'কনগ্রাচুলেশন' জানানোর যুক্তি খুঁজে পাইনি। সুবিমল রায়ের অনুগ্রহ যদি হয়, তবে শুভেচ্ছা জানানোর কী সার্থকতা।

ঘরে ঢুকে একটু থমকে দাঁড়াতে হয়। এ মানুষটির উপস্থিতি আমি ভাবতেই পারিনি। ঠোঁটে চুরুট। স্বয়ং হেমেন ভাদুড়ী সোফা জুড়ে বসে আছেন।

একগাল হেসে মীনাক্ষী ধর সস্নেহে বলেন, —অরুণ কেমন ভয়ে ভয়ে ঢুকছে দেখুন হেমেনদা।

চুরুট মুখে হেমেন ভাদুড়ী স্থির। আমাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছেন। ঘরে সুবিমল রায় নেই।

—নিমন্ত্রণ করে এনে এখন সব চুপচাপ। কী দেখছেন হাঁ করে?

—তোমাকে। তুমি বাহাদুর ছোকরা হে।

—অপরাধ। কলকাতায় ফিরলেন কবে?

কথার জবাব দিলেন না হেমেন ভাদুড়ী। পকেট থেকে লম্বা একটা চওড়া খাম আমার হাতে তুলে দিলেন। মুখশ্রী এবার সিরিয়াস। সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে বললেন,

—ভাল করে পড়ো। ডাকেই পাঠাচ্ছিল। আমিই সঙ্গে নিয়ে এলাম।

সরল ইংরেজী তবুও আমার যেন অসুবিধে হচ্ছিলো। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হয়তো এ রকম সময়ই হয় না। নিতান্তই অবিশ্বাস্য। অকল্পনীয়। অপ্রত্যাশিত। সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

বার দুই পড়লাম। হেমেন ভাদুড়ীর দিকে তাকাতেই সামনে ঝুঁকে বসলেন। রসিকতার তিলমাত্র চিহ্ন ছিল না চোখেমুখে।

হাস্য-পরিহাসের বাষ্পমাত্র অনুপস্থিত। সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন,

—এটা অফার। এখন শুধু তোমার রাজি হবার অপেক্ষা।

চিঠির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আমি কথায় এলাম,

—এশিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট ?

কথা কেড়ে নিয়ে হেমেন ভাদুড়ী মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বলেন

—পুরোটাই কালিফোর্নিয়া য়ুনিভার্সিটির আওতায়। তবে প্রাইভেট গ্রাণ্টস্‌ও এর পেছনে আছে। হংকং-এর কনস্যুলেট অফিস অবশ্য গোটা ব্যাপারটা দেখাশোনা করে। তবে তার সঙ্গে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সাহায্য করে। দিস্‌ মাচ।

—কাজটা তো 'চায়না ওয়াচার'

—তা কেন। তুমি তো 'সিনোলজি' নিয়ে রিসার্চ করবে।

—আমাকে তো ওখানেই থাকতে হবে।

—হ্যাঁ, হংকং-এই। তবে কিছুদিন তোমাকে এখন স্টেটস্‌-এ কতকগুলো য়ুনিভার্সিটিতে ঘুরে ঘুরে ক্লাশ লেকচার শুনতে হবে।

—'সিনোলজি বলছেন কিন্তু ভাষা সম্পর্কে····

আমার কথা সম্পূর্ণ হেসে উড়িয়েই দেন হেমেন ভাদুড়ী,

—ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। দরকার হলে শিখে নেবে। অফার দেওয়া একটা আনুষ্ঠানিক নিয়ম রাখা। আমার সঙ্গে প্রফেসার আলফ্রেড লিণ্ডেল-এর কালই কথা হয়েছে। পরশু কলকাতা আসছেন। দশটায় তোমাকে ডেকেছেন। আলফ্রেড লিণ্ডেল-এর মত সিনোলজিস্ট খুব কম আছেন। তোমার 'লাস্ট স্ট্রং হোল্ড' পড়ে খুব খুশী। আলাপ হলে আরও খুশী হবেন। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

—আপাততঃ দেখছি পাঁচ বছর।

—সবটাই তোমার ওপর নির্ভর করছে। আমার তো মনে

হয় তোমাকে এ পোড়া দেশে আর ফিরতেই হবে না। হয়তো তোমাকে একজন সাউথ ইস্ট এশিয়া এক্সপার্ট হিসাবে পাকাপাকি হার্ভার্ড-এই থেকে যেতে হবে। কোথায় যে তুমি রাইজ করবে এখন কিছুই বলা যাচ্ছে না। আরে ভাই কজন বাঙালীর এ সুযোগ আসে। কতবড় একটা সম্মান। টু বি ফ্রাঙ্ক, গুণীর মর্যাদা ওরা দিতে জানে। ভারত থেকে বোধহয় এ ধরনের অফার এ পর্যন্ত কেউ পায়নি।

সুবিমল রায় আমার জন্যে অপেক্ষা করেন নি। কাল দেখা হবে বলেছেন। জরুরী একটা ফোন পেয়ে তাঁকে কিছুক্ষণ আগে চলে যেতে হয়েছে।

—আমিও উঠতাম। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। কাল কিন্তু সকালে আমার ওখানে আসতে হবে। এই অফার সংক্রান্ত ব্যাপারেই কথা আছে।

—কাল আবার কী অবস্থা দাঁড়ায় দেখুন। শহরতলীতেও হাঙ্গামা ছড়িয়েছে।

—তোমার প্রেস-কার আছে অসুবিধে নেই। আমাদেরই জ্বালা।

—কাল তো ধর্মঘট নেই।

—তাতে কী হয়েছে। ধরে জ্বালিয়ে দিলেই হলো।

—এশিয়া রিসার্চ ইনিস্টিটিউট্-এর নাম আমি শুনেছি। এর একটা কালচারাল শাখা ভারতেও আছে।

—সারা এশিয়া জুড়েই তো এদের কাজ। সে নেট-ওয়ার্ক পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক কায়দায়। দেখবে কাজ করে আনন্দ পাবে।

—সুবিমলবাবু কী বললেন ?

'দাদা খুবই খুশী, তবে তোমাকে হারাতে হবে এই যা, মীনাক্ষী ধরের চোখেমুখে আনন্দ ও আগ্রহ দুই-ই প্রকাশ পাচ্ছিলো।

চোখে চোখ পড়তেই হেমেন ভাদুড়ী বলেন,

—প্রফেসার উইলমেয়ার তোমার সঙ্গে আলাপ করে যে কী খুশী

হয়েছেন। তার রেকমেণ্ডেশন যে কী কাজের হয়েছে। অবশ্য তোমার 'লাস্ট স্ট্রং হোল্ড' লেখাটাই দেখছি এরা মূল্য দিয়েছে সবচেয়ে বেশী।

—প্রফেসার উইলমেয়ার এখন তো কালিফোর্নিয়া য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত নন।

—ভুল করছো অরুণ। প্রফেসার উইলমেয়ার ব্যাংকক থাকলেও য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর ঠিকই আছে। আলফ্রেড লিণ্ডেল প্রফেসার উইলমেয়ারের একজন সহকর্মী। কোন কোন ক্ষেত্রে পরামর্শ-দাতাও বলতে পার। তুমি এখন বাড়ি যাও। ব্যাপারটা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা কর। আলোচনা আর কী করবে, তবে তাঁরও সুবিধে-অসুবিধে আছে। কী নাগাদ তুমি যাবে সবই ঠিক ক'রে ফেলতে হবে। পরশু লিণ্ডেল সাহেবের হাতে তোমার সই করা ঐ কাগজ ফেরত দিতে হবে। পেছনে কতগুলো প্রশ্ন আছে। মূল অফারের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। তবে যাতায়াত, টাকা পয়সা সম্পর্কে সব কিছুই ভেবে-চিন্তে লিখো। কাটাকুটি করবে না। ওগুলো ওরা লক্ষ্য করে। উঠছো?

—আপনারা সাহেব পাড়ায় থাকেন, আমার তো আবার গেরিলা অধ্যুষিত অঞ্চল। হয়তো এখন পুরোপুরি মুক্ত এলাকা।

—কেন তোমার পাড়াটা খারাপ কিসে। জাস্টিস মিত্রের বাড়ির ওখানেই তো তোমার ফ্ল্যাট। য়্যারিস্ট্রোক্রাট জায়গা।

—মাঝে রাস্তাটা খারাপ। তাছাড়া একটা দিকে আজকাল বাজে ছেলেদের ভয়ানক আড্ডা বসে।

—একটা মপ্ আপ অপারেশন দরকার। দু-একটি গুলি-টুলি চালিয়ে কিছু হবে-টবে না। আসলে আমরা বাঙালা তো। মার খেতে শিখি নি। মার দিতেও ভয় পাই।

অল্পক্ষণ পরেই উঠে পড়লাম। হেমেন ভাদুড়ী হাত তুলে শুভেচ্ছা জানালেন। মীনাক্ষী ধর কাপড় ঠিক করে একটু সোজা হয়ে বসলেন।

সোজা বাড়িতেই ফিরলাম। গোপাল রেডিও শুনছে। সুতপা

নেই। চিঠি রেখে গেছে। চিঠি না পড়েই বেশ খানিকটা মদ গ্লাসে ঢেলে নিলাম। অনেকটা একসঙ্গে খেয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুতপার চিঠি খুলে বসি। দু' লাইনের লেখা। শুধু হস্তাক্ষর দেখে চিনে নিতে হবে লেখাটা কার। অমিতের গ্রেপ্তার হবার কথা অমিতের মা বাবাকে জানাতে গেছে চন্দননগর। না ফিরতেও পারে।

হয় তো মিথ্যে নয়। কিন্তু চন্দননগরে খবর পৌঁছোনোই সুতপার সব চেয়ে বড় আগ্রহ নয়। আমাকে যেন সহ্য করতে পাচ্ছে না। আমিও জ্বলছি। অসহ্য এ জ্বালা যেন ক্রমশঃ বাড়ছে।

আমার প্রতি হয়তো সুতপা শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। সেই কারণেই হয়তো অমিতকে আশ্রয় করেছে। রাজনৈতিক চিন্তাধারা সুতপার নেই জানি। দু-চার কথায় মালুম হয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সুতপাকে স্পর্শ করেনি। তবে নিদারুণ অন্তর্দাহের অস্বাচ্ছন্দ্যে জ্বলছে বুঝতে পারি।

এশিয়া রিসার্চ ইনিস্টিটিউট-এর নিমন্ত্রণ পত্রটি সামনেই রাখা ছিল অনেকটা মদ ঢেলে বড় একটা গ্লাস বানিয়ে নিলাম। পারিশ্রমিক সম্পর্কে ইনিস্টিটিউট যা বলছে তাতে প্রথমে মনে হয়েছিলো টাইপো-গ্রাফিকাল মিসটেক্। কিন্তু কথায় যে অঙ্ক বসিয়েছে তাতে আর সংশয় থাকে না। এ যে অনেক টাকা। যোগফল প্রায় দাঁড়াবে হাজার পাঁচ-ছয়-এর মত। কী ধরনের ফ্ল্যাটে আমাকে থাকতে হবে তার সাজানো ঘরের ফটোগ্রাফও সঙ্গে দিয়েছে। একটা ব্যাপারেই শুধু ঠকে গেছি। হং কং আমেরিকা বা ভারতের যে কোনো শ্রেষ্ঠ স্কুলে ছেলেকে রাখবার যাবতীয় খরচাপাতা থেকে আমি শুধু বঞ্চিত হয়েছি।

ঘরে কেউ নেই। একা। অল্পক্ষণেই নেশাটা আজ বেশ জমে উঠেছে। আলফ্রেড লিণ্ডেল-এর কথা ভাবছিলাম। লোকটা কেমন দেখতে। আমি অনেকটা লম্বা। পুরো পাচ-দশ। লিণ্ডেল সাহেব কী তার চেয়েও লম্বা। হয়তো গলব্রেথের মত। নেপোলিয়নের যুগ গেছে। তাঁর বিখ্যাত সাদা ঘোড়ার গল্প আজ মৃত বাঘের কাঁধে পা তুলে বন্দুক হাতে নেওয়া হাস্যকর শিকারীর মত মনে হয়।

এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির লোকগুলো সবাই দেখি লম্বা-লম্বা, ঢেঙা-ঢেঙা। মেয়েগুলোও খাড়া-খাড়া।

আলফ্রেড লিণ্ডেল নিশ্চয় অনেক কিছুই জানতে চাইবেন। আমার যোগ্যতার মুল্যায়নের প্রাথমিক পরিচয়ই আমি শুধু 'লাস্ট স্ট্রং হোল্ড'-এ রেখেছি। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আলফ্রেড লিণ্ডেলকে চমকে দেবার পুঁজি আমি এখনও গোপন করে রেখেছি। আমার খামতিটুকু আমি জানি। আমি বাংলায় ভেবে ইংরাজীতে কথা বলি। পবিত্র তালুকদারের মত উচ্চারণ রপ্ত করা আমার উচিত ছিল।

হঠাৎ বাইরে আওয়াজ। গুম গুম শব্দ। পর মুহূর্তে কোথা থেকে এসে গোপাল সশব্দে দরজা বন্ধ করলো। হাঁপাচ্ছে। উঠতে গিয়ে একটু টলে গেলাম। তবু এগিয়ে যাই।

—কী রে আওয়াজ কিসের ?

—গুলি চলছে। রাস্তায় লোক দৌড়চ্ছে।

—গাড়িটা তুলেছি ?

—হ্যাঁ।

—যা ঘরে যা।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। তামাম অঞ্চল অন্ধকার। ইট মেরে মেরে আলোগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। ছায়ামূর্তির মত কতগুলো দেহ দুধের কাঠের কেবিনটা ওপড়াতে চেষ্টা করছে। কেষ্ট গাঙ্গুলীকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এখান থেকেই বন্দুক চালিয়ে দেবার ইচ্ছে হলো। পর মুহূর্তে মনে হলো, আমি বড় তাড়াতাড়ি খাচ্ছি। এ দেশই তো আমি ছেড়ে যাচ্ছি। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সত্যিই আর এদেশে থাকা চলে না।

পর পর কয়েকটা বোমা ফাটলো। কয়েক রাউণ্ড গুলি চলবার শব্দ পেলাম। লোক দৌড়চ্ছে। ঘরে এলাম। একটা টেলিফোন বাজে। কনগ্রাচুলেশন ? তাও নয়। পুরুষ মানুষের গলা। সুরেলা

একটি নারীকণ্ঠ হলেও না হয় কিছুটা ভাল লাগতো। আমি নেই জানিয়ে দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখি।

খেয়াল হলো অনেকটা খেয়ে ফেলেছি। একটু বমি করলে ভাল হতো। গলাটা জ্বলছিলো। তবু তীব্র এই ঝাঁজটা আজ অসম্ভব ভাল লাগছিল। শূন্য ঘরে এই প্রাণহীন সোনালী দলিত দ্রাক্ষাই আজ আমাকে বুঝতে পারে। তারিফ করছে।

ভাবছিলাম। সুতপা কী ভাবে খবরটা নেবে? মাস্টারের মেয়ে হংকং যাবে। আমেরিকা দেখবে। আকাশে হয়তো চাঁদ দেখেছে, কিন্তু এমনই হতভাগিনী চাঁদ হাতে নেবার আনন্দ সুখ থেকে বঞ্চিত। বুঝি, সবই বুঝি। স্বচ্ যে খায়নি, না-খাওয়ার বঞ্চনা সে কী করে বুঝবে?

শুধু সুতপা কেন, খবরটা অনেকেই অনেকভাবে নেবে। অমিত এমনভাবে হাসবে, যেন এ সমস্ত তার অনেক আগে জানাই ছিল। এশিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর এই 'অফার' আজ আমাকে নতুন করে চেনবার সুযোগ করে দেবে আমি জানি। অশিক্ষিত এই ক্ষ্যাপা মানুষগুলো দেবে সিনোলজিস্ট-এর মর্যাদা? ঈর্ষাকাতর বন্ধুদের হাজারো ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা বেশ কিছুকাল চলবে। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, আমার নাকি কিছু নেই শুধু বাসনা আছে। আমি দলত্যাগী। আমি রেনিগেড। আমি পরোপজীবি আঁচিল শ্রেণীর দালাল। আমার মধ্যে নাকি মনুষ্যত্বের মৃত-ধ্বংসস্তূপ। আমি একজন কালীঘাটের সিঁদুর পরা কাউট্স্কী।

হাসি পায়। দুঃখও হয়। অসহ্য এক জ্বালা। অদৃশ্য আগুনে শুধু পোড়ায়। দহন করে। চিনলো না। তার জন্যে আমার এতটুকু অভিযোগ নেই। নালিশ নেই কারো কাছে। অভিযোজনের প্রয়োজনই নেই আমার। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমার শুধু একটা কথাই মনে বাজে।

প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমি যেন আজ শুধু স্রোতের সঙ্গে ভাসছি।